দর্শন-দিগ্‌দর্শন

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

[প্রথম খণ্ড]

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

DARSHAN-DIGDARSHAN
[PRATHAM KHANDA]

Bengali translation of Rahula Sankrityayan's Hindi original

Darshan-Digdarshan

অনুবাদ · ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা : তারাপদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর

এন. গোস্বামী

নিউ নারায়ণী প্রেস

১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন,

কলকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

কে. পি. জয়সওয়ালের স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ সমর্পিত হলো। গ্রন্থ রচনাপর্বে, যাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমাগত কানের কাছে মূর্ছিত হয়েছে আর যাঁকে পড়ে শোনাবার উৎকণ্ঠায় বারবার বিস্মৃত হয়েছি যে, তিনি চিরনিদ্রায় বিলীন।

দর্শন-দিগ্‌দর্শন

ভূমিকা

মানবজাতির আবির্ভাবকাল আজ যদিও লক্ষ বছর অতিক্রম করেছে, কিন্তু তার বৌদ্ধিক বিকাশের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ সময় হলো ৫০০০ থেকে ৩০০০ খৃষ্টপূর্ব, যখন থেকে সে ক্রমশ কৃষিকার্য, গৃহনির্মাণ, স্থায়ী বসতিস্থাপন তথা সমাজগঠন ও আইনকানুনের প্রয়োগ প্রভৃতি শেখে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পর, নব্য আবিষ্কারের উত্তেজনা শুরুর সময়ে আমরা পুনরায় ঐ ধরনের মানব-বুদ্ধির তীব্রতাকে উপলব্ধি করলাম। কিন্তু প্রথম যুগে দর্শনের কোনো অস্তিত্ব ছিলই না, এমনকি পরবর্তীকালেও তা ছিল যেন এক অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধের ভূমিকায়; বৃদ্ধ-বচনে মানুষের আস্থা থাকে, তাকে শ্রদ্ধাও করা যেতে পারে, তবু তার প্রতি মনোযোগ তখনই আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব, যখন তা প্রয়োগাশ্রিত চিন্তনের বিজ্ঞানসম্মত-খুঁটিকে আঁকড়ে ধরে। অবশ্য স্যর রাধাকৃষ্ণণের মতো প্রাচীন পন্থী ধর্মপ্রচারক এটা মানতে রাজী হননি, তাঁর মন্তব্য —"প্রাচীন ভারতীয় দর্শন কোনো বিজ্ঞান বা শিল্পের অংশ নয়, সদা-স্বতন্ত্র।" (*History of Indian Philosophy* ; vol. 1., p. 52)।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন শিল্প-বিজ্ঞানের অংশীদার না হতে পারে, কিন্তু তা ধর্মের ধ্বজাধারী তো বটেই, আর ধর্মের দাসত্বের চেয়ে নিকৃষ্ট দাসত্ব আর কি হতে পারে? ৩০০০ থেকে ২৬০০ খৃষ্টপূর্ব মানবজাতির বৌদ্ধিক জীবনের উৎকর্ষ নয়, অপকর্ষেরই সময়; মানুষ তার জীবনের সর্বাপেক্ষা কম আবিষ্কার এই সময়েই করেছে। জানা গেছে যে ১০০০ থেকে ৭০০ খৃষ্টপূর্বের মধ্যে প্রথম দুই সহস্রাব্দের কঠোর মানসিক পরিশ্রমের পর মানব-মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল, আর এই রকমই এক স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থা থেকেই দর্শনের উদ্ভব হয়। অতএব যার প্রারম্ভই এ রকম তার প্রতি আমাদের হার্দিক শ্রদ্ধা তো বর্ধিত হয়ই না, বরং নির্মূল হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য দর্শনের প্রভাতকালেই তার মধ্যাহ্ন প্রতিভাত হয় না। দর্শনের স্বুবর্ণযুগ ৭০০ খৃষ্টপূর্ব থেকে শুরু করে পরবর্তী তিন-চার শতাব্দী পর্যন্ত ধরা যেতে পারে; এই সময়ের মধ্যে ভারতে উপনিষদ থেকে শুরু করে বুদ্ধ পর্যন্ত, ইউরোপে থালেস থেকে শুরু করে অ্যারিস্টটলের যুগ পর্যন্ত দর্শন বিভিন্নভাবে বিকাশিত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই দর্শনধারা আপসে মিলিত হয়ে সমগ্র বিশ্বেরই দর্শনধারার উৎসে পরিণত হয়েছিল, আর এই উভয় ধারার প্রতিনিধি হয়ে নব্য প্লেটোনিক দর্শন যে কিভাবে নতুন প্রগতির পথ দেখিয়েছে পাঠক তা ক্রমশ জানবেন।

প্রথম ও অন্তিম আবিষ্কার যুগের মধ্যে তুল্যতা নির্ণয়ে অক্ষম হলেও দর্শনের এই সুবর্ণযুগ মানব-মস্তিষ্কের নিদ্রার যুগ ছিল না। বলা দরকার যে এই যুগের দর্শন বিচ্ছিন্ন নয় বরং বহুমুখী প্রগতিরই দান। মানব সমাজের প্রগতি সম্পর্কে আমি আমার 'মানব-সমাজ' গ্রন্থে বলেছি যে এই প্রগতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম পৃথিবীর কোনো দেশেই নেই। ৬০০ খৃষ্টপূর্ব ছিল এমন একটা সময়, যখন একদিকে মিশর, মেসোপোটেমিয়া এবং সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন মানব আকাশকুসুম কল্পনার পর শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, এবং অন্যদিকে নব্য আগন্তুকগণের মিশ্রণে উৎপন্ন জাতিসমূহ —হিন্দু ও য়ুনানী —তাদের বুদ্ধি ও চিন্তনের ক্ষেত্রে পূর্ণোদ্যমে চর্চা শুরু করেছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে য়ুনানীগণ ৬০০ থেকে ৩০০ খৃষ্টপূর্ব পর্যন্ত তাদের বিকাশধারা অব্যাহত রেখেছিল কিন্তু হিন্দুগণ ৪০০ খৃষ্টপূর্বের কাছাকাছি সময়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ৩০০ খৃষ্টপূর্বেই ইউরোপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আবার তার পুনর্জাগরণ শুরু হয় ১৬০০ খৃষ্টাব্দ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর পর। যদিও সন্দেহ নেই যে এই সুদীর্ঘ তিন —৯০০ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দ—শতাব্দী পর্যন্ত দর্শনের মশাল তো নির্বাপিত ছিলই না বরং ইসলামিক দার্শনিকগণের হাতে ছিল দেদীপ্যমান ; এবং পরবর্তীকালে তা থেকেই আধুনিক ইউরোপ তার দর্শন-প্রদীপে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করে নেয়। এদিকে দর্শনের ভারতীয় শাখা ৪০০ খৃষ্টপূর্বের পরবর্তী চার শতাব্দী ধরে ভস্মস্তূপের ওপর কয়েক খণ্ড অঙ্গারের মতো টিমটিম করছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী —বিশেষ করে এর শেষ তিনটি শতকে —সে তার সামর্থ্য দেখাতে সক্ষম হয়েছিল ; এটা ছিল সেই সময় পাশ্চাত্ত্যে যখন দর্শনের মান খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। নবম থেকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় দর্শন ইসলামী দর্শনের সমকালীনই শুধু নয়, সমকক্ষতাও বজায় রেখেছিল, কিন্তু তারপর তা এমন চিরসমাধি লাভ করে যে আজও সে সমাধি ভঙ্গ হয়নি। ইসলামী দর্শনের অবসানের পর ইউরোপীয় দর্শনেরও একই দশা হতো যদি সে ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মীয় বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত না করে নিতে পারত। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপ স্কলাসটিক — ধর্মপোষক —দর্শনের অন্ত করে, কিন্তু ভারতে স্কলাসটিক মতবাদীগণ একের পর এক আবির্ভূত হন এবং ধর্মের এই দাসত্বকে গর্বের বস্তু বলে মনে করতে থাকেন। তাঁরা এটা বুঝতে পারেননি যে বিজ্ঞান (সায়েন্স) ও শিল্প-কলার সহযোগিতা করার অর্থ হলো প্রয়োগের মাধ্যমে সজীব প্রকৃতিরই শক্তিশালী আশ্রয় গ্রহণ করে স্বীয় সৃজন-প্রতিভাকে বর্ধিত করা ; যে দর্শন একে অস্বীকার করে, এ থেকে মুক্তি কামনা করে তা আসলে বুদ্ধি বা জীবন চিন্তার তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকেই মুক্তি চায়।

বিশ্বব্যাপী দর্শনের ধারাকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে যে তা জাতীয় অপেক্ষা বেশী পরিমাণে আন্তর্জাতিক। অনেক ক্ষেত্রে এক দেশের ধর্ম অন্য দেশের ধর্মকে স্বীকার করে যেরকম ঔদার্য দেখিয়েছে তেমনই দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহকে গ্রহণ

করার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন দেশের দর্শনকেও অনুরূপ উদারতা প্রদর্শন করতে দেখা গেছে। এ কথা বলা ভুল যে দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহের পিছনে কোনো অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত থাকে না, তবু ধর্ম অপেক্ষা তা অনেক কম করেই এক রাষ্ট্রের স্বার্থকে অন্যের জন্য ক্ষুণ্ণ করতে চেয়েছে। তাই আমরা গঙ্গা, আমু-দজলা এবং নালন্দা, বুখারা-বাগদাদ-কাদোর্বা সভ্যতার সহৃদয় সমাগম দর্শনের মধ্যে যতটা পাই, বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ব্যতীত ততটা আর কোথাও পাই না। সময় ও সাধনার অভাবে আমি চীন ও জাপানের দার্শনিক ধারাকে আলোচনা করতে পারলাম না, এটাই আমার আফসোস। তা সত্ত্বেও এই ধারার মধ্যে এমন কোনো তারতম্য দেখা যায় না যাতে কোনো রাষ্ট্রপ্রেমিক দর্শনক্ষেত্রে নিজে সংশয়গ্রস্ত হন বা অন্যকে সংশয়ান্বিত করেন।

এখানে আমি দর্শনকে বিস্তৃত ভৌগোলিক মানচিত্রের ওপর পর্যায় ক্রমে দেখার এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি, এবং এতে সাফল্যের বিচার করার অধিকারী আমি নই। তবু এটা আমি অবশ্যই বুঝি যে এই পথই দর্শনকে উপলব্ধি করার সঠিক উপায়; অথচ পরিতাপের বিষয় হলো যে আজ পর্যন্ত কোনো ভাষাতেই দর্শনকে এইভাবে অধ্যয়ন করার প্রযত্ন করা হয়নি। কিন্তু বেশীদিন যে একে উপেক্ষাও করা যাবে না তা জোর দিয়েই বলা যায়।

এই গ্রন্থ রচনাকালে যে সমস্ত পুস্তকের সহায়তা আমি পেয়েছি তাদের লেখকবৃন্দের নামসমূহ পুস্তকের পরিশেষে যুক্ত করলাম। মাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারাই এঁদের ঋণ পরিশোধ করা যায় বলে আমি মনে করি না—বস্তুত ঋণ পরিশোধের একটাই রাস্তা যে হিন্দীতে এমন সব দর্শন গ্রন্থ প্রকাশ করা যাতে এমনকি 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন'-কেও কেউ স্মরণ না করেন। আমি মনে করি প্রত্যেক গ্রন্থকারেরই উচিত নিজ গ্রন্থের প্রতি উক্ত মনোভাব পোষণ করা।—অমরত্ব? সে তো একটা প্রচণ্ড ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পুস্তক রচনার কাজে সাহায্যকারী পুস্তক এবং অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রী সুলভ্য করার কাজে ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন এবং পণ্ডিত উদয়নারায়ণ তেওয়ারী, এম. এ. সাহিত্যরত্ন, আমাকে যে সাহায্য করেছেন তাতে আত্মীয়সম এই সুহৃদগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সেণ্ট্রাল জেল, হাজারীবাগ
২৫. ৩. ১৯৪২

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

সম্পাদকের প্রতিবেদন

রাহুল সাংকৃত্যায়নের হিন্দী গ্রন্থ দর্শন-দিগ্‌দর্শন ১৯৪৪-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে রাহুলজী প্রাচীন গ্রীক দর্শন, ইসলামী দর্শন, য়ুরোপীয় দর্শন এবং ভারতীয় দর্শনের সব ধারাগুলির বিবরণ দিয়েছেন এবং আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থকে দর্শনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে গণ্য করতে হয়ত কিছু আপত্তি উঠতে পারে, কেন না ভারতীয় দার্শনিক মতগুলি বাদে অন্যান্য দর্শনগুলির আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। তবে, চীন বাদে বিশ্বের প্রায় সব সভ্য দেশের দার্শনিক মতগুলির বিকাশের একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীন ভারতে দর্শনের বিস্ময়কর বিকাশ দেখা গিয়েছিল, যেমন দেখা গিয়েছিল প্রাচীন গ্রীস ও চীনে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের কোনো ইতিহাস সংস্কৃতে বা অন্য কোনো প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় রচিত হয়নি। বহুকাল পরে মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'-এ ভারতের সবগুলি দার্শনিক মত একত্রে গ্রথিত হয়েছিল এই মাত্র। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে দর্শনের চর্চা যেমন বিশেষ হয়নি তেমনি রাহুলজীর এই হিন্দী গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আগে অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় দর্শনের ইতিহাস রচিত হয়নি। ভারতীয় ভাষায় দর্শনের ইতিহাসের যে অভাব ছিল রাহুলজীর এই গ্রন্থ তা কতকাংশে পূরণ করেছে। এই ক্ষেত্রে পথিকৃতের সম্মান অবশ্যই রাহুলজীর প্রাপ্য। এই গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যেরও গর্বের বিষয়।

যে বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে রাহুলজী এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা এই গ্রন্থকে কয়েকটি বিশিষ্টতা দান করেছে। দীর্ঘকাল বৌদ্ধদর্শন চর্চা করার পর তাঁর উত্তরণ ঘটেছিল মার্কসবাদে। রাহুলজী নিজেই বলেছেন যে বুদ্ধের পথ অনুসরণ করতে করতে তিনি বুদ্ধের ক্ষণিক (দ্বন্দ্বমূলক) অন্‌-আত্মবাদ থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে পৌঁছে গিয়েছিলেন, মার্কসবাদ গ্রহণ করার পর হিন্দীভাষী জনসমাজের সাধারণ শিক্ষিতজনদের মার্কসবাদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁদের কাছে মার্কসের পূর্ববর্তী দর্শন চিন্তার ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কিন্তু হিন্দী ভাষায় তাঁদের উপযোগী গ্রন্থ না থাকায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই কারণে দর্শনের দুরূহ ও জটিল বিষয়গুলি তিনি যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল করে বলবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনো দার্শনিক সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য ক্ষুণ্ণ করেননি, অর্থাৎ সরলীকরণ কোথাও অতি সরলীকরণে অবনমিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। কাজটা খুব সহজ নয়। নির্দ্বিধায় বলা যায় এতে তিনি অসামান্য

দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই গ্রন্থের ভাষাও লক্ষণীয়। বলা যেতে পারে রাহুলজী যথার্থই সাধারণ জনের ভাষাতে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে। যে সব দার্শনিক মত বিবৃত ও আলোচিত হয়েছে সেগুলি যে দেশের ওপর যে কালে উদ্ভূত হয়েছিল সেই দেশ-কালের আর্থ সামাজিক পটভূমি তিনি তুলে ধরেছেন। এই পটভূমিতে বিচার না করলে কেবল মাত্র দর্শন নয়, মানুষের কোনো প্রচেষ্টারই সঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। কোনো দার্শনিক বা চিন্তাবিদ যত বড় মনীষীই হোন না কেন তিনি কখনও তাঁর যুগের বস্তুগত সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। কোনো একটি দেশে এবং কোনো একটি সময়ে কোনো একটি বিশেষ দার্শনিক মতের উদ্ভব কেন ঘটল তার সার্থক বিচার করতে গেলে সেই দেশ-কালের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিবেচনা করতে হয়। এটি মার্কসবাদের অন্যতম শিক্ষা। রাহুলজী যে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ও অনুসরণ করেছেন তার পরিচয় রেখেছেন। এই গ্রন্থে তিনি কেবলমাত্র দার্শনিক মতগুলি কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত হননি, তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পৃষ্ঠপটে সেগুলির মূল্যায়ন করেছেন, সেগুলি কোন সামাজিক উদ্দেশ্যের অনুকূল তা দেখিয়েছেন। তাঁর মূল্যায়ন সর্বত্র যথাযথ হয়েছে কি-না সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে, তবুও এটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিচারের যোগ্য।

এই গ্রন্থের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো অন্যান্য দেশের দার্শনিক মতে যেখানে কোনো ভারতীয় দার্শনিক মতের অনুরূপ ধারণা বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হয়েছে বা অন্য দেশের কোনো দার্শনিক সিদ্ধান্ত ভারতীয় দার্শনিকের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে সেগুলি রাহুলজী যথাস্থানে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শন যেখানে কোনো বিদেশী দর্শনের কাছে ঋণী বলে তিনি যুক্তি প্রমাণ পেয়েছেন অসঙ্কোচে তার উল্লেখ করেছেন। এর থেকে পাঠকেরা বুঝবেন যে দর্শনের বিবর্তনকে দেশ বা জনগোষ্ঠীর ভিত্তিতে বিভক্ত করার বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। দর্শন-দিগ্‌দর্শন গ্রন্থের এই সব বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে যে এর মাধ্যমে কেবলমাত্র বাংলা জানা পাঠক সমাজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দর্শনচর্চার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় কোনো পুস্তক নেই।

সমগ্র গ্রন্থের আকার কিছু বৃহৎ হওয়ায় এটি দুই খণ্ডে প্রকাশ করা সমীচীন বলে মনে হয়েছে। বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আয়োনীয় (প্রাচীন গ্রীক) দর্শন, ইসলামী দর্শন ও য়ুরোপীয় দর্শন। উত্তর খণ্ডে থাকবে কেবলমাত্র ভারতীয় দর্শন।

ভারতীয় দর্শনের অংশ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করার আরও একটি কারণ আছে। ইংরেজী জানা পাঠকদের কাছে দার্শনিক বলে পরিচিত স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ইংরেজীতে রচিত তাঁর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছেন। রাহুলজী সেই সব বক্তব্য খণ্ডন করেছেন এবং ভারতে উদ্ভূত সবগুলি দার্শনিক মতের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া ভারতের বৌদ্ধ দর্শনাচার্যদের অন্যতম মহান্ প্রতিনিধি ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন রাহুলজী ভারতীয় দর্শন অংশে। ধর্মকীর্তির এই গ্রন্থ ভারতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং রাহুলজী দুঃসাধ্য প্রয়াসে তিব্বত থেকে তা পুনরুদ্ধার করে ভারতে নিয়ে আসেন। এই সব কারণে ভারতীয় দর্শন অংশ সঙ্গতভাবেই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা পাবার যোগ্য।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে রাহুলজী দুই একটি নতুন কথা বলেছেন। পণ্ডিতজনেরা অবশ্যই সেগুলি বিবেচনা করে দেখবেন কেন না সেগুলির গুরুত্ব আছে।

ডিমোক্রিটাসের দার্শনিক মতের আলোচনা প্রসঙ্গে, রাহুলজী বলেছেন, "এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে গ্রীক দর্শনের প্রভাবেই ভারতের দর্শনে পরমাণুবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। উপনিষদ, তার পূর্ববর্তী সাহিত্য, এমনকি জৈন ও বৌদ্ধ ত্রিপিটকেও আমরা এর সন্ধান পাইনি। গ্রীক দর্শনের ভারতীয় সংস্করণই হলো বৈশেষিক দর্শন। হয়ত, এথেন্সের পুর-চিহ্ন ওল্লু থেকে বৈশেষিকের ঔলুক্যদর্শন সৃষ্টি হয়েছে।" (পৃঃ. ৪৭)

আবার অ্যারিস্টটলের দর্শন আলোচনার সময় বলেছেন, "অ্যারিস্টটলের মতে তর্কশাস্ত্রের কোথাও আটটি কোথাও বা দশটি প্রমেয় (পদার্থ বা category বা জ্ঞানের বিষয়) আছে। (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) পরিমাপ, (৪) সম্বন্ধ, (৫) দিশা, (৬) কাল, (৭) আসন, (৮) স্থিতি, (৯) ক্রিয়া এবং (১০) নিষ্ক্রিয়তা। বৈশেষিকে ছয়টি পদার্থের মধ্যে দ্রব্য ও গুণ আছে, আবার আর নয়টি দ্রব্যে দিশা ও কাল আছে। বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনে অন্যান্য প্রমেয়-গুলির কিছু ব্যাখ্যা অন্যভাবে করা হয়েছে। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্বে কোনো ভারতীয় গ্রন্থেই এ ধরনের বিচার দেখা যায়নি। এতেই বোঝা যায় যে আমাদের দর্শন গ্রীক দর্শনের নিকট কত ঋণী।" (পৃঃ. ৫৮)

ঐতিহাসিক বিচারে রাহুলজীর উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক বলে মনে হয়, তবে পণ্ডিতজনেরা এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

নব্য-প্লেটোনিক দর্শনের উদ্ভবের কথা বলতে গিয়ে রাহুলজী মন্তব্য করেছেন, "গ্রীক দর্শনকে নব্য-প্লেটোনিক দর্শনে রূপায়িত করতে ভারতের অবদান ছিল প্রধান।" রাহুলজী তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি-প্রমাণও দিয়েছেন। আমাদের মনে হয় তৎকালীন গ্রীসের বাস্তব সামাজিক অবস্থার কারণে নব্য-প্লেটোনিক

দর্শনে নৈরাশ্যবাদ ও রহস্যবাদ যুক্ত হয়েছিল। জগতের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী তৎকালীন গ্রীকরা ভারতীয় রহস্যবাদ ও নৈরাশ্যবাদে একটা আশ্রয় পেয়েছিল এই মাত্র। 'ভারতের অবদান ছিল প্রধান' এই কথাটা ঠিক নয়। মনে রাখা দরকার, যে কোনো দেশই হোক, অর্থনীতিক বিকাশের যে প্রধান পর্যায়-গুলি অতিক্রম করে এসেছে সেই দেশের দর্শনের বিবর্তনে সেই পর্যায়গুলির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামী দর্শনে নতুন কোনো মৌলিক দার্শনিক মত নেই। ইসলামী দর্শন হলো প্রাচীন গ্রীক দর্শন, বিশেষত অ্যারিস্টটলের দর্শন ও নব্য-প্লেটোনিক দর্শনের বিবরণ এবং নতুন ব্যাখ্যা, তা সত্ত্বেও রাহুলজী ইসলামী দর্শন নিয়ে তুলনায় অনেক বেশী আলোচনা করেছেন, সম্ভবত এই কারণে যে গ্রীক দর্শন য়ুরোপে পৌছে দেওয়ার কৃতিত্ব ইসলামী দার্শনিকদের, বিশেষ করে ইবনে-রুশদ-এর য়ুরোপে যিনি আভারস নামে পরিচিত।

ইসলামী দর্শনে আল-ফারাবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে মনে করা হতো। মুসলিম দার্শনিকদের মতে আল-ফারাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ যদি কেউ থাকেন তিনি হচ্ছেন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। রাহুলজী আল-ফারাবীর থেকে ইবনে-সীনা ও ইবনে-রুশদকে উচ্চস্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে ইবনে-সীনার জন্যই "প্রাচ্যে ইসলামী দর্শন উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল…" (পৃঃ. ১২৮) এবং "পাশ্চাত্ত্যেও তেমনি ইসলামী দর্শনের চরম বিকাশ ঘটেছিল ইবনে-রোশদের দ্বারা।" (পৃঃ. ১৭৮)

রাহুলজীর বিচারই সঠিক। সীনা গ্রীক দার্শনিকগণের রচনার ওপর কোনো টীকা-ভাষ্য রচনা করেননি। তিনি নিজস্ব দার্শনিক মত ব্যক্ত করেছিলেন। ইবনে রুশদ ইসলামের ধর্মমতের বিরোধিতা না করেও অ্যারিস্টটলের দর্শনের বস্তুবাদী দিক বিকাশিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এইটিই তাঁর দার্শনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য। অ্যারিস্টটলের দর্শনের যে ব্যাখ্যা তিনি রচনা করেন তার মাধ্যমে য়ুরোপের জ্ঞানজগৎ গ্রীক দর্শনের পরিচয় লাভ করবে।

আল-গাজালীর রচনাবলীর অনেক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন রাহুলজী তবে দার্শনিকের চেয়ে ধর্মরক্ষক হিসাবে তাঁকে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। আল গাজালীর নাম সম্পর্কে রাহুলজী লিখেছেন তাঁর নাম ছিল মুহম্মদ (ইবনে-মুহম্মদ ইবনে-মুহম্মদ ইবনে-মুহম্মদ)। "তাঁর বংশ ছিল তন্তুজীবী, আরবীতে যাদের বলা হয় গজল, তাই তিনি নিজের নামের সঙ্গে গজাল পদবী যুক্ত করে নেন।" (পৃঃ. ১৩৬) কিন্তু ইসলামী দর্শনের ইতিহাসে আমরা দেখি যে আল-গাজালীর (১০৫৮-১১১১ খৃঃ) সম্পূর্ণ নাম ছিল আবু হামিদ মুহম্মদ আল-গাজালী। ইরাণে তুশের গাজালা গ্রামে জন্ম বলেই তিনি গাজালী নামে পরিচিত হন। রাহুলজী কিন্তু সর্বত্র তাঁকে গজালী বলে উল্লেখ করেছেন।

আল-গাজালীর 'তাহাফাতুল-ফালাসিফা' (দর্শনের ধ্বংস বা দর্শন খণ্ডন) নামক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন রাহুলজী কিন্তু একটা কথা উল্লেখ করেননি। আল-গাজালীর দর্শন বিরোধী ভূমিকাই পাশ্চাত্ত্যের সংশয়বাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের চমৎকৃত করে। য়ুরোপে পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিরোধী যে সন্দেহবাদ এবং অজ্ঞেয়বাদের উদ্ভব হয় গাজালীর মধ্যে তার সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক বিরোধের ক্ষেত্রেও গাজালী নিরপেক্ষ ছিলেন না।

ইবনে-রুশদ গাজালীর জ্ঞান-বিরোধী মতের তীব্র সমালোচনা করে 'তাহাফাতুল তাহাফাতুল-ফালাসিফা' (দর্শন-খণ্ডন-খণ্ডন) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে রাহুলজী একটি অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক মন্তব্য করেছেন রুশদ-এর ওপর আলোচনায় —'গজালীর যুক্তি খণ্ডন' শীর্ষক অনুচ্ছেদে (পৃঃ. ১৮৮-১৮৯)। রুশদ-এর সমকালীন ভারতের দার্শনিক শ্রীহর্ষের গ্রন্থ 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য'-এর প্রতিপাদ্যের কথা উল্লেখ করে রাহুলজী বলেছেন,"অর্থাৎ একই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দুই মহান্ দার্শনিকের মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ বস্তুবাদের জায়গায় অবস্তুবাদ (শূন্যবাদ) এবং আর একজন (রোশদ) অবস্তুবাদ (সুফী ব্রহ্মবাদ)-এর পরিবর্তে বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ভবিষ্যতে এর পরিণাম কি হলো? শ্রীহর্ষের পরম্পরা ব্রহ্মবাদের মায়াজালে আবদ্ধ করে ভারতে এক মৃতপ্রায় সমাজের আবির্ভাব ঘটালেন আর রোশদের পরম্পরা পুনর্জাগরণের সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে নব্য ইউরোপীয় সমাজের জন্মদানে সাফল্য অর্জন করলেন।"

স্পষ্টতই রাহুলজী এখানে কার্য-কারণ সম্বন্ধ উল্টে দিয়েছেন। শ্রীহর্ষের পরম্পরা ভারতে মৃতপ্রায় সমাজের আবির্ভাবের কারণ নন। ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সমাজ-জীবন অনড় ও মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিল বলেই এখানে শ্রীহর্ষ ও গাজালীর ধারা সর্বমান্য হয়েছে। অপর পক্ষে য়ুরোপে উদীয়মান পুঁজিবাদ নবজাগরণের সামাজিক ভিত্তি রচনা করেছিল। ফলে, রুশদ-এর পরম্পরা নব্য-য়ুরোপীয় সমাজের বিকাশে সহায়ক ভাবধারা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

ইসলামী দর্শন অংশের সঙ্গে তুলনায় আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের বিকাশের বিবরণ দিয়েছেন রাহুলজী সংক্ষিপ্তভাবে। গুরুত্বের বিচারে এই বিবরণ ও আলোচনা বিস্তারিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। নবম অধ্যায়ে তিনি য়ুরোপে দর্শন-সংঘর্ষের বিবরণ দিয়েছেন য়ুরোপের মধ্যযুগীয় দর্শনের বিকাশের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং আংশিকভাবে। য়ুরোপের মধ্যযুগীয় দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশের সামাজিক রাজনৈতিক পৃষ্ঠপটও উপস্থাপিত হয়নি। য়ুরোপের মধ্যযুগীয় দর্শন সম্বন্ধে সামগ্রিক একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাস-ভিত্তিক সমাজে প্রাচীন য়ুরোপীয় দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল। সেই দাস সমাজের অবলুপ্তির ফলে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের অবক্ষয় ঘটে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর য়ুরোপে জমি-ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত

হতে থাকে। খৃষ্টধর্মের ভাবধারা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সহায়ক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একদিকে খৃষ্টধর্মের যাজকতন্ত্র সুসংগঠিত রূপ নিতে থাকে, অপরদিকে সামন্ত ভূম্যধিকারীদের বশীভূত করে রাজতন্ত্র সুদৃঢ় হতে থাকে। পরিণামে খৃষ্টান যাজকতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন দর্শনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। দর্শনের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় প্রশ্নের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা কখনো বা খৃষ্টধর্মের পোপের অনুকূলে কখনো বা রাজার অনুকূলে গেছে। প্রাচীন দর্শনের মধ্যে বাস্তবমুখীনতা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার যে পরিচয় ছিল তা হারিয়ে যায়। এই যুগের দর্শনকে য়ুরোপের মধ্যযুগীয় দর্শন বলা হয়।

খৃষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের প্রভাব সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যখন প্রবল ছিল তখন শিক্ষায়তনগুলি ছিল গোঁড়া যাজক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সমস্ত স্কুলের বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পণ্ডিতদের প্রধান কর্তব্য হয় ধর্মের বিশ্বাস ও বিধিনিষেধকে যুক্তির সাহায্যে সত্য বা সঠিক বলে প্রমাণ করা। এই ধারায় উদ্ভব হয় স্কলাস্টিক সম্প্রদায়ের। এদের কথা দিয়ে রাহুলজী নবম অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করেছেন। খৃষ্টধর্মীয় পরিমণ্ডলে উদ্ভূত আরও কয়েকটি দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল যেমন, ফ্রানসিসকান ও ডোমিনিকান। তাদেরও পরিচয় দিয়েছেন রাহুলজী।

রাহুলজী যে দর্শন সংঘর্ষের কথা বলেছেন সে সংঘর্ষ ঘটেছিল খৃষ্টধর্মীয় পরিমণ্ডলের দার্শনিক মতগুলির সঙ্গে য়ুরোপের ইসলামী দার্শনিকদের মাধ্যমে প্রচারিত প্রাচীন গ্রীক দর্শনের বিশেষত অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার। অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার বাস্তবমুখীনতার দিকটি বিশেষ করে তুলে ধরেছিলেন রুশদ।

দশম অধ্যায়ে রাহুলজী য়ুরোপীয় দর্শনের বিবরণ দিতে শুরু করেছেন পঞ্চদশ শতক থেকে। এখান থেকে য়ুরোপীয় দর্শনের নব্য পর্যায় বা আধুনিক পর্যায় শুরু। এখান থেকে আরম্ভ করে মার্কসীয় দর্শনের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত য়ুরোপীয় দর্শনের বিকাশের বিবরণ সংক্ষেপে হলেও মোটামুটি উপস্থাপিত করেছেন রাহুলজী।

আধুনিক য়ুরোপের দার্শনিকদের যে পরিচয় রাহুলজী দিয়েছেন তার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু বিভ্রান্তি আছে।

ডেভিড হিউমকে (১৭১১-১৭৬৬ খৃঃ) রাহুলজী সন্দেহবাদী বলেছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে জ্ঞানের প্রশ্নে সন্দেহবাদের শুরু হয় হিউমের মধ্যে, কিন্তু হিউমের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে মানুষ আসলে বস্তুর জ্ঞান আদৌ লাভ করতে পারে না। অতএব তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত।

হার্বার্ট স্পেন্সারকে (১৮২০-১৯০৩ খৃঃ) রাহুলজী বলেছেন অজ্ঞেয়তাবাদী। অজ্ঞেয়তাবাদ ইংরেজী Agnosticism-এর সঠিক প্রতিশব্দ নয়, সঠিক প্রতিশব্দ হলো অজ্ঞেয়বাদ। স্পেন্সারকে অজ্ঞেয়বাদী আখ্যা দিতে হবে। অজ্ঞেয়বাদীদের মতে কেবল যে বিশ্ব-বিধাতাই অজ্ঞেয়, তাই নয়। মানুষের কাছে প্রাকৃতিক বিধান,

সমাজ-বিকাশের ধারা সবই অজ্ঞেয়। তাই তাঁদের মতে বিজ্ঞান যে বিশ্বজগতের কোনো নির্দিষ্ট জ্ঞান আমাদের দিতে পারে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এঙ্গেলস তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ অ্যান্টি ড্যুরিঙ-এ অজ্ঞেয়বাদকে খণ্ডন করেছেন।

উইলিয়ম জেম্‌সকে (১৮৪২-১৯১০ খৃঃ) রাহুলজী য়ুরোপীয় দার্শনিকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জেম্‌স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এবং ভাববাদী দার্শনিক। তিনি প্রাগমেটিজমে বা প্রয়োগবাদেরও অন্যতম প্রবক্তা। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপক ছিলেন।

মার্কসীয় দর্শন অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন রাহুলজী বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ গ্রন্থে। বর্তমান গ্রন্থে রাহুলজী সংক্ষেপে মার্কসীয় দর্শনের সার কথা বিবৃত করেছেন।

আমাদের বিশ্বাস সাধারণ শিক্ষিতজন যেমন এই গ্রন্থপাঠে মার্কসীয় দর্শনের ও তার গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন তেমনি দর্শন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও এই গ্রন্থে চিন্তার অনেক নতুন বিষয় পাবেন।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়



রাহুল সাংকৃত্যায়ন

(৯. ৪. ১৮৯৩—১৪. ৪. ১৯৬৩)

রাহুল জীবন-কথা

জীবনের প্রারম্ভে রাহুলের নাম ছিল কেদারনাথ পাণ্ডে। ১৮৯৩ সালে উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার পান্‌হা গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। রাহুলের পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে ছিলেন ধর্মপ্রাণ, প্রায়-নিঃস্ব কৃষক। মাতা কুলবন্তী বাপের বাড়িতেই থাকতেন। কুলবন্তীর মৃত্যু হয় মাত্র আটাশ বছর বয়সে এবং পিতার মৃত্যু হয় মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। কাজেই শিশু রাহুলকে লালন-পালন করেন তার স্নেহময়ী মাতামহী।

১৮৯৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য রাহুলকে এক মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি উর্দু বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হন। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে রাহুলই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। রাহুলের খুব বাল্যকালেই তাঁর মাতা ও একমাত্র বোনের মৃত্যু হয়। খুব অল্প বয়সেই রাহুলের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রথমা স্ত্রীকে তিনি কখনও দেখেননি।

পরবর্তী কালের বিশ্ব পর্যটক রাহুল ঘর ছাড়েন ন'বছর বয়সে। প্রথমে তিনি যান বেনারসে এবং তাঁর বয়স যখন চোদ্দ তখন যান কলকাতায়। কেন তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন তার সঠিক কারণ খুব স্পষ্ট নয়। অবশ্য রাহুল লিখেছেন বিপুলা পৃথিবীকে দেখা ও জ্ঞানান্বেষণের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর গৃহ ত্যাগের কারণ। কিন্তু কলকাতার মতো জনবহুল, বিশাল, বিচিত্র শহরে হতাশ হয়ে তিনি গ্রামে ফিরে যান। ১৯০৯ সালে ষোলো বছর বয়সে রাহুল পুনরায় কলকাতায় আসেন এবং এক তামাকের দোকানে কাজ করেন। সেখানে মাদক জাতীয় মিষ্টি খাওয়ার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

১৯১০ সালে তরুণ রাহুল প্রথা-সিদ্ধ জীবন-যাপন প্রণালীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করে ভ্রাম্যমাণ জীবন-যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময়ে তিনি সাধু-সঙ্গ গ্রহণ করেন। মূল সংস্কৃতে বেদান্ত পড়ার জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে পড়েন তিনি। অল্প সময়েই তিনি সাধু-সঙ্গ সম্পর্কে মোহমুক্ত হন এবং তাদের অন্ধ বিশ্বাস ও গোঁড়ামির তীব্র সমালোচক হয়ে ওঠেন। অবশেষে তিনি একজন নিরীশ্বরবাদী ও চরম জড়বাদী হয়ে ওঠেন, কিন্তু এই দর্শন তত্ত্বের পথ ছিল যেমন দীর্ঘ তেমনি বন্ধুর।

ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে পদব্রজে অযোধ্যা ও মোরাদাবাদ এবং বিনা টিকিটে হরিদ্বারও ভ্রমণ করেন। হিমালয় তাঁকে আকর্ষণ করেছে প্রবলভবে। দুর্গম

কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করে বদ্রী-কেদার, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ভ্রমণ করেছেন। প্রথমবার হিমালয়ে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করেছিলেন তিনি ১৭ বছর বয়সে। এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। হিমালয় পেরিয়ে নিষিদ্ধ দেশে যাবার ব্যাকুলতা তাঁর মনকে বারবার হাতছানি দিয়েছে। বেনারসে চক্রপাণি ব্রহ্মচারীর মঠে বাসকালে তিনি ধ্রুপদী (classical) সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির পাঠ নিয়েছেন।

উনিশ বছর বয়সে প্রথম যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসা জেগেছে তাঁর মনে। বিদগ্ধ পণ্ডিত রাম-অবতার শর্মা বেদ এবং ভগবানে বিশ্বাস করতেন না। রাহুল রাম-অবতার শর্মার কাছে পাঠ নিয়েছেন। দয়ানন্দ-স্কুলে ভর্তি হয়ে ইংরেজী ও অঙ্কে শিক্ষা নিলেন। কিন্তু গতানুগতিক পথে শিক্ষা লাভ করা তাঁর ভাগ্যে ছিল না।

'পারাসা' মঠে রাহুল প্রথা-সিদ্ধ সাধুতে পরিণত হলেন। কেদারনাথ পাণ্ডে থেকে নাম পরিবর্তন করে হলেন রাম উদর দাস। তিনি মন্দিরের দেবতার পূজারী হিসেবে জাঁক-জমকপূর্ণ পূজা পদ্ধতির মাধ্যমে মঠ-অধিকারীর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের মোহে আয়েসে সীমাবদ্ধ জীবন লাভের প্রয়াসী ছিলেন না। তিনি 'সরস্বতী', 'ডন' ও বিভিন্ন হিন্দী-ইংরেজী মাসিকা পত্রিকা পড়তে লাগলেন এবং বহু সংস্কৃত ও হিন্দী পুস্তক ক্রয় করলেন।

পড়াশোনার সুযোগ না থাকায় রাহুল কয়েকমাসের জন্য নিজের গ্রাম কনাইলাতে গেলেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করার সুযোগ নিজের গ্রামে না থাকায়, তিনি পুনরায় পারাসা মঠে ফিরে এলেন। আঞ্চলিক ভাষা ও নৃতত্ত্ব-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর আবেগপূর্ণ।

১৯১৩ সালে আবার বুদ্ধিজীবীর ক্ষুধা নিয়ে পারাসা ত্যাগ করলেন। বিনা টিকিটে আসানসোল, আদ্রা এবং খড়্গপুর হয়ে পুরী পৌঁছুলেন। পুরী তীর্থ থেকে গেলেন মাদ্রাজে এবং সেখান থেকে পদব্রজে তিরুমালাই গেলেন। দক্ষিণ ভারতে থাকাকালীন তিনি তামিল ভাষা শিখতে শুরু করলেন ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে সাধু বেশে ঘুরে বেড়ালেন। ১৯১৪ সালে ফিরে এলেন পারাসা মঠে। তৎকালীন ভারত সরকারের দু'জন ফটোগ্রাফার পারাসা মঠ পরিদর্শনে আসেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে রাহুলজী ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী হন। পরবর্তীকালে ফটোগ্রাফি তাঁর নেশায় পরিণত হয়। মঠের দমবন্ধ আবহাওয়া পরিত্যাগ করে রাহুল গোপনে আর্যসমাজী প্রচারকদের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং ভাষণ ও বিতর্কের আসর গঠন করলেন।

১৯১৫-১৯২২ এই সময়কালকে রাহুল 'নতুন আলোর' যুগ বলেছেন। তাঁর পিতামহের মৃত্যু হয় এই সময়ে। পিতা গোবর্ধন পাণ্ডের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রাহুলকে সুগৃহস্থ করে সুস্থির ঘরোয়া জীবনে ফিরিয়ে আনা যাবে। কিন্তু রাহুল বিদ্রোহী।

১৯১৫ সালে তিনি আগ্রায় আর্য-মুসাফির বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। দু'বছর সংস্কৃত, আরবী, বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্বাদর্শ এবং ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করলেন। সুশৃঙ্খল জীবন-যাত্রার মধ্য দিয়ে সরল জীবন-যাপনের প্রতি তাঁর অনুরাগ জাগল এবং আবছা রাজনীতিক চেতনা লাভ করলেন তিনি। ১৯১৫ সালে আগ্রার 'মুসাফির' পত্রিকায় কেদারনাথ বিদ্যার্থী উর্দু ভাষায় প্রবন্ধ রচনা শুরু করলেন। মীরাটের হিন্দী পত্রিকা 'ভাস্কর'-এ রাহুল তাঁর প্রথম দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। প্রবন্ধটির বিষয় ছিল —ভেকধারী সাধুরা কিভাবে গৃহস্থদের প্রতারণা করে তার মুখোশ খুলে দেওয়া।

সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালে রাহুল লাহোর গেলেন। এই সময়ে পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল। তিনি দিল্লী ও হরিয়ানা হয়ে লাহোর পৌছান। তখন লাহোর ছিল আর্য সমাজীদের শক্ত ঘাঁটি। সেখানে আর্য সমাজীদের সব ক'টি মঠ পরিদর্শন করে তাঁর মনে হলো আর্য সমাজীরা বড়ই গোঁড়া ও অন্ধগলির পথিক। আর্য সমাজীরা এই 'আর্য-মুসাফির'কে তাঁদের কোনো মঠে ঠাঁই দিলেন না। রাহুলের পিতা আরেকবার তাঁকে গৃহস্থ-জীবনে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন। কিন্তু রাহুল তাঁর গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে অসম্মত হন। এই সময়ে তিনি চিঠি-পত্র সংস্কৃতে লিখতেন। এমন কি ১৯২২ সালে যখন তিনি বক্সার জেলে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে আবদ্ধ ছিলেন তখন দিনলিপি পর্যন্ত সংস্কৃতে লিখতেন।

১৯১৮ সালে উর্দু, ইংরেজী ও হিন্দী সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাহুল রুশ-বিপ্লবের সংবাদ পেলেন। 'আদর্শ-সাম্যবাদী সমাজ'-এর ভাবনায় তিনি নিমগ্ন হলেন। ১৯২২ সালে এ বিষয়ে তিনি সংস্কৃত কাব্যের মাধ্যমে একটি খসড়া লেখেন। ১৯২৩-২৪ সালে হাজারিবাগ জেলে বসে লিখলেন, 'বাইসবী সদী' (বিংশ শতাব্দী) —একটি গ্রন্থে তাঁর স্বপ্নের রাজনৈতিক আদর্শের বনিয়াদ গ্রথিত করলেন। ১৯১৯ সালে লাহোরে সামরিক আইন জারী করা হয়। এই সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা রাহুলকে কঠোর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। মঠ কিংবা আর্য সমাজীদের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক ছিন্ন হলো। 'ডায়ার-শাহী'র অন্ধকার দিনগুলো বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর মনে ঘৃণার আগুন জ্বালল। শাণিত লেখনীর মাধ্যমে অনেক ভারতবাসীর মুখোশ তিনি খুলে দিলেন। এইরকম খোলাখুলি দৃঢ়-মত প্রকাশের জন্য রাহুলকে সংস্কৃত-শাস্ত্রী পরীক্ষায় পাশ করানো হলো না। এরপর তিনি চিত্রকুটে কাশী ন্যায়মধ্যমা পরীক্ষা দিলেন, সেখানেও উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। কিন্তু জব্বলপুর কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মীমাংসা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন।

রাহুলের পায়ের তলায় ছিল সরষে। ভ্রমণের নেশা কখনও ত্যাগ করতে পারেননি। ১৯২০ সালে ২৭ বছর বয়সে তিনি বিনা টিকিটে বেনারস যান এবং

সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর সারনাথে গেলেন প্রথম বার, সেখান থেকে বুদ্ধের পরিনির্বাণস্থল কাসিয়াতে গেলেন। এই ভ্রমণ সম্পর্কে উচ্ছাস-ভরা কাব্যময় ভাষায় তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি একে একে নেপাল, কপিলাবস্তু, লুম্বিনী প্রভৃতি স্থানে ঘুরলেন। নিগালিহারার পুষ্করিণীতে প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসন তাঁকে আকৃষ্ট করে। ভোটিয়াদের দেশে যাবার ইচ্ছা জাগে তাঁর মনে। জনৈক নেপালী মহান্ত তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে তিনি রাজী হলেন না। তিনি কটাক্ষের সঙ্গে গাঁজাটানা অসচ্চরিত্র যোগিনীদের সঙ্গে পুরোহিতদের যথেচ্ছাচারের কথা উল্লেখ করেছেন।

রাহুলের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯২১ সালে, খাণ্ডোয়ায় অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতার মাধ্যমে। সাধুর বেশে তিনি সালেমপুর কংগ্রেস কমিটিতে যোগ দিলেন এবং পারাসায় রাজনৈতিক কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ছাপরায় রাহুল বন্যাদুর্গতদের সেবা করেন এবং ভোজপুরীতে তীব্র বৃটিশ বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ৩১ জানুয়ারী, ১৯২২-এ গ্রেপ্তার হন। কারাগারে হাত-সাফাই হয়ে তাঁর হাতে আসে ট্রটস্কির ‘বলসেভিজম ও বিশ্ব-বিপ্লব’। রাহুল সংস্কৃত ভাষায় একটি রাজনৈতিক ভজন রচনা করেন এবং দরাজ গলায়, কারারুদ্ধ সহকর্মীদের হৃদয়ে সাড়া জাগানোর জন্য সেটি গেয়েছিলেন —“শোনো অভিযাত্রী, আমি একা নই।”

বক্সার জেলে তিনি ছ’মাস ছিলেন। সেখানে ব্রজভাষায় কবিতা লেখেন ও ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের ‘অন্ধের নগরী’ মঞ্চস্থ করেন। জেলেই সংস্কৃত ভাষায় কোরাণ অনুবাদ শুরু করেন। তাছাড়া সেখানেই সহ-বন্দীদের উপনিষদ ও বেদান্তের শিক্ষাদানও করেন। জেলের মধ্যে রাহুলের কাজ-কর্মের বিবরণ গোপনে বাইরে চলে আসে এবং মজাহরুল হকের ‘মাদার ল্যাণ্ড’-এ তা প্রকাশিত হয়।

রাহুল জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন ১৯২২ সালে। কংগ্রেসের স্বরাজ্য পার্টির দিকে ছিল তাঁর অবস্থান। ধীরে ধীরে তিনি কমিউনিস্টদের বিপ্লবী মতবাদ অবলম্বন করেন। ১৯২৩ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে তিনি নেপাল যান, সেখানে দেড় বছর থাকেন। বহুসংখ্যক বৌদ্ধ মনীষী ও ভিক্ষু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন।

নেপাল থেকে ফিরে রাহুল পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং বাঁকীপুর জেলের এক নির্জন কারাকক্ষে তাঁকে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁকে হাজারীবাগ জেলে প্রেরণ করা হয়, সেখানে তিনি দু’বছর কারান্তরালে থাকেন। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গ্রন্থ পাঠ করেন।

কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি তাঁকে শ্রীলংকায় বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে গবেষণার কাজে প্রভূত সাহায্য করেন। রাহুল চার বার তিব্বত গিয়ে অতি মূল্যবান পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকাদি সংগ্রহ করে আনেন। ধর্মকীর্তির বিখ্যাত গ্রন্থ ‘প্রমাণ-বার্তিক’ যা আমাদের দেশে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা রাহুলই তিব্বত থেকে উদ্ধার

করে আনেন এবং তিব্বতী ভাষা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে তিব্বত যাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না।

'বৌদ্ধ দর্শন'-এর বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক অধ্যাপক সেশবাটস্কি তাঁর স্মৃতি-চারণায় বলেছেন, তিনি ছাড়া মাত্র আর একজনই পৃথিবীতে আছেন যিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ দর্শনের ওপর প্রামাণ্য কিছু বলার অধিকার রাখেন—তিনি হলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। এর পরই রাহুলকে সোভিয়েত রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। জীবন-সায়াহ্নে রাহুল শ্রীলংকা বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ভারতবর্ষের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় রাহুলকে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ করেননি, এমন কি অনুমতিও দেননি। কেন না রাহুলের কোনো ডিগ্রীর তকমা ছিল না। প্রভাকর মাচওয়েকে অনুসরণ করে বলা যায় —কি দুঃখজনক আমাদের বিদ্যা-নিকেতনের আমলাতন্ত্র!

রাহুলকে রাজনৈতিক কর্মে জড়িত হয়ে বহুবার কারাবাস করতে হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি বিহারের কৃষক আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪০-এ মতিহারির কৃষক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং ২৯ মাস হাজারিবাগ ও দেওলি জেলে কাটান। এই সময়ই তিনি লেখেন, প্রায় ন'শো পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ, অনন্য কীর্তিস্তম্ভ —'দর্শন-দিগ্‌দর্শন'।

স্বল্প পরিসরে রাহুল জীবন-কথা ও অবদান পরিপূর্ণ করে লেখার চেষ্টা, ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র সেঁচে তোলার মতো ব্যর্থ চেষ্টা। চির-পরিব্রাজক, অনলস জ্ঞান সাধক রাহুলজীর বিরাটত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর রচনা সম্ভারের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।*

মৃণাল চৌধুরী

* রচনাটি প্রভাকর মাচওয়ের তথ্য অবলম্বনে লিখিত

রাহুলজীর জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলী

৯ এপ্রিল ১৮৯৩	উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার পান্‌হা গ্রামে মাতামহের গৃহে জন্ম। পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে, মাতা কুলবন্তী। আদি নাম কেদারনাথ। চার ভ্রাতা এক ভগ্নীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
১৯১২-১৩	পারসা-মঠের সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা।
১৯১৩-১৪	দক্ষিণ ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ।
১৯২২	ছ'মাসের জন্য বক্সার জেলে বন্দী থাকা। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি।
১৯২৩-২৫	হাজারীবাগ জেলে থাকা।
১৯২৭-২৮	শ্রীলংকায় সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক হওয়া। বৌদ্ধ-সাহিত্য পাঠ।
১৯২৯-৩০	তিব্বতে দেড় বছর বাস।
১৯৩২-৩৩	ইংলণ্ড ও ইউরোপ গমন।
১৯৩৪	দ্বিতীয়বার তিব্বত যাত্রা।
১৯৩৫	জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, সোভিয়েত দেশ ও ইরাণ যাত্রা।
১৯৩৬	তৃতীয়বার তিব্বত যাত্রা।
১৯৩৭	দ্বিতীয়বার সোভিয়েত যাত্রা।
১৯৩৮	চতুর্থবার তিব্বত যাত্রা। ইগরের জন্ম।
১৯৩৯	আমাবরীতে কিষাণ-সত্যাগ্রহ এবং কারারুদ্ধ হওয়া।
১৯৪০-৪২	হাজারীবাগ কারাগার ও দেওলী ডিটেনসন ক্যাম্পে বাস।
১৯৪৩	৩০ বছর পর জন্ম-গ্রামে যাওয়া। তাঁর প্রথম পত্নী দেখা করতে আসেন। উত্তরখণ্ডে যাত্রা।
১৯৪৪-৪৭	সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়া।
১৯৪৭-৪৮	এলাহাবাদে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি।

১৯৫০	মুসৌরীতে একটি বাড়ি ক্রয় ও পরে বাড়িটি বিক্রী করে দেওয়া।
১৯৫৩	কন্যা জয়ার জন্ম।
১৯৫৫	পুত্র জেতার জন্ম।
১৯৫৮	জনগণতান্ত্রিক চীনে সাড়ে চার মাস অবস্থান।
১৯৫৯-৬১	শ্রীলংকায় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ।
ডিসেম্বর, ১৯৬১	স্মৃতি-ভ্রংশ।
১৯৬২-৬৩	সাত মাসের জন্য চিকিৎসা-উপলক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া যাত্রা।
১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৩	মৃত্যু।

রাহুলজীর প্রতি প্রদত্ত সম্মানসূচক উপাধি

১	মহাপণ্ডিত	কাশী পণ্ডিত সভা
২	ত্রিপিটকাচার্য	বিদ্যালংকার পরিবেনা, শ্রীলংকা
৩.	সাহিত্য বাচস্পতি	হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, এলাহাবাদ
৪.	ডি. লিট. (Hon.)	ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগলপুর
৫.	ডি. লিট. (Hon.)	বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীলংকা
৬.	পদ্মভূষণ	ভারত সরকার

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

১ আয়োনীয় (গ্রীক) দর্শন

সিন্ধু' শব্দ থেকে যেমন সারা দেশের নাম হিন্দুস্থান বা পারস থেকে সারা দেশের নাম পারস্য (ইরাণ) হয়ে গেছে তেমনই আয়োনীয় বা যবন ছিল ছোট একটি প্রদেশের নাম যার থেকে সারা দেশের নাম হয়ে গেছে যবন বা আয়োনীয় বা (গ্রীকদেশ)। বস্তুত ইবন বা যবন (এথেন্স) ইত্যাদি দেশের অবস্থান ছিল ক্ষুদ্র এশিয়া (আধুনিক এশীয় তুর্কী) এবং ইউরোপের মধ্যে সমুদ্রাঞ্চলে। এখানকার অধিবাসী নাগরিকগণ সকলেই নাবিকের জীবন-যাপন করত, ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল তাদের জীবিকা, এতেই ছিল তারা দক্ষ। বাণিজ্য উপলক্ষে তারা বহু দূর-দূরাঞ্চলে সমুদ্রযাত্রা করত। এইভাবে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে যখন তারা বাহির্দুনিয়াকে অনেকটা জানল এবং তার সঙ্গে অভ্যস্থ হয়ে গেল তখন তাদের নামানুসারে সমগ্র দেশের নামই হয়ে গেল গ্রীস।

শুধু ব্যবসা বাণিজ্যই নয় শিল্পকলায়ও গ্রীকগণের সমান পারদর্শিতা ছিল এবং কুশলী গ্রীক কারিগরগণের হস্তনির্মিত শিল্পসামগ্রীর চাহিদাও বহির্জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীক বণিকগণ অন্যান্য দেশে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক পরিবর্তন সাধনই করল না পরন্তু বাণিজ্য-বিনিময়ও করতে লাগল। কার্লা গুহায় অঙ্কিত শিল্প নিদর্শন ও বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠের গায়ে খোদিত ভাস্কর্য শিল্পের ওপর গ্রীক ভাস্কর্য রীতির স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় (গান্ধার শিল্প)। এখন আমি যে সময়ের কথা আলোচনা করছি তার পিছনে আছে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ইতিহাস। গ্রীক বণিকগণ বাণিজ্যের মাধ্যমেই এই অত্যন্ত প্রাচীন ও সম্মানীয় কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়। তারপর এই সুপ্রাচীন সভ্যতা থেকে জ্যামিতি, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণ করে মেধাবী ছাত্রগণের মাধ্যমে তা প্রচারিত করেছিল। এই ভাব-বিনিময়ের দ্বিতীয় ফল হয়েছিল, গ্রীক দর্শনের সবচেয়ে পুরনো শাখা ও আয়োনীয় সম্প্রদায়ের (থালেস, অ্যানাক্সিমাণ্ডার, অ্যানাক্সিমেন প্রভৃতি দার্শনিকগণের) আবির্ভাব।

§ ১. তত্ত্বজিজ্ঞাসু আয়োনীয় (গ্রীক) দার্শনিক

(৬০০-৪০০ খৃষ্টপূর্ব)

আয়োনীয় দার্শনিকগণ প্রধানত সৃষ্টির মূলতত্ত্বকে জানার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাঁদের দার্শনিক চিন্তার মূল উপজীব্যই ছিল বিশ্ব-সৃষ্টির উৎস কোথায়, এই প্রশ্নের সদুত্তর আবিষ্কার করা। এ শুধু আকাশচারী কল্পনা নয়, অ্যানাক্সিমাণ্ডারকে আমরা দেখি ঐ সময়ের জ্ঞাত জগতের একটা নক্সা প্রস্তুত করতে যা বহুদিন ধরে বণিকদের পথ-প্রদর্শকের কাজ করেছিল। দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা দার্শনিক ব্যবহার বা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের দ্বারা নিজেদের জীবন-বিমুখ করে রাখতে চাননি, বরং বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছেন। এর এক শতাব্দী পূর্বেই আমরা উপনিষদের দার্শনিক-গণকেও প্রশ্ন করতে দেখি, বিশ্বের মূল উপাদান কি —'যে এককে জানলে সব কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায়।' আমাদের এখানে কেউ অগ্নিকে মূলতত্ত্ব বলেছেন, কেউ আকাশকে, কেউ বায়ুকে আবার কেউ বা আত্মা ব ব্রহ্মকে। আয়োনীয় দার্শনিক থালেস-এর (৬২৪-৫৪৭ খৃঃ পূঃ) মতে 'জলই প্রথম উপাদান'। অ্যানাক্সিমাণ্ডার (৬১১-৫৪৬ খৃঃ পূঃ) বলেছেন যে বস্তুর যে স্থূল সীমাবদ্ধ রূপ দেখতে পাওয়া যায় মূল উপাদান তার থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি এর নাম দিয়েছেন অনন্ত এবং অনিশ্চিত। এই অনন্ত উপাদান থেকেই অগ্নি, বায়ু, জল ও মৃত্তিকা —মূল উপাদানের উদ্ভব। তবে অ্যানাক্সিমিনিস (৫৮৮-৫২৪ খৃঃ পূঃ) জলকেই মূলতত্ত্ব বলে মেনেছেন। এই পুরনো আয়োনীয় দার্শনিকগণের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে, তাঁরা কেউ প্রশ্ন করেননি বিশ্বকে সৃষ্টি করেছে কে। তাঁদের প্রশ্ন ছিল, 'কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে'? ভারতেও তাঁদের সমকালীন চার্বাক ও বুদ্ধও সৃষ্টিকর্তা বিধাতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ছিলেন না। আয়োনীয় দার্শনিকগণ জীবনকে এত তুচ্ছ মনে করতেন না যে, তার জন্য পৃথক একটা চেতন চালক-শক্তির প্রয়োজন হবে। মেঘগর্জন, বহমান নদী, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, দোলায়িত বৃক্ষ, স্পন্দিত পৃথিবী, প্রাণের স্ফুরণকেই প্রমাণ করে, এর জন্য কোনো স্রষ্টা বা অন্তর্যামীকে জানার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেননি। বস্তুজ্ঞানই তাঁদের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়েছিল।

এই আয়োনীয় দার্শনিকগণই পাশ্চাত্য দর্শনকে বিকাশিত করার প্রথম প্রয়াস করেছিলেন।

§ ২. বুদ্ধিবাদ

পিথাগোরাস (৫৮২-৪৯৩ খৃঃ পূঃ)। আয়োনীয় দার্শনিকগণের পরে অন্যান্য অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা বিচারকগণকে আরও সূক্ষ্ম তর্কবিতর্কে লিপ্ত

হতে দেখেছি। আয়োনীয় দার্শনিক এই মহাবিশ্বের প্রান্তে মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন। পিথাগোরাসকে আমরা এইভাবেই লাফ দিয়ে প্রান্ত থেকে অগ্রসর হতে দেখেছি। তিনি শুধু দার্শনিকই নন, তৎকালে একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ছিলেন। শোনা যায় যে, তিনি ভারতে এসে ভারতীয় দার্শনিক চেতনায় প্রভাবিত হয়ে 'শরীরাৎ-ব্রহ্ম'-বাদ এবং পুনর্জন্মবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, তার দর্শনে এটা স্পষ্ট যে তিনিও উপনিষদের ঋষিগণের ন্যায় এই জড়-বিশ্বকে ছাড়িয়ে কল্পলোকে বিচরণ করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় দর্শন-পরম্পরায় এই ধরনের দর্শনের নামই ভাববাদ। পিথাগোরাস স্থূল-শরীর ছেড়ে আকৃতির মধ্যেই মূলতত্ত্বের অনুসন্ধানে রত হলেন। অর্থাৎ পঞ্চভূত ভাবাত্মক বস্তুর সন্ধান শুরু করলেন। তিনি বলেছেন যে, জড়-জগৎ মূলতত্ত্ব নয়, তার সূক্ষ্ম রূপও নেই; মূলতত্ত্ব হলো পদার্থের আকৃতি। বীণার তারের দৈর্ঘ্য সুরের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। অঙ্গুলির সাহায্যে তাকে আমরা যেভাবে বাজাই সেভাবেই সে বাজে। বীণার তারের দৃষ্টান্ত পিথাগোরাসকে অনেক বেশী দার্শনিক উপযোগিতা দিয়েছে। শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তিনি বলেছেন যে, দেহও আকৃতির ওপর (রোগা, মোটা, লম্বা, বেঁটে) নির্ভরশীল। এর দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মূলতত্ত্ব আকৃতি-নির্ভর এবং সংখ্যা দ্বারা তাকে প্রকট করা যায়; সংখ্যাই প্রতিটি বিষয়বস্তুর মূল শক্তি। আমাদের বৈয়াকরণগণের শব্দ-ব্রহ্মের ন্যায় পিথাগোরাসের সংখ্যা-ব্রহ্মরূপ মহাবাক্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তৎকালীন গ্রীসীয় সংখ্যা-সঙ্কেত কিছু বিন্দুকে প্রাধান্য দিয়ে লেখা হয়েছিল—এই ব্যাপারটা আমাদের এখানেও ব্রাহ্মীলিপির সংখ্যায় প্রযোজ্য হয়েছিল, যাতে দেখানো হয়েছে সংখ্যা থেকেই সংখ্যা-সঙ্কেত সৃষ্ট। এ থেকেও সংখ্যা-ব্রহ্মের প্রচারে পিথাগোরাসের অনুগামীগণের সুবিধা হয়। বিন্দু রেখা সৃষ্টি করে, রেখা থেকে তল, তল থেকে ঘন পদার্থসমূহ সৃষ্টি হয়। অতএব বিন্দু বা সংখ্যাই সমস্ত জড় পদার্থের মূল। আয়োনীয় দার্শনিকগণের বিচারধারা অন্যান্য চিন্তাধারাকে গতি দান করে নিজে লয় প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পিথাগোরাসের বিচারধারা এমন এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়েছিল যা কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচলিত থেকে প্লেটো-অ্যারিস্টটলের দর্শনকে উজ্জীবিত করেছে।

১—অদ্বৈতবাদ

ইরাণের শাহ্‌ সাইরাস (৫৫০-৫২৯ খৃষ্টপূর্ব) যখন ক্ষুদ্র এশিয়া জয় করে সমস্ত গ্রীস অধিকার করেন তখন বহু সম্ভ্রান্ত গ্রীক নাগরিক বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যান। পিথাগোরাসের অনুগামী কতিপয় ব্যক্তি দক্ষিণ ইতালীতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। পিথাগোরাস শুধুমাত্র দার্শনিক শিক্ষাই দেননি বুদ্ধের ন্যায় একটি সম্প্রদায়েরও (Brotherhood) প্রতিষ্ঠা করেন, যার নিজস্ব মঠ ও সাধক সদস্য

ছিল। ইতালীর পণ্ডিতগণ অবশ্য শুদ্ধ দার্শনিক পহলুকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন, এঁ দর্শন ছিল স্থিরবাদ। স্থূল দৃষ্টিতে পরিবর্তনকে দেখা গেলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষ করলে স্থির তত্ত্বে পৌঁছানো যায়।

(১) জেনোফেনস (৫৭৬ (?)-৪৯০ খৃষ্টপূর্ব) ইতালীর দার্শনিক জেনোফেনসের দেবতাগণের বিরুদ্ধে একটি বাক্য খুব প্রসিদ্ধ —"লোকে বিশ্বাস করে দেবতাগণেরও তাঁদের মতো অস্তিত্ব বর্তমান, তাঁদেরও ইন্দ্রিয়, দেহ, বাক্‌শক্তি আছে আবার গরু বা ঘোড়ার যদি নির্মাণক্ষমতা থাকত তবে দেবগণের চেহারা তারা স্বীয় স্বরূপানুযায়ী করেই তৈরী করত। দেখা যায় আবিসিনীয়গণের দেবমূর্তি কালো ও চেপ্টা নাকওয়ালা, থ্রেসীয়দের দেবতা লাল চুলো, নীল-নয়ন।" জেনোফেনস একদিকে যেমন সাকার ঈশ্বরকে একেবারেই বিশ্বাস করতেন না তেমনই একাধিক দেবতার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেছেন, "মহান্ ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, দৈহিক বা বৌদ্ধিক কোনোভাবেই মনুষ্য-তুল্য নন।" উপনিষদের ঋষির মতো তিনি বলেছেন, "সব কিছুই একের মধ্যে নিমজ্জিত এবং সেই হলেন ঈশ্বর।" এই উক্তি থেকে একদিকে যেমন একেশ্বরবাদ তত্ত্ব এসেছে অপরদিকে তেমনই ব্রহ্ম অদ্বৈত তত্ত্বেরও সূচনা করেছে। ঐ একেশ্বরই ব্রহ্ম। নিজের ব্রহ্মবাদ সম্পর্কে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "ঈশ্বরই জগৎ, তিনি শুদ্ধ আত্মা মাত্র নন বরং সমস্ত প্রাণযুক্ত প্রকৃতি।" জেনোফেনস রামানুজের চেয়েও স্পষ্টভাবে ঈশ্বর ও জগতের অভিন্নতাকে মেনে নিয়েছেন, শঙ্করের মতো শুধু প্রকৃতিকে স্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি।

(২) পারমেনাইডিস (৫৪০ (৪)? খৃষ্টপূর্ব) ইতালীয়ান দার্শনিকগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হলেন পারমেনাইডস। "সৎ কখনও অসৎ হয় না, অসৎ থেকে সৎ সৃষ্টি হতে পারে না।" তাঁর এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় বৈশেষিকের "নাসদঃ সদুৎপত্তি" এবং ভাগবৎগীতার "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" উক্তির মধ্যে। এইভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে জগৎ এমন এক অদ্বিতীয়, নিত্য ও সত্যবস্তু যে, তাকে সৃষ্টি অথবা বিনাশ করা যায় না। বিশ্বের যে পরি পরিবর্তন আমরা দেখি তা ভ্রান্তবীক্ষণ মাত্র।

(৩) জেনো (জন্ম ৪৯০ খৃষ্টপূর্ব) ছিলেন ইতালীর একজন রাজনীতি দার্শনিক। সমস্ত ইতালীয়ান দার্শনিকের মতো তিনিও ছিলেন স্থির অদ্বৈতবাদী তিনিই প্রথম বাদ, প্রতিবাদ, দ্বন্দ্ববাদ এবং সংবাদের প্রয়োগ করেছিলেন বলে তাঁকে দ্বন্দ্ববাদের জনক বলা হয়। (তাঁর কৃত মতবাদের মধ্যে স্থিরবাদের সিদ্ধান্তই চরম, ক্ষণিকবাদের নয়।)

ইতালীয়ান দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকে প্রকৃতজ্ঞানের সহায়ক বলে মেনে নেননি, তাঁরা বলেছেন চিন্তন বা বিজ্ঞানের দ্বারাই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয় কেবল ভ্রম উৎপাদন করে। বাস্তবিকতা এক ও অভিন্ন। তার সাক্ষাৎকার ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভব নয়, চিন্তনের দ্বারাই তা পাওয়া যায়। এলিয়াটিক দর্শন স্থির-বিজ্ঞান, অদ্বৈতবাদ।

২—দ্বৈতবাদ

ভারতীয় রহস্যবাদের প্রভাবে ইতালীর অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ দ্রুত পরিণামে পৌঁছাতে চেয়েছেন ; কিন্তু এঁদের আগে থালেস প্রমুখ দার্শনিকগণ যে তাঁদের এই স্বদেশী নব্যধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আর এক বিচার-ধারা গড়ে উঠেছিল, যাঁরা স্থিরবাদের সমর্থক হয়েও জগতের পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করতেন দ্বৈতবাদ অনুযায়ী। অর্থাৎ মূলতত্ত্ব, অনেক, স্থির ও নিত্য ; এদের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই জাগতিক পরিবর্তন দেখা যায়।

(১) হেরাক্লিটাস (৫৩৫-৪৭৫ খৃষ্টপূর্ব) ইনি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। বুদ্ধের মতো তিনিও পরিবর্তনবাদ ও ক্ষণিকবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস আপনা-আপনিই হয়। সৃষ্টি সম্পূর্ণ হওয়ার পর অগ্নির মধ্যে তা লয় প্রাপ্ত হয়। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেও জল, অগ্নি এবং প্রলয়ের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য উপনিষদ এবং তার পূর্বের কোনো সাহিত্যে এর নাম পাওয়া যায় না। বুদ্ধের বাণীতে এর কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর আগে বসুবন্ধু তো তাঁর অগ্নি-সবর্তনী (অভিধর্ম কোষ)-তে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এর অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিলেন।

আয়োনীয় দার্শনিকগণের মতো অগ্নির অন্তিম-তত্ত্বকে স্বীকার করলেও হেরাক্লিটাস তার পরিবর্তনশীলতার ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। পরিবর্তমান জগতের সবকিছুই অগ্নিশিখার মতোই আবির্ভূত এবং অন্তর্হিত হয় : জগতে কিছুই স্থায়ী নয়, স্থায়িত্ব কেবল মায়া বা ভ্রম, যা পরিবর্তনের দ্রুততা তথা সদৃশ্য-উৎপত্তির কারণ, পরিবর্তনই জগতের প্রাণ বস্তু। এইভাবে হেরাক্লিটাস এলিয়াটিক থেকে ...দের মতবাদকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন দ্বৈতবাদী, ...দ্বৈতবাদী নয় ; স্থিরবাদী নয় পরিবর্তনবাদী।

হেরাক্লিটাস এফিসাসের এক বনেদী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে সেখানে ...চীন বনেদী বংশের প্রভুবর্গকে সরিয়ে গ্রীক বণিকগণ নিজেরাই শাসন-ক্ষমতা ...খল করে নিয়েছিল। হেরাক্লিটাসের মনে শৈশব স্মৃতি, "হায়! আমার সেই দিন হারিয়ে গেল" যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল —এই অবস্থাকে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। যুগ পরিবর্তনের হাওয়াই তাঁকে কালক্রমে একজন পরিবর্তনবাদী দার্শনিকে উন্নীত করেছিল। যদি বনেদী রাজত্ব বজায় থাকত তবে হয়ত এই পরিবর্তনের সত্যতা তাঁর কাছে অজ্ঞাতই থেকে যেত। হেরাক্লিটাস ব্যবহারিকভাবে তাঁর পরিবর্তনশীল দর্শন দ্বারা বণিক-শাসনকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছিলেন। আজীবন তিনি ছিলেন বনেদী মেজাজী এবং গণতন্ত্রকে অত্যন্ত

ঘৃণার চোখে দেখতেন, কারণ এই গণতন্ত্রই তো তাঁর শ্রেণীকে সিংহাসন থেকে তুলে নিয়ে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

হেরাক্লিটাসের রচনার খুব সামান্য অংশই পাওয়া গেছে। বিশ্বের অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীলতার সপক্ষে তিনি বলেছেন, "একই নদীতে দু'বার অবগাহন সম্ভব নয়, কেন না প্রতিটি মুহূর্তে নদীতে নতুন স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে। সৃষ্টির মাঝেই ধ্বংসের বীজ নিহিত, লয় থেকেই হয় পুনঃসৃজন। কোনো বস্তুরই স্থায়ী গুণ নেই। সুরের উত্থান-পতনের সমাগমই সঙ্গীত—বিরোধীর সমাগম (Unity of opposites)

সংঘর্ষের দ্বারাই জগৎ চালিত; "সব কিছুরই জনক ও চালক হচ্ছে সংঘর্ষ। এ না থাকলে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং গতিহীন হয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে।" অনিত্যতা বা পরিবর্তনের এই অমোঘ নিয়মের ওপর জোর দিয়ে হেরাক্লিটাস বলেছেন, "এ এমন এক নিয়ম যা দেবতা বা মনুষ্য কারও দ্বারাই সৃষ্ট হয়নি। স্বয়ংসৃষ্ট এই নিয়ম চিরন্তন। অগ্নি নিজ মাত্রা-মতো প্রজ্বলিত ও নির্বাপিত হয়।" তাঁর সমকালীন বুদ্ধের মতোই তিনি নিশ্চিত মাত্রা বা পরিমাপের ওপর জোর দিয়েছেন।

বহির্জগতেও হেরাক্লিটাস তাঁর এই পরিবর্তনবাদী দর্শন দ্বারা দ্বন্দ্বমূলক (ক্ষণিক) বস্তুবাদের (মার্কসীয় দর্শনের) জনকে পরিণত হন। বৌদ্ধ-দর্শনের লক্ষ্যও ছিল ঐ একই ধরনের। কিন্তু ধর্মীয় গোলকধাঁধায় তা এতই জটিল হয়ে পড়েছিল যে বিকাশিত হতে পারেনি। হেগেল পরবর্তী কালে একে অবলম্বন করেই এক সম্পূর্ণ ও গম্ভীর দর্শনের রূপ দিয়েছিলেন।

হেরাক্লিটাস মন অথবা বস্তু কোনোটাকেই গুরুত্বদানের প্রয়োজন অনুভব করেননি। হেগেল মনকে প্রাধান্য দিয়েছেন—পরিবর্তিত হয়েও মন বা ভাবই আসল সত্য, বস্তু নয়। এইভাবে তিনি জগৎ থেকে মনের দিকে না গিয়ে মন থেকেই জগতের দিকে যাবার প্রয়াস করে দ্বন্দ্ববাদকেই ভাববাদে পরিণত করে শীর্ষাসন করিয়ে রেখেছেন। মার্কস উভয় পর্যায়ের ক্ষমতা, পৃথিবীর ওপর রেখেছেন—বস্তু মনের বিকাশ নয়, বরং মনই বস্তুর চরম বিকাশ। ওপর থেকে নিচে নামা কঠিন নয় নিচে থেকে ওপরে ওঠাই শক্ত।

(২) অ্যানাক্সিগোরাস (৫০০-৪২৮ খৃষ্টপূর্ব) দ্বৈতবাদকে আরও বিকাশিত করেছিলেন। তাঁর মতে হেরাক্লিটাসের ন্যায় অগ্নির মতো কোনো একটি উপাদানকেই মূল উপাদান বা প্রধান বলে মানার প্রয়োজন নেই। সমস্ত দ্রব্যেরই একটা মৌল কারণ থাকে। এইগুলি অনেক প্রকারের হয় এবং তাদের মিলনে হয় নতুন দ্রব্যের জন্ম।

(৩) এম্পিডকলেস (৪৯৪-৪৩৪ খৃষ্টপূর্ব) অ্যানাক্সিগোরাসের সমসাময়িক এম্পিডকলেস মূল উপাদানের সঠিক সংখ্যা জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং গ্রীক দার্শনিকগণের শিক্ষানুযায়ী 'অগ্নি', 'বায়ু', 'জল', 'মাটি', এই চার 'বীজ' সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন। এই চার প্রকার 'বীজ'-এর পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের

ফলেই বস্তু সৃষ্টি ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। একে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "শরীরের রাগ, হিংসা প্রভৃতি যেমন মিলন ও বিচ্ছেদের কারণ, তেমন অনুভূতি বস্তুর মধ্যেও বর্তমান।" তাঁর খেয়ালী কল্পনা আরও অগ্রসর হয়ে বলেছে, "শুধু মূল বীজই নয়, জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহও প্রথমে পৃথক ছিল, পরে তারা পরস্পর মিলিত হয়ে প্রাণাবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে।" তিনি এমনও বলেছেন, "বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলনে যত রকম কায়া সৃষ্টি হয় তার মধ্যে যোগ্যতমটিই টি'কে থাকে, বাকিগুলি বিনষ্ট হয়।" তার এই থিওরী 'সেল' বা কোষ এবং বিকাশ সম্বন্ধীয় সমস্ত সিদ্ধান্তেরই পূর্বাভাষ।

(৪) ডিমোক্রিটাস (৪২০-৩৭০ খৃষ্টপূর্ব) তার পরমাণুবাদের জন্য শুধু গ্রীসেই শীর্ষস্থান অধিকার করেননি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমস্ত দার্শনিকের নিকটই এক সম্মানিত আসন অর্জন করেছিলেন। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, গ্রীক দর্শনের প্রভাবেই ভারতের দর্শনে পরমাণুবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। উপনিষদ, তার পূর্ববর্তী সাহিত্য, এমন কি জৈন ও বৌদ্ধ ত্রিপিটকেও আমরা এর সন্ধান পাইনি। গ্রীক দর্শনের ভারতীয় সংস্করণই হলো বৈশেষিক দর্শন। হয়ত এথেন্সের পুর-চিহ্ন 'ওল্ল' থেকেই বৈশেষিকের ঔলুক্য-দর্শন সৃষ্ট হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করব। ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে যখন বৈশেষিক দার্শনিকগণ পরমাণুবাদকে গ্রহণ করে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তখন তাদের মতবাদকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগের সমস্ত যুক্তিবাদী ভারতীয় দার্শনিকই —ন্যায়, জৈন, বৌদ্ধ, বৈশেষিক —পরমাণুবাদকে নিজ নিজ মতবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রহণ করেছিলেন। দর্শনের ক্ষেত্রে পরমাণুবাদকে শীর্ষস্থান দেবার কৃতিত্ব যদিও ডিমোক্রিটাসের প্রাপ্য, তথাপি পরমাণু সম্পর্কে প্রথম সজাগ হয়ে ওঠার দাবা তাঁর গুরু লিওসিপ্পাসের (৫০০-৪০০ খৃঃ পূঃ)। ডিমোক্রিটাস বুদ্ধের নির্বাণ লাভের ২৩ বছর পরে ৪২০ খৃষ্টপূর্বাব্দে থ্রেসের সমুদ্রতীরবর্তী আবদেরার বণিকনগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। পরমাণুবাদী ডিমোক্রিটাস এলিয়াটিক দ্বৈতবাদে প্রভেদ রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি চরম পরিবর্তনকে মেনে নেননি। বাস্তবিকতা নিত্য, ধ্রুব, অপরিবর্তনশীল বস্তুর অনন্ত-গতির ফলেই পরিবর্তন দেখা যায়। বস্তু একম্ অদ্বিতীয়ম্ নয়, একাধিক মূল উপাদানগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং এদের মাঝে ফাঁকা জায়গাটিই হলো আকাশ। মূল উপাদান অ-তোমন, অচ্ছেদ্য এবং অবেধ্য —'অতোমোন' শব্দটি থেকে ইংরেজী এটম (পরমাণু) শব্দটি এসেছে।

পরমাণু—পরমাণু অতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য এক উপাদান কিন্তু তা জ্যামিতির বিন্দু বা শক্তিকেন্দ্র নয়, এর পরিমাণ বা বিস্তার আছে। এ শুধু অঙ্কশাস্ত্রের বিচারেই নয়, কায়িক শক্তি দ্বারাও অবিভাজ্য, অর্থাৎ পরমাণুর ভেতর আকাশ নেই। সব পরমাণুর পরিমাণ এক নয় —অর্থাৎ এক রকম লম্বা, চওড়া বা ঘন নয়। পরমাণু

সহযোগে সৃষ্ট পিণ্ডের আকৃতিও বিভিন্ন প্রকার। ক্ষেত্র ও ক্রমবিশেষে পরমাণুর আকার হয় বিভিন্ন। পরমাণু জগতের প্রথম প্রকাশ হলো অক্ষরে যেমন : ২ ও ৩-এর প্রভেদ আকারগত ; ৩ এবং ২-তে ৫ হয়। এইভাবে ৩২ এবং ২৩-এর মধ্যে যে প্রভেদ তা অঙ্কের ক্রমভেদেরই কারণে হয়ে থাকে। পরমাণু তার স্বাভাবিক গতির ফলে নিরন্তর চলাফেরা করছে এবং তাদের পারস্পরিক সংঘাতের ফলে বস্তুপিণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে ; কখনো বা বস্তুপিণ্ড স্বয়ং সৃষ্ট হচ্ছে এবং তা হচ্ছে নতুন নতুন পরমাণু দ্বারা। ডিমোক্রিটাসের পরমাণু-সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে যান্ত্রিক বস্তুবাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠে এবং বস্তু ও তার গতির সাহায্যে বিশ্বের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করে। ডিমোক্রিটাস শব্দ, বর্ণ, রস এবং গন্ধের যথার্থকে মেনে নিয়েছিলেন। "বস্তুসমূহ আসলে মিষ্টিও নয়, বিস্বাদও নয়, নয় ঠাণ্ডা অথবা গরম। বস্তুত এই-ই হলো পরমাণু বা শূন্য।" এইভাবে এই পরমাণুবাদী দার্শনিক বাহ্যজগৎ ও তার বস্তু-সমূহকে এক মোহ বা ইন্দ্রজালের চেয়ে বেশী কিছু মনে করেননি।

৩—সোফীবাদ

সাইরাস এবং দরায়ুসের সময়ে যখন সমগ্র গ্রীস ইরাণীদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল তখন কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি অন্যত্র চলে যান। পিথাগোরাসের অনুগামী কিছু ব্যক্তি ইতালীতে গিয়ে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করেন। আবার একদল ব্যক্তি কোথাও স্থায়িভাবে বাস না করে পর্যটকের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের বলা হয় সোফী বা জ্ঞানী। যদিও ইসলামী পরিভাষা থেকে সুফী (অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়) শব্দের উদ্ভব ; তবুও এমন মনে করার কারণ নেই যে প্রাচীন গ্রীক সোফী এবং ইসলামীয় সুফী এক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই আমি সুফী না লিখে সোফী লিখলাম। সোফী এক অশান্ত উন্মত্ত সম্প্রদায় তথা রাজতন্ত্র কর্তৃক উৎপীড়িত সমাজ। তাই গতানুগতিক মতবাদে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না, জ্ঞানের তৃষ্ণা ছিল তাঁদের বড়ই প্রবল। সেই জ্ঞান তাঁরা নিজেরাই আহরণ করতেন এবং দিকে দিকে প্রচারিত করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাঁদের চেষ্টায় বিভিন্ন দিকে জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল এবং বিস্তার লাভ করেছিল। প্রাচীন মাত্রই যেহেতু প্রাচীন সেহেতু সঠিক এ কথা তারা মানতে চাননি (পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব)। মানুষকে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন যে, বুদ্ধিকে বন্ধন-মুক্ত করে সত্যের অনুসন্ধান চালাতে হবে। বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পরেই তাঁরই মতো করে সোফীস্টগণও সত্যকে রূঢ় ও বাস্তব এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন : রূঢ় সত্য হলো বুদ্ধের সংবৃত্তি সত্য (শঙ্করের ব্যবহার) এবং বাস্তবিক সত্য হলো পরমার্থ সত্য। সোফীস্ট দার্শনিকগণের একটি মূল্যবান উক্তি —"মনুষ্য বস্তুরই পরিমাপ।" সোফীস্টদের সময়ে এথেন্স নগরী গ্রীক দর্শনের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রে পরিণত হয়

এবং তাদের শিক্ষাগুণেই সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকের আবির্ভাব সম্ভব হয়।

§ ৩. আয়োনীয় (গ্রীক) দর্শনের মধ্যাহ্ন

খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ আয়োনীয় বা গ্রীক দর্শনের স্বর্ণযুগ। এর কিছু পূর্বে দার্শনিক সক্রেটিস মৌখিক উপদেশ বিতরণ করে তরুণ সমাজের হৃদয় জয় করেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজ তাঁর সুযোগ্য শিষ্য প্লেটো এবং তস্য শিষ্য অ্যারিস্টটল সম্পূর্ণ করেন। এ যুগের দর্শনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: সক্রেটিসের গুরু-শিষ্যের যথার্থবাদ এবং অ্যারিস্টটলের প্রয়োগবাদ।

১—যথার্থবাদী সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খৃঃ পূঃ)

সক্রেটিস সোফীস্টদের কিছু কিছু বিচার-বিশ্লেষণ মেনে নিয়েছিলেন। তাদের মতো তিনিও বক্তৃতার মাধ্যমে এবং ব্যবহারবিধির সাহায্যে শিক্ষাদান পছন্দ করতেন। বস্তুত সে যুগে লোকে তাঁকে একজন সোফাস্ট বলেই মনে করত। সোফীস্টগণের ন্যায় তিনিও সাধারণ জ্ঞান ও সহবৎ শিক্ষার ওপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন ধ্যান-ধারণাকে আঘাত করতে চাইতেন। কিন্তু সেই আঘাত ছিল ভাবাত্মক। তিনি বলতেন, "সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও প্রযত্নের দ্বারাই খাটি জ্ঞান লাভ সম্ভব।" যা দৃষ্টি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য তাকেই ঘটনা পরম্পরা দ্বারা বিশ্লেষণ করলে সত্যোপলব্ধি হয়। "ন হি জ্ঞানেন পবিত্রমিহ বিদ্যতে" —গীতার এই উক্তির মতোই সক্রেটিসও বলেছেন, "জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র আর কিছু নেই।" "সঠিক কাজের জন্য সঠিক চিন্তনের প্রয়োজন।" বুদ্ধের মতো সক্রেটিসও কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি; অবশ্য বুদ্ধের শিষ্যগণ তাঁর জীবনী ও বাণী মুখস্থ করে প্রচার করেছিলেন এবং তা থেকেই আমরা বুদ্ধের উপদেশসমূহ জ্ঞাত হই। কিন্তু সক্রেটিসের ক্ষেত্রে সেভাবে কিছু জানার সুযোগ হয় না, কারণ বিভিন্ন লেখক এত বিভিন্নভাবে তাঁর বর্ণনা করেছেন যে তাতে সংশয়েরই সৃষ্টি হয়। অবশ্য তার আচরণেই বোঝা যায় তাঁর জীবন দর্শন কেমন ছিল। কেউ কেউ তাঁর সদাপ্রসন্ন ভাব ও সম্মানিত জীবন-যাপনের উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি ভোগবাদী ছিলেন। আবার অ্যান্টিস্থিনিস এবং অন্যান্য লেখকগণ তাঁর সাধারণ জীবন-যাপনের প্রমাণ দিয়েছেন, সক্রেটিস শারীরিক কষ্ট ও তার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর জীবনী লেখকগণ বলেছেন যে সক্রেটিস প্রয়োজনবোধে জীবনের ভোগবিলাসকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি গুজবে কান দেওয়া পছন্দ করতেন না। "বিশ্বের

প্রকৃতি কেমন, সৃষ্টি কিভাবে অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে, নক্ষত্রলোকের ভিন্নতা কোন শক্তি দ্বারা চালিত” ইত্যাদি প্রশ্নকে তিনি অবান্তর ও মূর্খতা বলে মনে করতেন। সক্রেটিস ছিলেন এথেন্সের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। গভীর পাণ্ডিত্য ও যশ প্রাপ্তির পরেও তিনি দাম্পত্য সুখের জন্য লালায়িত ছিলেন না। জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানের প্রসার-সাধনই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তরুণ সমাজকে বিগড়ে দেওয়া এবং দেবনিন্দা ও নাস্তিকতার অপবাদ দিয়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিষ প্রয়োগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সক্রেটিস হাসিমুখে বিষের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

২—যুক্তিবাদী প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খৃঃ পূঃ)

প্লেটো ছিলেন এথেন্সের এক বনেদী পরিবারের সন্তান। সেই সমাজের মেধাবী ছাত্রদের মতো তিনিও সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প এবং দর্শন শিক্ষার তালিম পেয়েছিলেন। ৪০৭ খৃষ্টপূর্বে কুড়ি বছর বয়সে তিনি সক্রেটিসের সান্নিধ্যে আসেন এবং গুরুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলেন।

কোনো দর্শনই শূন্য থেকে সৃষ্টি হয় না; যে পরিস্থিতি থেকে দর্শনের জন্ম, দর্শনে সেই পরিস্থিতিরই ছাপ পড়ে। প্লেটো এক বনেদী বংশের সন্তান হলেও সেই যুগে তাঁর বর্গের প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি হ্রাস পায় এবং বণিক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এর ওপর আবার যখন তাঁর নিরপরাধ গুরু সক্রেটিসকে গণতান্ত্রিক শাসকগণ হত্যা করেন তখন প্লেটোর মধ্যে একটা বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তাঁর লোকোত্তর দর্শনের মধ্যেও এর প্রভাব পড়ে। এতে একদিকে যেমন তাঁকে রহস্যবাদী ঋষির মতো মনে হয়, অন্যদিকে একজন তুখোড় রাজনীতিজ্ঞ হিসেবেও তাঁকে চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় না। তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার বদলে নতুন এক সমাজ-জীবনের পত্তন তিনি করতে চেয়েছিলেন এই সমাজ ইহলোকের নয় লোকোত্তর। সেই সময়ের এথেন্সের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি এই উক্তি থেকেই অনুধাবন করা যায়, “বর্তমান এথেন্সে গণতন্ত্র বলে কিছুই নেই; অথচ আমি ভেবেছিলাম প্রাচীন শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই এর দিকে আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলাম। লক্ষ্য করলাম যে এই ভদ্রমহোদয়গণ যে গণতন্ত্র গঠন করেছেন তার তুলনায় আগের শাসন-ব্যবস্থা স্বর্ণযুগ-তুল্য ছিল। এঁরা যাকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়েছেন, তাঁকে আমি নিঃসঙ্কোচে একজন খাঁটি মানুষ বলব। শাসকগণ তাকে নিজেদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কারণ তারা চেয়েছিলেন সক্রেটিসের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁর সমর্থন আদায় করতে। কিন্তু সক্রেটিস তো তাঁদের আদেশ মানেনই-নি বরং

তাদের পাপের অংশীদার হওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণও শ্রেয় বলে ঘোষণা করেন। আমি নিজে যখন ঐ ঘটনা এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি তখন আমার এতই ঘৃণার উদ্রেক হয় যে এই উচ্ছৃঙ্খল সরকারের প্রতি সমর্থন তুলে নিই। প্রথমে আমি রাজনীতিতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখলাম যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বড়ই অব্যবস্থিত।" এইরূপ চিন্তা করে প্লেটো ইহলোকের সমাজ গঠন না করে একটা কাল্পনিক প্রজাতন্ত্র নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হয় সত্যদ্রষ্টা দার্শনিকদের রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী হতে হবে, নয়ত এমন আশ্চর্য কোনো ঘটনা ঘটা দরকার যাতে রাজনীতিকগণই দার্শনিকে পরিণত হন। তা না হলে এই নোংরা, ঘৃণ্য সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের টিঁকে থাকা সম্ভব হবে না।"

প্লেটো কেমন সমাজ চেয়েছিলেন তা আমি আগেই বলেছি। মনে রাখা দরকার যে, তাঁর দর্শন সেই সমাজ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে যেখানে দাস বা কর্মীরা মানুষের জীবন-যাপনের যাবতীয় উপকরণ উৎপাদন করত। প্লেটোর সমাজও এই ধরনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাই তিনি স্বীয় সমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘৃণাভরে ত্যাগ করে সঙ্গীত, সাহিত্য এবং দর্শন চর্চাতেই ডুবে থাকতেন।

প্লেটোর দর্শন ---প্রথম দিকে প্লেটোর দর্শনে পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা যায়। প্রবল প্রযত্নেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব, সক্রেটিসের সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি একমত ছিলেন। সাধারণত যে সমস্ত পদার্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত তা সদা প্রবহমান, পরিবর্তনশীল; কিন্তু ঐ সামান্য পরিচিতি দ্বারা আমরা কোনো মহাসত্যের সন্ধান পাই না। হেরাক্লিটাসের এই মতেরও তিনি সমর্থক ছিলেন। এলিয়াটিকদের মতো প্লেটোও এক পরিবর্তনশীল জগৎ (বিজ্ঞান জগৎ) মানতেন; পরমাণুবাদীদের দ্বৈতবাদকে সমর্থন করে তিনি বলেছিলেন যে মূলতত্ত্ব অসংখ্য, "জ্ঞানের যথার্থ বিষয় লোকাতীত, অচল, একরস, ইন্দ্রিয়-অগোচর পদার্থ, মন (বিজ্ঞান) সদা পরিবর্তমান জগৎ-প্রবাহ বা তার কোনো পদার্থ নয়।" এই উক্তির মাধ্যমেই দ্বৈতবাদ সম্পর্কে তাঁর চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে প্লেটো তাঁর দর্শনের মধ্যে হেরাক্লিটাস, পিথাগোরাস এবং সক্রেটিসের চিন্তা ও বিশ্লেষণের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন।

ইন্দ্রিয়-গোচর জ্ঞানের প্রতি প্লেটোর শ্রদ্ধা ছিল খুবই কম। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর বাস্তবিকতা স্পষ্ট হয় না, তা কেবল বাহ্যিক জ্ঞানই দান করে—রায় সত্য হতে পারে মিথ্যাও; তবে মতামতে কিছু আসে যায় না, বুদ্ধির দ্বারাই সত্য জ্ঞান লাভ সম্ভব, ইন্দ্রিয়জগৎ একটা নকল বাস্তব, যদিও তা-ই অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

দু'রকম চিন্তার ওপর নির্ভর করে জ্ঞানলাভ সম্ভব—(১) মনের (Idea) মধ্যে বিক্ষিপ্ত বিশেষ (Particular)-কে ধারণায় আনা এবং (২) মনের জাতি বা সামান্য

(Arche-type) রূপে বর্গীকরণ করা। এই সামান্য ও বিশেষকে ভারতীয় ন্যায়-দর্শনে প্রচুর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বৈশেষিক সূক্তের মধ্যেও সামান্য-বিশেষের উল্লেখ আছে, এবং তা এসেছে প্লেটোর কাছ থেকে। তিনি বলেছেন : "যে চিন্তন দ্বারা জ্ঞানের সাধনা করা হয় তা বিজ্ঞান-ভিত্তিক হওয়া দরকার ; বাহ্য-জগতের যে প্রতিবিম্ব বা বেদনা ইন্দ্রিয়-নির্ভর তাকে চিন্তা করে সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।"

প্লেটো কিছু পদার্থকে স্বতঃসিদ্ধ (Apriori) বলেছেন, এর মধ্যে গাণিতিক জ্ঞান —সংখ্যা তথা তর্কসম্বন্ধী পদার্থ —ভাব, প্রভাব, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য প্রভৃতি আছে। এর মধ্যে বেশ কিছু পদার্থের বর্ণনা বৈশেষিকেও আছে।

জ্ঞানের পরিভাষা নির্ণয়ে প্লেটো বলেছেন : "বিজ্ঞান ও বাস্তবিকতার সমন্বয়ই জ্ঞান, বাস্তবিকতা নির্বিশেষ তা হতে পারে না, এর নিজস্ব কোনো বিষয় থাকবেই এবং তা হলো একরস বিজ্ঞান।" ভাব পদার্থ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, "যথার্থ ভাব স্থির, অপরিবর্তনশীল, অনাদি ; তাই আমি বাস্তবিক জ্ঞানার্জনের জন্য পদার্থের এই স্থির সার রূপটিকেই জানতে চাই।"

সামান্য, বিশেষ —ইন্দ্রিয়জাত বেদনা নয়, শুদ্ধ ভাব-চেতনাই জ্ঞানের সহায়ক, এর দ্বারাই পদার্থের চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় সারতত্ত্ব জানা যায় এবং এই জ্ঞানই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান। ভারতে বৌদ্ধগণ ঐ চিরন্তনতার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তা তাঁদের নিত্যবাদ স্থাপনের পথে অন্তরায়। ন্যায়সূত্রে ব্যক্তি, আকৃতি এবং জাতিকে স্বীকার করা হয়েছে। (ব্যক্তব্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থাঃ)। প্রত্যক্ষবাদীগণ বলেন যে ব্যক্তিরই সত্তা থাকে, বুদ্ধির বাইরে ভাব বা জাতির মতো কোনো পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অ্যান্টিস্থিনিস বলেছেন, "আমি অশ্বকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অশ্বত্ব তো কোথাও দেখছি না।" এ কথা আগেই বলেছি যে পিথাগোরাস, আকৃতির ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন ; প্লেটো ছিলেন সামান্যের পক্ষপাতী। তিনি এই পরিবর্তনশীল বিশ্বের মধ্যে এক অপরিবর্তনীয় একরসকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং এর জন্য সামান্য ছিল তাঁর সব চেয়ে বড় সহায়ক বৌদ্ধ নৈয়ায়িক এই রহস্যের সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। ধর্মকীর্তিকে তাই সামান্যের শোচনীয় দশা ঘটাতে দেখব। প্লেটো বলেছেন যে, বস্তুর আদিম, অনাদি, অগোচর মূল স্বরূপ আগে থেকেই স্বতন্ত্র রূপে সংরক্ষিত হয়ে আছে। বস্তুর পরিবর্তন হয় কিন্তু তার প্রভাব মূল স্বরূপে পড়ে না। অশ্ব একটি জীবপিণ্ড, তাকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখতে, স্পর্শ করতে পারি ; কিন্তু অতীত থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোটি কোটি অশ্বজাতির মধ্যে এমন এক বস্তু পাই (অশ্বত্ব, অশ্ব-সামান্য) যা কোনো একটি অশ্বের মৃত্যুতে শেষ হয় না, অশ্বের জন্মের আগে থেকেই তা মজুদ হয়ে আছে। প্লেটো অশ্বের এই আদিম-অনাদি মূল স্বরূপকে পরিবর্তনের প্রভাবশূন্য এক নিত্য বস্তু বলে

প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ব্যক্তির আকৃতির মধ্যে যে বস্তুকে আমরা দেখি তা তার মূল স্বরূপ —সামান্যের প্রতিবিম্ব, অপূর্ণ নকল। ব্যক্তি জন্মে মরে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব (সামান্য) অবিনশ্বর তার ক্ষয় নেই। এই ভাবই হলো একরস।

ভাব (Idea) —পরস্পর মিলিত ভাবই এক পূর্ণ অবয়ব সৃষ্টি করে, যার মধ্যে বিভিন্ন ভাবের নিয়ত স্থান আছে। প্লেটোর সমাজ ছিল প্রভু-ভৃত্যের, স্বার্থের দ্বন্দ্ব তাই সেখানে লেগেই থাকত। মৌখিক কাব্যময়ী ব্যাখ্যা দ্বারা প্লেটো এই বিরোধকে দূর করতে তো চানই-নি, বরং তাঁর কিছুকাল পূর্বে ভারতীয় ঋষিগণ যেমন পুরুষ-সূক্ত সৃষ্টি করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সঙ্গে তুলনা করে মস্তক, বাহু, জঙ্ঘা ও পদতলের উপমা দিয়ে সামাজিক ভেদ বজায় রেখে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, প্লেটোও তেমনভাবেই দর্শনের ক্ষেত্রে উপমার সাহায্যে উঁচু নিচুর ভেদ বজায় রাখতে চেয়েছিলেন এবং মনে করতেন এতে সামাজিক শান্তি বজায় থাকবে। উচ্চতম ভাব হলো ঈশ্বর ভাব, যা কি-না সব ভাবেরই স্রোত। এই মহান্ ভাবের উর্ধ্বে আর কোনো ভাব নেই।

দুই সংসার —ভাব (মন) এবং বস্তু সংসারে এই দুই প্রকার উপাদান আছে। এখানে কিন্তু ভাবই হলো বাস্তব উপাদান এবং সম্পূর্ণ উপাদান। বস্তু তার আকৃতি এবং সার শেষ হবার পরেও ভাবের ওপর নির্ভরশীল। ভাবই বিশ্বের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক। বস্তু মূল নয়, কর্ম, চমৎকারক নয় সুস্থ, চেতন নয় জড়, স্বেচ্ছাগতি নয় অনিচ্ছুক গতি, যা কি-না ভাবের দাস, ভাবের অঙ্গুলিহেলনে তা নাচে, এবং ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভাব হলো মূল স্বরূপ বা সক্রিয় কারণ এবং বস্তু সহযোগী কারণ।

ঈশ্বর —ঈশ্বর বা বিধাতা (Demiurge) হলেন উচ্চতম ভাব। প্লেটো মূর্তিশিল্পীগণের সঙ্গে ঈশ্বরের তুলনা করেছেন। স্থপতি যেমন মডেল দেখে মূর্তি নির্মাণ করেন, বিধাতাও তেমন ভাব-জগতে (মানসিক দুনিয়ায়) সংরক্ষিত নমুনা অনুসারে (মূল স্বরূপ, সামান্য) সম্ভব মতো বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এর পরেও কোথাও যদি পরিপূর্ণতার অভাব দেখা যায় তবে শিল্পীকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তিনি বস্তুর ওপর নির্ভর করে কাজ করেছেন। বস্তু তো বিধাতার সৃষ্টি-কর্মেও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের নৈয়ায়িকদের মতে বিধাতা জনক নন, বাস্তুকার, ইঞ্জিনিয়ার, তিনি উচ্চতম ভাব, কিন্তু তাঁরও আগে থেকে জড় জগৎ ও ভাব-জগৎ মজুদ আছে ; এ দুটিকে সংবদ্ধ করে ভাব রূপে সংরক্ষিত মূল স্বরূপ জড়তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় এক হাতের প্রয়োজন ছিল, ঈশ্বর সেই হাত। ঈশ্বর বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের মিলন ঘটান। প্লেটোর বিধাতা হলেন শিব বা শুভ। বিধাতাকে প্লেটো সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সূর্য যেমন সৃষ্টির আলোর উৎস, জ্ঞানেই যেমন তার প্রকাশ, তেমনই সত্য ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞানের উৎস হলেন শুভ।

প্লেটোর দর্শনের বৈশিষ্ট্য —প্লেটোর দর্শন যুক্তিবাদী। কারণ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তিনি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ অপেক্ষা বুদ্ধি বা যুক্তির ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন প্রত্যক্ষ জগৎ অপেক্ষা যুক্তিগ্রাহ্য ভাব-জগৎই তাঁর নিকট বাস্তবিক বলে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি যেমন যুক্তিবাদী তেমনই ভাববাদী। কারণ ভাব-জগৎই সারসত্য। তাঁকে বাস্তবার্থবাদীও বলা চলে, কারণ বহির্দুনিয়াকে নিরাধার নয় ভাবজগতের বহিপ্রর্কাশ বলেই তিনি মনে করেছেন। প্লেটোকে ব্রহ্মবাদীও বলতে পারি; কারণ সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে যিনি মিলিত করেন সেই ঈশ্বর তথা মহাভাবের সত্তাকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে কিছুতেই জড়বাদী বলা চলে না, কারণ বস্তু থেকে সৃষ্ট দুনিয়াকে তিনি মুখ্য নয়, গৌণ বলে মনে করেছেন। প্লেটোর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচার সম্বন্ধে আমি আমার 'মানব সমাজ' গ্রন্থে আলোচনা করেছি। তিনি সামাজিক পরিবর্তন চেয়েছেন মূল স্বরূপের আধার থেকে, চলতি সমাজ থেকে নয়।

৩. বস্তুবাদী অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খৃঃ পূঃ)

অ্যারিস্টটল বুদ্ধের জন্মেরও এক শতাব্দী পূর্বে স্ট্যাগিরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নিকোমেকাস ছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডারের পিতা ফিলিপের গৃহ-চিকিৎসক। অ্যারিস্টটলের বাল্যকালেই প্লেটোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ৩৬৭ খৃষ্টপূর্বে ১৭ বছরের তরুণ অ্যারিস্টটল প্লেটোর একাদেমীতে পড়াশোনা করতে আসেন এবং প্লেটোর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। অ্যারিস্টটল গুরুসান্নিধ্যে আসার ২০ বছর পরে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩৪৭-এ প্লেটো মারা যান। রাজা ফিলিপ তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডারের জন্য একজন সুযোগ্য শিক্ষকের সন্ধান করছিলেন এবং এই কাজে তিনি অ্যারিস্টটলকেই যোগ্যতম বলে বিবেচনা করেন। বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে উপযুক্ত করে তোলায় অ্যারিস্টটলের অবদান অনেকখানি। এরও উৎসানুস্কানে আমাদের অ্যারিস্টটলের গুরু প্লেটো এবং পরমগুরু সক্রেটিস সম্বন্ধে জানতে হবে। সক্রেটিস তাঁর স্বতন্ত্র মত প্রচারের জন্য সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, প্লেটো তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিবর্তিত করে এক সাম্যবাদী সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সমাজের বনিয়াদ লৌকিক পৃথিবীতে না গড়ে, মূল স্বরূপ থেকে তাকে গড়তে চেয়েছিলেন, এবং তার শাসনভার কোনো লৌকিক মানুষের হাতে না দিয়ে কোনো প্রজ্ঞাবান বিচক্ষণ দার্শনিকের হাতে দিতে চেয়েছিলেন। প্লেটো যদি জানতেন যে তাঁর কল্পনার সাম্যবাদী সমাজ স্থাপনে একজন বিশ্ববিজেতা সহায়ক হতে পারেন তবে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়ান সমাজবাদীগণ —প্রুধোঁ প্রমুখের (১৮০৯-১৮৬৫ খৃঃ) মতোই তিনিও সাম্যবাদী রাজার সন্ধান

করতেন। অ্যারিস্টটল কুড়ি বছর ধরে গুরুর মতামত শুনেছেন, ফলে তাঁর ওপর তাঁর গুরুর প্রভাব পড়া উচিত ছিল। যদি প্লেটোর সাম্যবাদী রাজ্য অ্যারিস্টটলের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে আলেকজাণ্ডারের নিকট, বিশ্ব-রাজ্য বা চক্রবর্তী রাজ্যের রূপ পেত তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকত না। বুদ্ধ তাঁর সংঘে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্যবাদ —যতদূর ভোগ্যসামগ্রীর সম্বন্ধ আছে—কায়েম করতে চেয়েছিলেন; এটা যদি তিনি সম্ভব মনে করতেন তবে বৃহত্তর সমাজেও তা প্রয়োগ করতেন, কিন্তু বুদ্ধের বস্তুবাদী প্রজ্ঞাই তাঁকে এই কাজে নিরস্ত করেছিল। এরূপ বিচার করেও বুদ্ধ, চক্রবর্তীরাজ—সমগ্র বিশ্বের একজন ধর্মরাজা থাকার—প্রশংসক ছিলেন। হয়ত অ্যারিস্টটলও তাঁর এবং গুরু প্লেটোর ঐ স্বপ্ন সফল করার জন্য শিষ্য আলেকজাণ্ডারের মধ্যে একরাজতন্ত্রী দিগ্বিজয়ী গুণ প্রকাশিত করার প্রয়াস করেছিলেন, অ্যারিস্টটল এথেন্সের প্রজাতন্ত্রই শুধু দেখেননি, তিনি মহাদ্বীপে রাজ্যবিস্তারকারী ইরাণের রাজচক্রবর্তীর সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে অ্যারিস্টটল যখন আলেকজাণ্ডারের মধ্যে নিজ ভাবনাকে রূপ দিতে পেরেছেন তখন বিশ্ববিজয়ের সঙ্গে তাঁর অন্য স্বপ্নটিকেও কেন প্রয়োগ করেননি? উত্তর হলো আলেকজাণ্ডার স্বপ্নচারী দার্শনিক ছিলেন না, তিনি স্বচক্ষে গ্রীকবীরদের তরবারির জোরে সাফল্য অর্জন করতে দেখেছেন, অতএব তিনি তাঁর স্বপ্নবিলাসী গুরুর সকল শিক্ষাই মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন না।

অ্যারিস্টটল যে শুধু দার্শনিকই ছিলেন না, দক্ষ রাজনীতিকও ছিলেন তা এতেই বোঝা যায় যে ৩২৩ খৃষ্টপূর্বে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকালে এথেন্সে ম্যাসিডোনিয়া এবং ম্যাসিডোনিয়া-বিরোধী যে দুটি দল সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে অ্যারিস্টটল ম্যাসিডোনিয়া-বিরোধীদেরই সমর্থন করেছিলেন। হয়ত তিনি পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আগে যে গণতান্ত্রিক বণিকরাজ্য তলোয়ারের জোরে এথেন্সে একাধিপত্য চালিয়ে গিয়েছিল তাকেই সমর্থন করেন। ফলে এথেন্সের রাজা তাঁর প্রতি বিরক্ত হন এবং প্রাণ বাঁচাতে অ্যারিস্টটল ইউবিয়া দ্বীপে পলায়ন করেন; সেখানে ৩২২ খৃষ্টপূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়।

(১) **দার্শনিক বিচার**—অ্যারিস্টটল বিশাল কৃতিত্বের অধিকারী; তাঁর যুগে সমাজে যত জ্ঞান-ভাণ্ডার জমে ছিল তা বোঝার জন্য অ্যারিস্টটলের গ্রন্থাদি বিশ্বকোষের কাজ করে। জ্ঞানকে প্রসারিত করেছেন তিনি। এমন বলা যায় না যে, অ্যারিস্টটল তাঁর গুরু প্লেটোর মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, কেন না তিনি ভাব-জগৎকে অস্বীকার করেননি। সক্রেটিস ও প্লেটোর মতো তিনিও জ্ঞানার্জনে ভাবের অপরিহার্যতা মানতেন, কিন্তু তাকে বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এক প্রধান জগৎ বলে মানতেন না, প্রত্যক্ষ জগৎকে উপলব্ধি এবং তার ব্যাখ্যা করার জন্য অমর (ভাব) জগতের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা তিনি স্বীকার করতেন। আয়োনীয় দার্শনিকগণ শুধু বস্তুর ওপর জোর দিয়েছেন,

পিথাগোরাস ও প্লেটো মূল স্বরূপ বা ভাবের (আকৃতির) ওপর জোর দিয়েছেন কিন্তু অ্যারিস্টটল মনে করেছেন ভাব বা মূল স্বরূপ বস্তুর মধ্যে এবং বস্তু ভাবের মধ্যে সংরক্ষিত। দুটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এদের বিচ্ছিন্ন বলে ভাবা যেতে পারে কিন্তু সত্যি সত্যিই বিচ্ছিন্ন করা যায় না, প্লেটো ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। তাই গণিতের কাল্পনিক রেখা, বিন্দু, সংখ্যা ইত্যাদির ছাপ তাঁর দর্শনেও পড়েছে। অ্যারিস্টটল প্রাণীবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। তাই তিনি ভাব ও বস্তুকে পৃথক করে দেখেননি। এদের মধ্যে এলিয়াটিক স্থিরবাদ এবং হেরাক্লিটাসের পরিবর্তনবাদের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। সকল জিনিসের মধ্যেই তিনি বস্তু ও তার মূল স্বরূপকে একসঙ্গে দেখতেন। মাটি, পাথর ইত্যাদি মূর্তি তৈরীর উপাদানগুলি হলো বস্তু এবং শিল্পীর কল্পনা-প্রসূত মূর্তিরূপটি হলো ভাব। উদ্ভিদ, পশু, মনুষ্য প্রভৃতির দেহটি হলো বস্তু এবং তাদের অনুভূতি হলো ভাব। আকৃতিহীন বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মাটি, জল, অগ্নি, বায়ুর পর্যন্ত আকৃতি আছে; রুক্ষতা, তারল্য, উষ্ণতা, শৈত্য প্রভৃতি মূল গুণের সংমিশ্রণে এগুলি রূপ প্রাপ্ত হয়। সাংখ্য সংস্করণে এই মূল গুণকে তন্মাত্রা বলে বস্তুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং তা অ্যারিস্টটলের ধারণা থেকেই নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। যার বৃদ্ধি বা বিকাশ হয় তাকেই বস্তু বলে, তবে তারও একটা সীমা আছে প্রস্তর খণ্ড দ্বারা মূর্তি সৃষ্টি হয়, গাছ নয়, অঙ্কুর থেকে গাছই জন্মে, পশু নয়। অ্যারিস্টটল এইরূপ বিচার দ্বারা জাতি স্থিরতার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যে, জাতি (সামান্য)-র মধ্যে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই ধারণাই তাঁকে প্রাণীশাস্ত্র জ্ঞানে বেশীদূর অগ্রসর হতে দেয়নি, এবং তিনি উনিশ শতকের জীববিজ্ঞান পর্যন্ত যেতে পারেননি। ভাবযুক্ত তত্ত্বের বিকাশ যত গভীর, ভাববিচ্ছিন্ন বস্তুতত্ত্বের বিকাশ তত নয়। এই বিকাশের উচ্চতম রূপ হলো সেই রূপ, যার পরে আর বিকাশ সম্ভব নয়। অতএব যাকে বস্তুতত্ত্বের পরিভাষাতে ব্যাখ্যা করা যায় না তাই-ই ঈশ্বর। এতৎসত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে বিকাশ এবং তাদের সাদৃশ্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তিনি পারেননি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী-জাতির পঙ্‌ক্তি থেকে ক্রমবর্ধিত প্রাণী-জাতির উচ্চ উচ্চতম বিকাশ তিনি দেখেছেন। প্লেটোর অপরিবর্তনীয় ভাবতত্ত্ব স্রেফ ঈশ্বর, যিনি অ্যারিস্টটলের বিচারে বিধাতা বা কর্তা নন, কারণ ভাব ও বস্তু সর্বদাই তথায় মজুদ ছিল। তবুও সমস্ত বস্তুরই আকর্ষণ ঐ ঈশ্বরের দিকে। জগতের চাহিদা তিনিই এবং তার উপস্থিতি দ্বারাই বস্তুর উচ্চতম বিকাশের ধারা প্রবাহিত হয়। তিনি বিশ্বের অচল-চালক। —"এই হলো তাঁর প্রেম যা জগৎকে চালায়।" (এই কল্পনার সঙ্গে সাংখ্যের পুরুষের কল্পনার মিল আছে। যদিও নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য একের স্থলে অনেক পুরুষ মানতেন।)

অ্যারিস্টটল চার প্রকার কারণ মানতেন —(১) উপাদান কারণ ঘড়া তৈরী

করতে মাটি লাগে, মাটি হলো উপাদান। (২) মূল স্বরূপ বা ভাব-কারণ —যে নিয়মানুসারে কারণ থেকে কার্য হয়—ঘড়া। (৩) নিমিত্ত কারণ (Efficient cause) —যার দ্বারা উপাদান কারণ কার্যরূপ গ্রহণ করে। মাটি থেকে ঘড়া তৈরী করে কুম্ভকার। (৪) অন্তিম কারণ বা প্রয়োজন —যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (জল রাখা) ঘড়া সৃষ্টি হলো। ভারতীয় নৈয়ায়িক প্রথম ও তৃতীয় কারণটি গ্রহণ করেছেন। অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, সব কাজেই যে চারটি কারণই প্রয়োজন হবে তার মানে নেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপাদান ও নিমিত্ত কারণই যথেষ্ট।

(২) জ্ঞান : অ্যারিস্টটলের বক্তব্য —জ্ঞানের চর্চার জন্য শুধু বুদ্ধি নয় যথার্থ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারা যা জানা গেল তাকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে। খাঁটি জ্ঞান শুধু ঘটনা-পরিচয়লব্ধ অভিজ্ঞতাই নয়, ঘটনার পিছনে কোন কারণ ও পরিস্থিতি সক্রিয় ছিল তাও বিচার্য। অ্যারিস্টটল একেই বলেছেন প্রারম্ভিক দর্শন। বর্তমানে এর নামই অধ্যাত্মবিদ্যা। অ্যারিস্টটল ছিলেন তর্ক-শাস্ত্রের প্রথম আচার্যগণের মধ্যে একজন। তিনি বলেছেন তর্করূপ তরণীর সাহায্যে আমরা জ্ঞান প্রাঙ্গণে পৌছাতে পারি। দর্শনের দুয়ারে ওঠার সোপান হলো তর্ক। জ্ঞানার্জনের উপায় হলো চিন্তন আর তাকে বিশ্লেষণ করাই হলো তর্ক শাস্ত্রের মূল কাজ। বস্তুত তর্কই হলো শুদ্ধ চিন্তনবিদ্যা, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ চিন্তনের মূল। আমরা প্রথমে বিশেষকে দেখি তারপর তার সামান্যরূপকে —অর্থাৎ প্রথমে জানি অধিক জ্ঞাতকে তারপর অধিক নিশ্চিতকে। আমরা কখনো রান্নাঘরে কখনো বা শ্মশানে আগুনের সঙ্গে ধোঁয়াকে দেখি এবং ধারণা করি ধোঁয়া ও আগুনের অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

অ্যারিস্টটলের মতে তর্কশাস্ত্রের কোথাও আটটি কোথাও বা দশটি প্রমেয় (পদার্থ [Category] বা জ্ঞানের বিষয়) আছে। (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) পরিমাপ, (৪) সম্বন্ধ, (৫) দিশা, (৬) কাল, (৭) আসন, (৮) স্থিতি, (৯) ক্রিয়া এবং (১০) নিষ্ক্রিয়তা। বৈশেষিকে ছয়টি পদার্থের মধ্যে দ্রব্য ও গুণ আছে, আবার তার নয়টি দ্রব্যে দিশা ও কাল আছে। বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনে অন্যান্য প্রমেয়গুলির কিছু ব্যাখ্যা অন্যভাবে করা হয়েছে। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্বে কোনো ভারতীয় গ্রন্থেই এ ধরনের বিচার দেখা যায়নি। এতেই বোঝা যায় যে আমাদের দর্শন গ্রীক দর্শনের নিকট কত ঋণী।

অ্যারিস্টটল ব্যক্তি বা বিশেষকে বাস্তব দ্রব্য হিসেবে গণ্য করেছেন। সমস্ত বস্তুর মতোই ব্যক্তিও পরিবর্তনশীল, প্রত্যক্ষসাধ্য এবং ক্ষয়িষ্ণু। বস্তু ও ভাব উভয়ই কখনও নতুন করে সৃষ্টি হয় না আবার চিরতরে লোপও পায় না। এই হলো বস্তুর অনাদি মূল তত্ত্ব। পরিবর্তন ও বিকাশ কখনও শূন্য থেকে হয় না, তার একটা আধার থাকেই, এই আধারই হলো অপরিবর্তনীয় ভাব বা মূল-স্বরূপ। দ্রব্য ও ভাবের সমন্বয়ে পরিবর্তন ও গতি সম্ভব। অ্যারিস্টটল চার প্রকার গতির

কথা বলেছেন —(১) দ্রব্য সম্বন্ধীয় গতি ; যথা —উৎপাদন, বিন্যাস ; (২) পরিমাণ সম্বন্ধী —সংযোগ-বিয়োগের ফলে বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন ; (৩) গুণগত গতি —এক জিনিসের অন্য রূপ ধারণ ; যেমন —দুধ থেকে দই, জল থেকে বরফ ; (৪) স্থান সম্বন্ধী —এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন।

দার্শনিক অ্যারিস্টটল যে একজন জ্ঞানী প্রাণীবিদ ছিলেন তা আমি আগেই বলেছি। পঞ্চম খৃষ্টপূর্বাব্দে হিপোক্রেটিস এবং তাঁর অনুগামীগণ প্রাণীশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। অ্যারিস্টটল তাঁদেরও অতিক্রম করে যান। তাই তাঁকেই জীবন-বিকাশ সিদ্ধান্তের প্রথম প্রবর্তক বলা উচিত। তাঁর প্রাণীশাস্ত্রীয় কার্যকে তাঁর শিষ্য থিওফ্রেসটাস (৩৯০-২৮৫ খৃঃ পূঃ) জিইয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী দু'হাজার বৎসরে তা রুদ্ধ হয়ে গেছে। ডারউইন অ্যারিস্টটলের প্রাণীশাস্ত্রীয় গবেষণার প্রভূত প্রশংসা করেছেন।

গ্রীক দার্শনিকগণের নিকট ঋণী হওয়া আমাদের অস্মদ্দেশীয় কতিপয় বিদ্বানের নিকট বড়ই গাত্রদাহের কারণ হয়েছে! তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারত অন্য কোনো দেশের সহায়তা ব্যতীতই স্বীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বিকাশিত করেছে ; আর তাই ভারত-গ্রীসের সম্পর্ক সৃষ্টির পূর্বে রচিত ভারতীয় সাহিত্যে যে সব সিদ্ধান্তের বিকাশ প্রবাহের গন্ধও পাওয়া যায় না, সেগুলি নিয়েও তাঁরা টানা-হেঁচড়া করতে ছাড়েননি। আমাদের মনে রাখা দরকার, আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে আসেন তখন গ্রীকগণ দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। ঐ সময় লক্ষাধিক গ্রীক আমাদের দেশে এসে, স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আর আজ তাঁরা আমাদের অস্থি-মজ্জায় এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছেন যে তার প্রমাণ শুধু চাক্ষুষ নয়, ইতিহাসে মেলে। যেভাবে তাঁরা আমাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়েছেন, সেইভাবেই তাঁদের ও আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি একাত্ম হয়ে গেছে। গান্ধার শিল্পে যখন গ্রীক শিল্পকলার স্পষ্ট এবং গুপ্ত শিল্পকলায় পরোক্ষ ছাপ দেখি তখন অস্বীকার করার উপায় থাকে না যে, আমাদের মঠের সাধু-ভিক্ষু হয়ে এবং শিক্ষায়তনের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে শিক্ষিত সভ্য গ্রীকগণ বিদ্বৎজনের নিকট প্রচুর প্রশংসার্জনের অধিকারী হয়েছিলেন।

§ ৪. আয়োনীয় (গ্রীক) দর্শনের অন্তযুগ (৩৩৮ খৃঃ পূঃ)

শেরোনিয়াক যুদ্ধে গ্রীকগণ ম্যাসিডোনিয়ার কাছে পরাজিত হয়ে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছিল। মানসিক এই আঘাত তাদের পক্ষে সামলানো সম্ভব হয়নি। ৩২২ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অ্যারিস্টটল জীবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর মহৎ দার্শনিক চিন্তার কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরাজিত গ্রীকগণ আর হেরাক্লিটাস, ডিমোক্রিটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের স্বচ্ছন্দ দর্শনকে পুনর্জীবিত করতে পারেননি। তাঁদের মুখ দিয়ে

'বল হরি হরিবোল' ছাড়া আর কিছুই বেরোয়নি, অ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পরেও কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রীক দর্শন টিকে ছিল, কিন্তু তা ঐ 'বল হরি হরিবোলের' দর্শন। বিপদগ্রস্ত মানুষই ধর্ম ও কুসংস্কারকে অবলম্বন করে উদ্ধার পেতে চায়। যুক্তিবাদী স্টোয়িক দর্শন, বস্তুবাদী এপিকিউরীয় দর্শন, কিংবা সন্দেহবাদ সবই ঐ আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার থেকে সৃষ্ট। এই সব দর্শন শুধু মানসিক শান্তি ও সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করেই ক্ষান্ত হয়েছে।

১. এপিকিউরীয় বস্তুবাদ

এপিকিউরীয় মতে দর্শনের লক্ষ্য হলো মানুষের জীবনে সুখের প্রসার ঘটানো। ডিমোক্রিটাসের যান্ত্রিক পরমাণুবাদের ওপর এই দর্শন নির্ভরশীল। বিশ্ব অসংখ্য পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণাম ; কোনো প্রয়োজন বা সজ্ঞানশক্তি এর পিছনে কাজ করে না। সদা চলমান পরমাণুসমূহের পারস্পরিক মিলন বিচ্ছেদের ফলেই প্রাণী সৃষ্টি হচ্ছে। পরমাণু সদা পরিবর্তনশীল এক প্রবাহ। জীবনান্তের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে তাই মানুষ আর সুখ ভোগ করতে পারে না। অতএব ইহ-জীবনেই আনন্দ ভোগ করতে হবে, এবং একই সঙ্গে আদর্শ ও নিয়মশৃঙ্খলা, সংযম মেনে চললে জীবন সুখময় হবে। এপিকিউরীয় দর্শনে ভোগবাদ শুধু ব্যক্তিগত নয় সমাজগতও ছিল। তাই একে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কিত বলা চলবে না। যেখানে অন্যান্য সুখবাদে পরজন্মে ব্যক্তিসুখকে প্রার্থনা করা হয়েছে সেখানে ইহজন্মেই এপিকিউরীয়গণ ব্যক্তি ও সমাজকে যুগ্মভাবে সুখী দেখতে চেয়েছেন। অন্যান্যদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য এখানেই।

এপিকিউরাস (৩৪১-২৭০ খৃঃ পূঃ) —গ্রীক ভোগবাদের প্রতিষ্ঠাতা এপিকিউরাস সামোস দ্বীপে এথেন্স প্রবাসী পিতামাতার গৃহে জন্মেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন। একে ভিত্তি করেই তিনি স্বীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে, বুদ্ধের মহানির্বাণের পৌনে দু'শ বছর পরে নিজ দর্শন প্রচারের জন্য তিনি এথেন্সে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং আমৃত্যু এখানেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করতেন। তাঁর জীবৎকালেই তাঁর অনেক অনুরাগী বন্ধু ও ছাত্র ছিলেন। পরে সেই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। তবে চার্বাকের "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"-এর সঙ্গে এপিকিউরাসের 'সুখবোধ থেকে সুখী হওয়া'র মতবাদকে অনেকে নিন্দা করেছেন।

এপিকিউরাস বলেছেন যে স্বীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর বিশ্বাস না করলে কোনো জ্ঞানই আয়ত্ত করা যায় না। ইন্দ্রিয় হয়ত অনেক সময় ভুল করায়, কিন্তু বারংবার চর্চা দ্বারা তাকে সংশোধন করে উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব। চার্বাকের মতোই তিনিও প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই বেশী শক্তিশালী মনে করেছেন।

২. স্টোয়িক-এর শারীর (ব্রহ্ম) বাদ

জেনোফেনস্‌-এর (৫৭০-৪৮০ খৃঃ পূঃ) জগৎ-শারীরিক-ব্রহ্মবাদেরই একটি শাখা হলো স্টোয়িক দর্শন। আমি আগেই বলেছি যে স্বয়ং পিথাগোরাসও ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জেনোফেনস্‌ ছিলেন পিথাগোরাসের উত্তরাধিকারী। অতএব স্টোয়িকগণের শিক্ষাপদ্ধতিতে যে ভারতীয় ছাপ থাকবে তাতে আর অশ্চর্য কি! ৩৩২ খৃষ্টপূর্বাব্দে যখন আলেকজাণ্ডার মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া নগরের প্রতিষ্ঠা করেন তখন তা তিনটি মহাদেশের শক্তিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে যেমন পরিগণিত হয় তেমনই তা তিন মহাদেশের সভ্যতা সংস্কৃতি-কৃষ্টি-শিল্পকলারও আদান-প্রদানের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আলেকজান্দ্রিয়া স্টোয়িকদেরও কেন্দ্র হওয়ায় তাদের প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে।

অ্যারিস্টটল মন (= ভাব) ও বস্তু উভয়কেই অনাদি বলে মানতেন বলে তাঁকে দ্বৈতবাদী বলা হয়। এদের নিমিত্ত-কারণ হলেন ঈশ্বর। স্টোয়িকগণ দ্বৈতবাদের মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন এবং রামানুজের ন্যায় ব্রহ্ম (ঈশ্বর)-কে অভিন্ন-নিমিত্ত উপাদান-কারণ বলে মেনেছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জগৎ ভিন্ন নয়; জগৎ ভগবানের শরীর, এক সজীব কায়া। ভগবান বিশ্বের আত্মা (Logos)। বিশ্বের সমস্ত বীজ বা কীট তাঁর মধ্যে মজুদ। তাঁরই ভিতর সৃষ্টির সারা শক্তি নিহিত।

জেনো (৩৩৬-২৬৪ খৃঃ পূঃ)—এলিয়াতিক দার্শনিক জেনোফেনাসের (৪৯০-৩৩০খৃঃ পূঃ) ১০৬ বছর পরে স্টোয়িক দর্শনের আর একজন আচার্য জেনো সাইপ্রাসে জন্মগ্রহণ করেন। সাইপ্রাস ইউরোপ থেকে কিছু দূরে এশিয়ার নিকটে অবস্থিত। তাই জেনোর মধ্যে এশীয় দর্শনের ছাপ পাওয়া যায়। ৩০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি স্টোয়া পাইকিল-এ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ফলে তাঁর সম্প্রদায়ের নামই হয়ে যায় স্টোয়িক সম্প্রদায়। জেনোর পরে স্টোয়িক দর্শনের নেতৃত্ব দান করেন ক্লেনথিস (২৬৪-২৩২ খৃঃ পূঃ)। এই ফিনিসীয় বণিক-দার্শনিক ছিলেন অশোকের সমকালীন।

তর্কের প্রতি স্টোয়িকগণ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা বলেছেন—"দর্শন-শাস্ত্র শস্যক্ষেত্রের তুল্য। শস্যক্ষেত্রকে রক্ষা করতে যেমন কাঁটাতারের বেড়া দিতে হয়, তেমনই তর্কের বেড়া দিয়ে দর্শনক্ষেত্রকে রক্ষা করতে হয়। বস্তু তার মৃত্তিকা এবং নীতিশাস্ত্র ফসল।" এই উপমার কল্পনা আমাদের ন্যায় শাস্ত্রেও আছে "তত্ত্বনিশ্চয়কে রক্ষা করার জন্যে তর্ক যেন এক কাঁটাতারের বেড়া।" (তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থ কণ্টকশাখাবরণবৎ—ন্যায়সূত্র)।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই সকল জ্ঞানের আধার—এপিকিউরীয়দের এই মতের সঙ্গে

স্টোয়িকগণ একমত ছিলেন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ সাধারণ জ্ঞান বিশ্লেষণ করে যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্ভব। সত্য নির্ণয়ের জন্য সুসংগঠিত জ্ঞান হলো বিদ্যা, যা এক সিদ্ধান্ত থেকে অন্য সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে।

স্টোয়িকগণ সেই বস্তুকেই সত্য বলে মানতেন যা নিজে ক্রিয়াশীল কিংবা যার ওপর ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায়। কর্মহীন সত্তার অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেননি। তাই অ্যারিস্টটলের মতো শুদ্ধ ভাব (ঈশ্বর)-কে তাঁরা নিষ্ক্রিয় মনে করতেন না। ঈশ্বর ও জগৎ তাঁদের কাছে অভিন্ন ছিল। অতএব শরীর (জগৎ)-এর ক্রিয়া শারীর (ঈশ্বর)-এর নিজের ক্রিয়া। বস্তু ছাড়া শক্তি শক্তিহীন, শক্তি ছাড়া বস্তু বস্তুহীন।

অতএব মানতেই হবে যে বস্তু সর্বদাই শক্তি বা ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত। এই কল্পনা উপনিষদের অন্তর্যামীবাদের নিকট কতটা ঋণী তা আমি পরে দেখাব। স্টোয়িকগণের ঐ অঙ্গাঙ্গী, অবয়ব-অবয়বী সিদ্ধান্ত বেদান্তের সূত্র এবং বৌধায়নবৃত্তি তথা রামানুজের ভাষ্যতে পাওয়া যায়। তার মানে এই নয় যে অবয়ব-অবয়বীভাব উপনিষদেও নেই ; এই সিদ্ধান্ত বেদান্তশাস্ত্রের। কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যায় স্টোয়িক তাকে আরও তর্কসম্মত করতে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা থেকেই বাদরায়ণ, বৌধায়ন প্রমুখ অধিক লাভবান হয়েছেন।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও ঈশ্বরের অঙ্গ। ঈশ্বর এক এবং সব। প্রকৃতি, ঈশ্বর ভাব, ভবিতব্য সবই সমান। স্টোয়িক দার্শনিক প্রকৃতি-জীবনের পক্ষপাতিত্বের যুক্তি হিসেবে বলেছেন যে প্রকৃতি ও ঈশ্বর যখন অভিন্ন তখন প্রকৃতিকেই আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। সকল প্রাণীই অদ্বৈত ঈশ্বর-প্রকৃতির সন্তান। স্টোয়িক দর্শন তাই বিশ্বভ্রাতৃভাবের সমর্থক। এক্পিটেটাস বলেছেন —"সব মানুষই ভাই-ভাই এবং ঈশ্বর সকলের জনক।"

কয়েক শতাব্দী ধরে স্টোয়িক দর্শন প্রচলিত ছিল। রোমের সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস (১২৯-১৮০ খৃঃ) স্টোয়িক দর্শনের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন নাগার্জুনের সমসাময়িক। খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রারম্ভিক যুগে সমাজের উঁচুমহলে স্টোয়িক দর্শন বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই তর্ককণ্টক-শাখা দ্বারা রক্ষিত দর্শনকে খৃষ্ট শিশু-কাহিনী কি করে হঠিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে-ছিল তার কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, গল্প-কাহিনীর সহজাত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দাসশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীকে বশ করে খৃষ্টধর্ম এদের হাত ও হৃদয়কে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিল এবং বিলাসী রাজা ও আমীরদের ব্রহ্মদর্শন দরিদ্রের স্বেদাক্ত পরিশ্রমের ফসল খেয়ে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়ে গরীবদের পুরস্কারস্বরূপ জীবন-ধারণের জন্য সামান্য দুটি নুন-ভাত ছুঁড়ে দিত। কল্পজগৎ ও বাস্তবজগতের যেখানে এমন শর্তসাপেক্ষ মিটমাট হয়ে যায় সেখানে এমন শোচনীয় পরিণামই হয়।

৩. সংশয় (সন্দেহ) বাদ

"আমরা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর বৈশিষ্ট্য নয় বাহ্যিক রূপটাকেই শুধু জানতে পারি।"

পাইরো (৩৬৫-২৭০ খৃঃ পূঃ)—অ্যারিস্টটলের উনিশ বছর পরে এলিস নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ডিমোক্রিটাসের দর্শনগ্রন্থ জেনোর মতো তাঁকেও আকৃষ্ট করে। আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য অভিযানে তিনিও তাঁর সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হন। ইরাণে তিনি এক পারসী ধর্মাচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ভারতবর্ষে কয়েক বছর বাসকালীন এখানকার এক সম্প্রদায় (যাদের গ্রীক লেখকগণ গিম্‌নো সোফিস্ট বলে উল্লেখ করেছেন)-এর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। গিম্‌নো শব্দের অর্থ জয় করার পর মেলামেশা। বৌদ্ধ এবং জৈনগণ তাঁদের ধর্মসংস্থাপককে জিন (বিজেতা) বলে অভিহিত করতেন। মনে হয় পাইরোর সঙ্গে বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের একাঙ্গী বিকাশের সম্বন্ধ আছে, যাকে যীশুখৃষ্টের দুই শতাব্দী পরে নাগার্জুনের মধ্যে দেখা যায়। প্রাচীন বৈপুল্যবাদ থেকে নাগার্জুনের শূন্যবাদ বিকাশিত হয়েছে। এই বৈপুল্যবাদ অশোকের যুগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পাইরোর মৃত্যুর এক বছর পরে ২৬৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে অশোক সিংহাসনারোহণ করেন। অতএব পাইরোর ভারত আগমনকালে বৈপুল্যবাদ প্রচলিত ছিল। এরপর পাইরো এলিসে ফিরে যান। তাঁর মতে বস্তুর স্বভাব জানা অসম্ভব। হয়ত কোনো যুক্তি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যুক্তির বিপরীত আরও মজবুত প্রামাণ্য যুক্তি পাওয়াও সম্ভব। তাই স্বীয় বুদ্ধিগত সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করে জীবনকে অবিচলিত রাখাই ভালো। নাগার্জুনও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য এমন নয় যে তিনি পাইরোর নিকট ঋণী, বরং বলা যায় উভয়েরই দর্শনের উদ্ভব হয়েছে ঐ বৈপুল্যবাদ, হেতুবাদ এবং উত্তরাপথবাদ থেকে।

পাইরো জ্ঞানের ভিত্তিকে আয়ত্ত করা অসম্ভব বলেছেন। কোনো বস্তুর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হলে প্রমাণ দরকার যা কি-না নিষ্ফল তর্ক আবার তাকে খণ্ডনের জন্য নতুন প্রমাণ চাই। নাগার্জুন তাঁর 'বিগ্রহ-ব্যবর্তণী'-তে ঠিক এইভাবেই প্রমাণের প্রামাণিকতাকে খণ্ডন করেছেন!

ঈশ্বর-খণ্ডন : পাইরোর অনুগামীগণ স্টোয়িকের ব্রহ্ম (ঈশ্বর) বাদকে খণ্ডন করেছেন। স্টোয়িক বলেছেন "জগৎ সৃষ্টির যথার্থ প্রয়োজন আছে এবং এই প্রয়োজন পূরণ হওয়া সম্ভব যদি কোনো চেতনশক্তি ঐ প্রয়োজনকে সামনে রেখে সংসার সৃষ্টি করে। প্রয়োজনবাদ এইভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।" সংশয়বাদীদের উত্তর —"জগতে এমন কোনো প্রয়োজন দেখা যায় না যেখানে বুদ্ধি-সত্তা কিংবা শুভ ও সুন্দরের স্পর্শ নেই। বুদ্ধিসত্তা থাকলে ভুল করতে করতে —হাজার ছাঁচ নষ্ট করে ফেলে —নব্য স্বরূপকে অস্থায়ী হাতে পড়বার দরকার হতো না। আর

জগৎকে শুভ ও সুন্দর সেই বলতে পারে যে সর্বদা স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে। এমন যদি নাও হতো তবুও তাতে ঈশ্বর নয় স্বাভাবিকতাই প্রমাণিত হতো।" স্টোয়িক ও বেদান্তবাদীগণের মতে ঈশ্বরই বিশ্বাত্মা। পাইরোর অনুগামীগণ বলেছেন —"স্টোয়িকদের ধারণা অনুযায়ী ধরে নিতে হবে যে ঈশ্বরের অনুভূতি আছে, কিন্তু অনুভূতিপরায়ণ ব্যক্তি তো পরিবর্তনশীল এবং তা নিশ্চয়ই নিত্য, একরস অনন্ত হতে পারে না। আবার যদি তিনি অনুভূতির উর্ধ্বে থাকেন তবে তাঁকে তো এক কঠিন, নির্জীব পদার্থ বলতে হবে। তিনি যদি বিশ্বাত্মা, তবে তো তাঁকে মনুষ্যের ন্যায়ই পরিবর্তনশীল ও মরণশীল হতে হবে। শুভ হলে তাঁকেও নৈতিক নিয়মে আবদ্ধ হতে হবে, আর যদি অশুভ হন তবে মানুষের চেয়েও অধম। অতএব ঈশ্বর বিষয়ক ধারণা পরস্পর-বিরোধী এবং ত্রুটিপূর্ণ। যেহেতু ঈশ্বর বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় সেহেতু ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান অগ্রাহ্য।"

পাইরোর পরে তাঁর সম্প্রদায়ে আরও কয়েকজন দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। যাঁদের মধ্যে আর্কেসিল্‌স্ (৩১৫-২৪১ খৃঃ পূঃ), কার্নিয়াডিস (২১৩-১২৯ খৃঃ পূঃ), এস্কালনের এনটিওকাস (৮৬ খৃঃ), ল্যারিসার ফিলো (৮০ খৃঃ) এবং ক্লিটোমেকাস (১১০ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য।

যদিও পরে সংশয়বাদীগণের মধ্যে অনেক বড় বড় পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই স্টোয়িকদের মতো কল্পনাবিলাসী হওয়ার ফলে নিষেধাত্মক ও ধ্বংসাত্মক মতবাদেই অধিক আস্থাশীল হয়ে পড়েন। অতএব কোনো সৃষ্টিধর্মী পরিকল্পনা তাঁরা করতে পারেননি। ফলে খৃষ্টানগণ স্টোয়িকদের সঙ্গে সংশয়বাদীগণকেও স্তব্ধ করে দেয়।

৪. নব্য প্লেটোনিক দর্শন

পাশ্চাত্য গ্রীক দর্শনের অন্তিম যুগ ঘনিয়ে আসে নব্য প্লেটোনিক দর্শনে। পাশ্চাত্য দর্শন ক্রমশ পৌরুষত্বযোগ, রহস্যবাদ এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের এক উদ্ভট মিশ্রণ হয়ে উঠেছিল। ফলে গ্রীক-রোমান সভ্যতার পতন আরও ভয়ঙ্কর দিনের সম্ভাবনাকে প্রকট করে তুলেছিল। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে প্লেটোর ভাববাদী দর্শন ছিল ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদেরই প্রায় সমতুল্য।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের দুটি বড় শহর হলো রাজধানী বাইজানটিয়াম বা বর্তমানের ইস্তাম্বুল এবং মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া। উভয় নগরই শুধু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্যকেন্দ্রই নয়, ধর্ম-কৃষ্টি-দর্শন-কলারও বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বাইজানটিয়াম ইউরোপে অবস্থিত হলেও প্রাচ্যের ছাপই সেখানে অধিক ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের নালন্দা-স্বরূপ। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে লঙ্কায় রত্নমাল্য চৈত্যের (রুবনবেলী স্তূপ,

(অনুরাধাপুর) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার বৌদ্ধ-ভিক্ষু ধর্মরক্ষিত। এতেই বোঝা যায় যে তিন খৃষ্টপূর্বাব্দে অশোক কর্তৃক যে ভিক্ষুগণকে বিভিন্ন দেশ ও গ্রীসে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁরা আলেকজান্দ্রিয়াতেও মঠ স্থাপন করেন। ধর্ম যে বাণিজ্যের অনুসরণ করে এতে তা প্রমাণিত হয়। ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে যত্রতত্র বসবাস শুরু করেন, ফলে ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ যেমন বৈদেশিক সমাজ, রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছেন তেমনই সেখানে মঠ-মন্দির নির্মাণ ও ধর্মপ্রচারে ঐ বণিকগণের নিকট থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। গ্রীসের রাষ্ট্রীয় অধঃপতন-জনিত দুঃসময়ে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ গ্রীকগণ প্রাচ্য সাধু-যোগীদের যোগ, তপস্যা, সংসারের অসারতা নির্ণয় এবং পরলোকবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এরই ফলে হাজার হাজার শিক্ষিত সভ্য গ্রীক-রোমান 'সত্য ও নির্বাণে'র সন্ধানে ভারতে যাত্রা করেছিলেন। সেখানে দারিদ্র্য ও উপবাসের মধ্যে যোগ-সাধনা ও ভজন-গান করে তাঁরা দিন কাটাতেন। জগৎ-এর দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী এই লোকদের মধ্যে সৈনিক, ব্যাপারী, দার্শনিক, মহাত্মা সকল শ্রেণীর মানুষই ছিলেন। ফলে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্লেটোর ভাববাদী ও অ্যারিস্টটলের যাথার্থ্যবাদী দর্শন অনাদৃত এবং ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু যা জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল যাকে সংশোধনের কোনো পথ দেখা যাচ্ছিল না, প্লেটোর সেই ভাববাদী দর্শনকেই বেশী পছন্দ করা হতো।

ঐ যুগে পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে ভারত এমন কি ইরাণেরও প্রাচীন সভ্যতার সম্পর্ক বজায় ছিল, কারণ উভয়েরই প্রতিবেশী দেশ ছিল ইরাণ। দার্শনিক চিন্তায় ইরাণ সর্বদাই ভারতের থেকে পিছিয়ে ছিল। পিথাগোরাস এবং আলেকজাণ্ডারের সময়ে ভারত তার বিপুল ঐশ্বর্য এবং দার্শনিক পণ্ডিত সাধু যোগীর খ্যাতির কারণে গৌরবের শিখরে উঠেছিল। অতএব গ্রীক দর্শনকে নব্য প্লেটোনিক দর্শনে রূপায়িত করতে ভারতের অবদান ছিল প্রধান। হতাশাবাদ, দুঃখবাদ, লোকোত্তরবাদ, রহস্যবাদের উদ্ভব সেখানেই হয় যেখানে রাজ্যবিস্তারের লিপ্সা সমাজনায়কদের ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং যুদ্ধ, রাজ্য-পরিবর্তন এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দুর্ভিক্ষ, মহামারী যেখানে জীবনকে ছারখার করে দেয়। এবং সামাজিক বৈষম্যের ফলে সমাজে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ষষ্ঠ-সপ্তম খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতীয় উপনিষদের নৈরাশ্যবাদ রহস্যবাদের উদ্ভব এরূপ পরিস্থিতি থেকেই হয়েছিল। এবং সমাজের সংস্কার না করে তাকে নিষ্ক্রিয় ও অনড় রাখার জন্য ভারত উপনিষদের এই বিচার-সিদ্ধান্তে অটল ছিল। পরবর্তীকালের বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের রূপও ঐ নৈরাশ্যবাদ এবং রহস্যবাদেরই নব্য সংস্করণ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিকাশকে রুদ্ধ করা গেলেও ভারতীয়দের বৌদ্ধিক বিকাশকে তো রুদ্ধ করা যায়নি তাই হতাশা ও রহস্যবাদেরও নতুন রূপদানের প্রয়োজন হয়েছিল। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজে তখন নানা হীনতা জমে উঠেছিল। ক্রমাগত জমে

ওঠা ঋণ শোধ করতে ঋণীরা যেমন মুশকিলে পড়ে সমাজের অবস্থাও তেমনই হয়েছিল। এরূপ বিষম পরিস্থিতিতে বেড়ালের সামনে পায়রার চোখ বুজে থাকার নীতিকেই মানুষ আঁকড়ে ধরে ছিল। ভারত হতাশা ও রহস্যবাদকে অবলম্বন করে উপনিষদ, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম, যোগ, শৈব, বেদান্ত, পঞ্চরাত্র, মহাযান, তন্ত্রযান, ভক্তিমার্গ, নির্গুণমার্গ, কবীরপন্থা, নানকপন্থা, সখীসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, আর্যসমাজ, রাধাবল্লভীয়, রাধাস্বামীসমাজ ইত্যাদির নব্য সংস্করণ করে নিয়ে সেই মার্জার-কবুতর নীতিরই অনুসরণ করেছিল।

অন্য কোনো দেশ ভারতের মতো পরিস্থিতিতে পড়লে সেখানেও সেই একই ব্যাপারি ঘটবে। আজ ইউরোপ, আমেরিকায় যে বৌদ্ধ, বেদান্ত, থিয়োসফী, প্রেতচর্চা চলছে তা সেই একই পায়রার চোখ বুজে থাকার নীতি —সামাজিক পরিবর্তনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার প্রয়াস।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম. শতাব্দীর গ্রীস-রোমের নায়ক-শাসক সমাজ ভোগবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সামাজিক বৈষম্য ও নোংরামির জন্য অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তথা বদহজমের শিকার হয়েছিল। তারাও এই পরিস্থিতি থেকে পালাতে চেয়েছিল, এই কাজে তাদের স্বদেশী নেশা প্লেটোর দর্শনই যথেষ্ট ছিল না, বুঁদ হওয়ার জন্য দরকার ছিল আরও কড়া বোতলের ; তাই তারা ভারতীয় রহস্যবাদ ও নৈরাশ্য-বাদকে প্লেটোর দর্শনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগৎ মায়া, ভ্রম, ইন্দ্রজাল। ভাব-জগৎই যথার্থ সত্য। জীবন-বিচ্ছিন্ন মানুষই সত্যের ও মানসিক শান্তির সন্ধান পায়। সুদীর্ঘকাল ধরে সংযম-নিয়ম পালন করলে বহুজন্মের সংসিদ্ধি লাভ হয় এবং মানুষ অকথিত, অজ্ঞেয়, রহস্যময় দুনিয়াকে জানতে পারে, ফলে তার হৃদয়ের বন্ধন কেটে যায়। সংশয়মুক্ত এই মানুষের লক্ষ জন্মের ত্রুটি (কর্মফল) লয়প্রাপ্ত হয়।

নব্য প্লেটোনিক দার্শনিকগণের মধ্যে ফিলোজুডিয়াস (২৫ খৃ: পূঃ -৫০ খৃঃ) বহু কৃতির অধিকারী। তিনি প্লেটো ও ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে ইহুদী শিক্ষারও সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই ইহুদী দেবদূতকে মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে দেখিয়েছেন। এইরূপে প্লেটোর ভাববাদের তিনি একটা আলংকারিক রূপ দান করেছেন।

কিন্তু ঐ আলংকারিক ব্যাখ্যা খুব একটা সাফল্য অর্জন করেনি, তাই প্লটিনাস (২০৫-২৭১ খৃঃ) নিজেই এই দায়িত্বভার নেন। পতনোন্মুখ প্রাসাদের থাম, ছাদ, দেওয়াল, মিনারের ইটগুলি যেমন একে একে খসে পড়ে ধ্বংসোন্মুখ সংস্কৃতির দশাও ঠিক তেমনই হয়। তৃতীয় খৃষ্টাব্দের সূচনায় রোমান সভ্যতার দশা এমনই হয়েছিল এবং প্লটিনাসকে তারই প্রতীক বলা চলে। তিনি ও তাঁর মত বিশ্লেষকগণ বাস্তব পরিস্থিতিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞানহীন, চৈতন্যহীন, স্বার্থপর অভিজাতবর্গের খেয়ালে যে দীনহীন, নোংরা, অরাজক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে

উঠেছিল তাকে জানাই তাঁরা যথেষ্ট মনে করতেন কিন্তু পরিবর্তিত ও সংস্কৃত করার সংগ্রামে যোগ দিতে চাননি। প্লেটো অনেক যত্নে যে কল্প-জগৎ গড়ে তুলেছিলেন তাই-ই এঁদের নিকট অপেক্ষাকৃত আদৃত ছিল। নব্য প্লেটোনিক দর্শনের শিক্ষাই ছিল —"সকল বস্তুই এক অজ্ঞেয়, পরমকারণ, অনাদিভাব থেকে জাত। পরমকারণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক বস্তুনির্ভর নয়, কল্পনানির্ভর; যে কল্পনা পরমকারণের অস্তিত্বের পরিচায়ক। পরমকারণের গুণকে সম্যক উপলব্ধি করার মতো কোনো ইন্দ্রিয় বা সাধনশক্তি আমাদের নেই। পরমকারণ জাত আত্মাই ঈশ্বর বা স্থষ্টিকর্তা। শঙ্করের বেদান্তেও ঈশ্বরের পরমতত্ত্ব স্বীকৃত। 'দিব্য-ভাব' তথা ঈশ্বর মননের মাধ্যমে (সোৎমিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ) স্বীয় শরীরের থেকে যে বিশ্বাত্মাকে *সৃষ্টি* করেছেন তা অগণিত জীবেরও আত্মা। জগৎ সৃষ্টির পরেও 'দিব্য-ভাবে'র কাজ শেষ হয়নি, তিনি এই দৃষ্টি-গ্রাহ্য দুনিয়ায় আত্মাকে প্রকট করার কাজে ব্যাপৃত। সংসারে যার সর্ব কর্তব্য সমাধা হয়েছে তাকেই তিনি সাদরে কোলে টেনে নেন।"

প্লেটো অনুভূতি বা প্রয়োগবাদের চেয়ে বুদ্ধির ওপর বেশী জোর দিয়েছেন, কিন্তু নব্য প্লেটোনিকগণ সমাধিপ্রাপ্তি ও আত্মানুভূতিকে বুদ্ধির চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। প্লটিনাস বলেছেন —"ঐ সর্বমহান্ অচিন্তনীয় পরমতত্ত্বকে বুদ্ধি দ্বারা নয় বরং অচিন্তন দ্বারা বুদ্ধির ঊর্ধ্বে গিয়েই অনুভব করা যায়।"

খৃষ্ট ধর্মের যাজক অগাস্টিনের ওপর এই রহস্যবাদ প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আজও প্রাচ্যে স্লাভদেশে চার্চে ভারতীয় নব্য-প্লেটোনিক দর্শন, যোগ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। যাজক টমাস অকিনা (১২২৫-১২৭৪ খৃঃ) পশ্চিমের রোমান ক্যাথলিক চার্চকে মাটিতে নামানোর কিছু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধর্ম থেকে চ্যুত হওয়া কি করে সম্ভব?

৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোম কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া দখলের পর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। জ্ঞানমার্গী দর্শনের প্রতি তাদের আগ্রহ না থাকলেও কিছু রোমান, গ্রীক দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চালিয়ে যেতে থাকেন। এঁদের মধ্যে সিসরোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে লুপ্তপ্রায় গ্রীক দর্শনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, আবার ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদকে পুনরুদ্ধার করার জন্য লুক্রেটিয়াস সচেষ্ট হন। স্টোয়িক দার্শনিক সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। গ্রীক দর্শন ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে সর্বশেষ *Consolations of Philosophy* (দর্শনের সান্ত্বনা) গ্রন্থের লেখক বোয়েথিয়াস (৪৮০-৫২৪ খৃঃ) দিঙ্নাগ (৪৫০ খৃঃ) ও ধর্মকীর্তির (৬০০ খৃঃ) মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ঐ গ্রন্থটি বহুদিন ধরে ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

খৃষ্টধর্মের ওপরেও নব্য প্লেটোনিক দর্শন প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু গোড়ার

দিকে খৃষ্টধর্ম-যাজকগণ দর্শনের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন ও যীশুর সাদাসিধে জীবন-যাপন ও দরিদ্রের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কাহিনী প্রচার করে সাধারণ মানুষকে তাঁদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁরা জোর দিয়েছিলেন জ্ঞান ও ব্যক্তিগত প্রযত্নের ওপর নয়, বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের ওপর। প্রাচীন খৃষ্ট-ধর্মগুরুগণ দর্শনকে এত ভয়ঙ্কর মনে করতেন যে ৩৯০ খৃষ্টাব্দে যাজক থেবফিল (বিশপ থিওফিলাস) আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। ৪১৫ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী থিওন (Theon)-এর গণিতজ্ঞা কন্যা হাইপেসিয়াকে ধর্মান্ধ খৃষ্টানগণ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। এত নৃশংসতায়ও তাঁরা তৃপ্ত হননি, শেষ পর্যন্ত ৫২৯ খৃষ্টাব্দে, যখন ভারতে চন্দ্রকীর্তি, প্রসস্তপাদ উদ্যোতকরের ন্যায় দার্শনিক এবং বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের মতো জ্যোতিষীর আবির্ভাব হয়েছিল —খৃষ্টান রাজা জাস্টিনিয়ান এক আদেশ জারী করে সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই দর্শনশাস্ত্রের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করেন। সেই সময়েই মানুষ দর্শন চর্চা বিস্মৃত হতে থাকে এবং তখন থেকেই ইউরোপে সাতশত বর্ষব্যাপী কালরাত্রির সূচনা হয়।

৫. সেণ্ট-অগাস্টিন (৩৫৩-৪৩০ খৃঃ)

গ্রীক দর্শন ও খৃষ্টধর্মের সম্পর্ক নিয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি, কিন্তু তরবারির জোরে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার আঘাত তো কঠিন হবেই। যে সময়ে থেবফিল আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার জালিয়ে দিয়েছিলেন তখন সেণ্ট অগাস্টিনের বয়স ৪৭ বছর। যদিও তখন তিনি একজন খৃষ্টান সাধু, কিন্তু সন্ন্যাসের পূর্বে পঠিত দর্শনশাস্ত্রকে কখনও তিনি বিস্মৃত হতে পারেননি। তাই ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সেতুবন্ধন করতে চেয়েছিলেন।

অগাস্টিন উত্তর আফ্রিকাস্থ ট্যাগাস্টার এক খৃষ্টান মা ও কাফ্রী পিতার সন্তান। তাঁর মায়ের নাম মনিকা। দীক্ষা নেওয়ার পর তিনি তিন বছরের জন্য ইতালীর মিলানে ধর্মযাজক হয়েছিলেন। সেখানে তিনি গ্রীক দার্শনিকগণের মতোই যুক্তিদ্বারা খৃষ্টধর্মকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। —কোনো অশুভ থেকে ঈশ্বর সংসার সৃষ্টি করেননি। ঈশ্বরকে অবলম্বন করে আছে বলে সংসার ছিন্নভিন্ন হয় না। ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টিকালে দেশ-কালেরও সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সদাই সৃষ্টিকর্মে রত। তাঁর সৃষ্টির আগে দেশ-কালের অস্তিত্ব ছিল না, কাজেই দেশ কাল থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। অবশ্য ঈশ্বরের সৃষ্টিও চিরস্থায়ী নয়, বিশ্বই আদি, সৃষ্টি পরিবর্তনশীল, ক্ষয়িষ্ণু এবং নশ্বর, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব শক্তিমান, তিনি বস্তুরও স্রষ্টা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. ইসলামী দর্শন

পয়গম্বর মুহম্মদ এবং ইসলামের সাফল্য

§ ১. ইসলাম

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ভারতে শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে ভারত ছোট ছোট স্বয়ংশাসিত রাজ্যে বিভক্ত হতে থাকে, তবুও শেষ পরিণতির জন্য আরও এক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরে উত্তর ভারতে এক বিশাল কেন্দ্র-শাসিত সাম্রাজ্যকে প্রথমে মৌর্যগণ এবং পরে হর্ষবর্ধন যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে শাসন করেন। যে সময়ে ইসলামের সংস্থাপক পয়গম্বর মুহম্মদ তাঁর ধর্ম প্রচার করছিলেন, তখন ভারতে হর্ষবর্ধনের রাজত্ব চলছিল এবং ভারতের দর্শনাকাশে ধর্মকীর্তি যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্বল্‌জ্বল করছিলেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর আরব দুনিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র কবীল (গোষ্ঠী) বা উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। ভেড়া, উট প্রভৃতি পশুপালন এবং লুঠতরাজ ছিল আরবজাতির 'বৈধ' উপজীবিকা। ইবনে সৈয়দের শাসনকালে আরব দুনিয়ার বেশ কিছু অংশে কবীলগুলির নিরঙ্কুশতাকে যে খর্ব করা হয়েছিল তা অবশ্য ঠিক, এবং তা পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খৃঃ) পর্যন্ত বজায়ও ছিল। পয়গম্বর মুহম্মদের সময়ে আরবের কিছু অংশে তথা লোহিত সাগরের অপর তীরে আবিসিনিয়ায় খৃষ্ট রাজ্য ছিল, তার বিপরীত দিকে ছিল মিশরীয় রোমানগণের রাজত্ব। উত্তরে সিরিয়া (দামাস্কাস) ছিল রোমান কাইজারের (রাজধানী বাইজানটিয়াম, বর্তমান ইস্তাম্বুল) শাসনাধীন। পূর্বদিকে মেসোপোটেমিয়া এবং ইরাণে ছিল পারসী শাহান-শাহ্‌র রাজত্ব। আরব ছিল বদ্দু (খানাবদোশ) কবীলদের রেগিস্তানী এলাকা। এর পশ্চিমাংশে বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহর মক্কা ও মদিনা অবস্থিত ছিল। মদিনা তেজারতী কারবার ও ইহুদী সওদাগরদের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু মক্কা ছিল সমস্ত আরবীদের নিকট এক মহান্ তীর্থস্থান, যার জন্য যুদ্ধবাজ আরবও বছরে একবার অস্ত্র ত্যাগ করে রোজা পালন-পূর্বক ভক্তিপূর্ণচিত্তে তীর্থযাত্রা করতে এখানে আসত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও তখন সেখানে একমাসের জন্য মেলা বসাবার সুযোগ পেত।

১. পয়গম্বর মুহম্মদ

(১) **জীবনী**—আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান হওয়ার কারণে মক্কার কাবা মসজিদের মৌলবীগণের শুধু যথেষ্ট আয়ই হতো না, পরন্তু বংশমর্যাদা ও কৃষ্টিতে আরবের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও সম্মানের আসনও তাঁরা দখল করেছিলেন। মুহম্মদের জন্ম হয় ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কার এক মৌলবী-কুরৈশ বংশে। বাল্যকালেই তিনি মাতাপিতৃহীন হন এবং তাঁর লালন-পালনের দায়িত্বভার তাঁর পিতৃব্য ও পিতামহকেই গ্রহণ করতে হয়।

মক্কার মৌলবীগণ পূজার্চনা ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। একবার মুহম্মদের পিতৃব্য আবুতালিব যখন বাণিজ্যযাত্রার উদ্যোগ করছিলেন তখন বালক মুহম্মদ উটের দড়ি ধরে যাওয়ার জন্য এমন বায়না জুড়ে দেন যে পিতৃব্য তাঁকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হন। এইভাবে সাবালকত্ব প্রাপ্তির আগেই ইসলামের ভাবী পয়গম্বর, প্রতিবেশী দেশসমূহের উর্বরতা, রুক্ষতা, সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি সতর্কতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করেছিলেন। যৌবন প্রাপ্তির পর মক্কার একজন ধনী বিধবা খাদিজা মুহম্মদের তীক্ষ্ণ বাণিজ্য-নৈপুণ্যের কথা শুনে তাঁকে নিজ কারবারের মুখিয়ার পদ দিয়ে বাণিজ্য করতে পাঠান। মুহম্মদ অক্ষরজ্ঞানহীন ছিলেন, এমন প্রবাদ প্রতিবাদযোগ্য—বিশেষত একটি বড় কারবারী দলের সর্দারের পক্ষে তো লোকসানেরই ব্যাপার। যদি তাই-ই হয় তবে বুঝতে হবে যে নিরক্ষরতার অর্থ নির্বুদ্ধিতা নয়। তরুণ মুহম্মদ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, আর এই প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা যা পুঁথিগত জ্ঞানের চেয়েও বড়। মুহম্মদ এইভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা রাখতেন এবং তা করেও ছিলেন।

পয়গম্বর মুহম্মদের কুলধর্মে তৎকালীন আরবে মূর্তিপূজা ছিল। কাবা মসজিদে ৩৬০টি দেবমূর্তি এবং তা লাল রঙের চতুষ্কোণাকৃতি, আর একটি ভাঙা কৃষ্ণ পাষাণ (হজ অসওয়াদ) পূজিত হতো। প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের বুদ্ধিকে তা যেন উপহাস করছিল, কিন্তু পুরোহিতবর্গ আত্মস্বার্থ রক্ষার্থে সবরকম ধূর্ততার সঙ্গে ঐ রীতিকে জিইয়ে রাখতে চাইছিল। মুহম্মদ ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা সমাজের কুসংস্কারকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে চাননি। এর ওপর বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যযাত্রার ফলে এমন সব ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন যাঁদের ধর্ম আরবের মূর্তিপূজা অপেক্ষা অধিকতর উদার বলে তাঁর মনে হয়েছিল। বিশেষত খৃষ্টান সাধু ও গীর্জার শান্তি তথা বৌদ্ধিক বাতাবরণ এবং ইহুদীর অমূর্ত একেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর বেশী পছন্দ হয়েছিল। কোরাণে ইহুদী পয়গম্বরদের এবং যীশুকেও ঈশ্বর-প্রেরিত দূত (রসুল) এবং তোরাত (Old Testament) ও

New Testament কে ঈশ্বরীয় পুস্তক বলে মান্য করা হয়েছে। তাঁদের মহিমা বহু জায়গাতেই পুনরুল্লিখিত হয়েছে এবং বারংবার প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে তাতে একজন পয়গম্বরের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং তিনিই স্বয়ং মুহম্মদ। তৎকালীন আরব গোঁড়া মূর্তিপূজক এবং বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে ইহুদী, খৃষ্টান তথা আশপাশের অন্যান্য ধর্মমতের সংস্পর্শে এসে এ কথাও স্বীকার করত যে, এই দেবতাসমূহের ওপরেও একজন ঈশ্বর আছেন (আল্লাহ)। বলা চলে এই আল্লাহকে তারা মনে করত ইহুদীদের যেহোবার মতো লম্বা শ্মশ্রু-বিশিষ্ট চোগা পরিহিত একজন স্বর্গস্থ পুরুষ অথবা খৃষ্টানদের—বিশেষত নেষ্টোরীয় শাখার খৃষ্টানদের (Nestorian) নিরাকার-সাকার মিশ্রিত পিতার (ভগবানের) মতো দেখতে। হ্যাঁ, তারা আল্লাহ্-প্রেরিত রসুল ও পুস্তকের পরিবর্তে কিছু সময়ের জন্য তাদের ওপর ভর করে এই রকম দাবীকারী ধূর্ত ওঝাকে রসুল ও তার ভাষণকে স্বর্গীয় পুস্তকের স্থান দিত। দুই ধরনের 'রসুল' আর 'পুস্তক' থেকে লাভও ছিল লোকসানও ছিল কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে সমস্ত কবীলদের একত্রিত করে এক বৃহৎ আরব জনসমাজ তথা এক ধর্মীয় রাজ্য সৃষ্টি করতে ওঝা অথবা রসুল এবং তাদের বক্তব্য-বক্তৃতা সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত ছিল। মুহম্মদ তাঁর ব্যবসায়ী জীবনে দেখেছিলেন যে আরবের প্রতি এলাকায় কবীলদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং চুঙ্গীকর আদায়ের দাপটে অন্যদেশ থেকে আগত ব্যবসায়ীগণ কত অসুবিধায় পড়তেন; যদিও বা একটা অঞ্চল থেকে আল্লার নাম নিয়ে জান মান বাঁচিয়ে সরে পড়া সম্ভব হতো তবুও অন্য এলাকার কবীলদের হাত থেকে নিস্তার ছিল না। এ ক্ষেত্রে তারা রোমের কাইজার কিংবা ইরাণের শাহের রাজ্যে প্রবেশ করলে সরকারী চুঙ্গীকর কর্মচারীদের হাতে মাশুল চুকিয়ে দিলেই ঝামেলা মিটে যেত এবং তাদের আতঙ্কগ্রস্ত হৃদয় থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে যেতে দেখা যেত। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি হজরত মুহম্মদ ঐ জঙ্গলের রাজত্ব দূর করে, জোর যার মুল্লুক তার নীতির জায়গায় সমস্ত কবীলগুলিকে মিলিত করে ইসলামের (=শান্তির) বিধান চেয়ে থাকেন তবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে। একচ্ছত্র শাসন ও শান্তি (=ইসলাম) স্থাপনকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করেও তাঁদের মতো হতে পারেননি, যাঁরা মানব প্রকৃতির গম্ভীর বিশ্লেষক তথা মুদ্রিত নেত্রে দিবাস্বপ্ন দেখে থাকেন। তিনি এটা ভালো করেই বুঝেছিলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাধাকে অতিক্রম করা শুধু-নিশ্চেষ্ট ঈশ্বরারাধনা, প্রার্থনা এবং অস্ত্রত্যাগ করে শহীদ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সম্ভব নয়। তার জন্য একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষকে সশস্ত্র ও সুসংগঠিত করার প্রয়োজন, যারা দৃঢ়সংকল্প এবং সুব্যবস্থিত অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে শান্তি (=ইসলাম) স্থাপনে বাধাদানকারীদের সাফল্যের সঙ্গে পরাজিত করতে সক্ষম হবে।

হ্যাঁ, মুহম্মদের দূরদর্শিতাই কবীলদের দিয়ে এক বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে

এবং তার শক্তি ও সীমা বর্ধিত করতে, কি কি করা আবশ্যক তা বলে দিয়েছিল। মৌলবী-শাসিত মক্কার সমাজে তাদের ধর্মের বিরোধিতা করে এক নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও পয়গম্বর হওয়া খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। মুহম্মদ যথেষ্ট আত্মসংযমী ছিলেন। খৃষ্টান সাধুদের মতো তিনি নির্জন গুহায় কয়েকবার একান্তবাসও করেছিলেন।

(২) নতুন অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা—তিব্বত, আরব বা আমাদের সীমান্তবর্তী এলাকা, যেখানেই হোক না কেন সর্বত্রই কবীল-প্রথা পালনকারী জাতিদের মধ্যে পশুপালন, কৃষি এবং বাণিজ্যের অতিরিক্ত লুঠের আমদানীকৃত আয়ও (=মালে গনীমত) বৈধ জীবিকা বলে গণ্য ছিল। তাদের নিকট 'মালে-গনীমত'কে সম্পূর্ণ বেআইনী ঘোষণা করার অর্থ ছিল আরবের প্রাচীন রীতি ও আর্থিক দিককে ক্ষতিগ্রস্ত করা—যদিও আয়ের এই পন্থা থেকে সমগ্র আরব পরিবারের যে খুব একটা লাভ হতো তা নয়—তবুও জুয়াড়ি যেমন বারবার জুয়ায় হেরেও ভাগ্য পরিবর্তনের আশা ছাড়তে পারে না তেমনই তারাও এই রীতিকে আঁকড়ে ধরেছিল। হজরত মুহম্মদ 'মালে-গনীমত' নামকরণ করেও একে ইরাণ ও রোমের দেশবিজয় থেকে আদায়ীকৃত ভেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন বটে, তবে তাকে ব্যাপক অর্থে পরিবর্তিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু আরব-উপদ্বীপে তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সেখানকার মানুষ মালে গনীমতের সেই প্রাচীন অর্থটাই বুঝেছে এবং তা আল্লারই আদেশ মনে করেছে। এর পরিণাম এই হয়েছিল যে, আরবের বাইরে অনারবীরা যখন লুঠতরাজের বিধিকে সরিয়ে শান্তি (=ইসলাম) স্থাপনে অনেকটা সমর্থ হয়েছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আরবের কবীলরা তাদের সেই তেরশ বছরের পুরনো প্রথাকে ধরে রেখেছে। যাই হোক, মালে-গনীমতের নতুন ব্যাখ্যা—বিজয়লব্ধ সম্পত্তির ৫ ভাগের ১ ভাগ দিতে হবে সরকারী খাজনা হিসেবে এবং বাকি অংশ বিজয়ী যোদ্ধবৃন্দকে সমভাগে বণ্টন করে দিতে হবে—বিস্তৃত রাজ্য স্থাপনে ইচ্ছুক এক ব্যবহারকুশল দূরদর্শী শাসকের কাছেও কাম্য এবং উপলব্ধ সত্য ছিল; যিনি আর্থিক লাভের ইচ্ছাকে জাগরূক রেখে প্রথমে আরবী-আফগানিস্তানের কঠোর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত বদ্দু তরুণদের এবং পরে সমগ্র অঞ্চলের ইসলামী সমাজে প্রসারিত করে তথা শ্রমজীবী মানুষকে ইসলামী সৈন্যদলে ভর্তি করার জন্য আকৃষ্ট করেছিলেন। আবার একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা খাজনাও ঐ শক্তিশালী সুসংগঠিত শাসনকে রক্ষা করছিল। মালে-গনীমত বণ্টনে সমতা রক্ষা এবং আরবী কবীলগুলির মধ্যে ভ্রাতৃভাব ইসলামী সাম্যের যে নমুনা মানুষের সামনে রেখেছে, তার অধিকাংশ কিছু সময়ের জন্য এবং বাকি অংশ বেশ কিছু শতাব্দী ধরে এক শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে সফল হয়েছে।

মালে-গনীমতের এই নতুন ব্যাখ্যা সম্পদ বণ্টনের এক শক্তিশালী বৈপ্লবিক

রূপকে তুলে ধরে, যা কি-না আল্লার স্বর্গীয় পুরস্কার তথা অনন্ত জীবনের ধারণাজাত নির্ভীকতার সঙ্গে মিলিত হয়ে সারা দুনিয়ায় সেই আলোড়ন তুলেছিল, যাকে আমরা ইসলামের সজীব ইতিহাস বলি। এ কথা সত্য যে মালে-গনীমতের এই ব্যাখ্যা শুধু দরায়ুস, আলেকজাণ্ডার ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই নয়, অন্যান্য সাধারণ রাজাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কিন্তু তাঁদের মানসিকতা এত উন্নত ছিল না যে লাভের অংশের সমানভাগ সাধারণ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করার কথা মনে রাখবেন। তাছাড়া এটা ছিল সব থেকে বড় আফসোসের কথা যে বিজিত জাতির সাধারণ নিঃস্ব মানুষ, এর ভাগীদার হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল তাঁদের রাজত্বে। অথচ সেক্ষেত্রে ইসলাম কিন্তু বিজিত জাতির অধিকাংশ ধনী ও শাসক সম্প্রদায়ের মানুষদেরই নাজেহাল করত এবং শরণার্থী দরিদ্র নিপীড়িত মানুষদের সহানুভূতি সহযোগে নিজেদের লাভের অংশ দিতে দ্বিধা করত না। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলাম বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল সামন্ত-পুরোহিতদের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গেই যার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ছিল সামন্তবাদী শোষণ ও দাস প্রথা। এ কথা ঠিক যে ইসলাম এই মৌলিক ভিত্তিকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্য কখনও ঘোষণা করেনি, কিন্তু এই কাজে আরবে কবীলদের মধ্যে প্রচারিত সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নীতিকে অবশ্যই ব্যবহার করেছিল, যাতে তারা মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর পায়ের নিচে পড়ে থাকা সাধারণ জনতার এক বিরাট অংশকে আকৃষ্ট এবং শোষণমুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। যদিও ইসলাম ঐ নীতিকে কবীলগুলির সামাজিক কাঠামো থেকেই গ্রহণ করেছিল তবুও পরিণামে এটি একটা প্রগতিশীল শক্তির কাজ করেছিল। এবং এইভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী বহু সামন্ত পরিবার ও তাদের স্বার্থ নষ্ট করে সর্বত্র নতুন শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। এ কথা ঠিক যে নতুন শক্তিও পরে ঠিক একই রকম লুণ্ঠনের নীতি চালিয়েছিল। দাসদাসীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরও লুঠের মাল হিসেবে ধরে নিত। এই নীতি অনুসরণ করা শুধু ইসলামের একার দোষ নয়, সেই যুগে সমস্ত সভ্য দুনিয়াতেই —চীন, ভারত, ইরাণ, রোম —একে নীতিবিরুদ্ধ মনে করা হতো না।

পয়গম্বর মুহম্মদ আরবী কবীলের দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর মনোযোগ সহকারে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন ; হয়ত নিরক্ষরতার জন্য এগুলির পাঠ অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করেছিলেন। ৪০ বছর বয়সে অনেক চিন্তা ও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে তিনি নিজেকে আল্লার প্রেরিত 'রসূল' বলে প্রচারিত করেন। তাঁর জীবনের অনেক কাহিনীকে কোরাণের সঙ্গে মিলিয়ে আমি 'কুরাণ-সার' লিখেছি তাই এখানে তার আর পুনরুল্লেখ করলাম না। পয়গম্বর মুহম্মদ ইংরেজী প্রবাদ "নিজের ঘর থেকে দান আরম্ভ করা"-র নীতিকে কার্যে রূপায়িত করেন। প্রথমেই তাঁর স্ত্রী খাদিজা তাঁর ধর্মকে স্বীকার করেন। বিরোধীরা

বিরোধিতা করেছিল কিন্তু তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছিল এবং তাদের মধ্যে তাঁর মতো ব্যবসায়ী-যোদ্ধার সংখ্যাই ছিল বেশী। মক্কার পূজারী কবেশগণ তাঁকে উত্ত্যক্ত এবং প্রাণহরণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। ফলে, ৬২২ খৃঃ পূঃ তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় (য়স্রিব) প্রবাসে যান (হিজরত করেন) এই কথা স্মরণ করেই মুসলমানগণ হিজরী সনের সূচনা করেন এবং য়স্রিব শহরকে 'নবীর নগর' (মদিনত্‌ অল্‌-নবী) রূপে চিহ্নিত করে নামকরণ করেন মদিনা। মক্কায় তাঁর পরিচয় ছিল একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে, আর মদিনায় আর্থিক, সামাজিক, বিচার-ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রেই তিনি প্রভাব বিস্তার করেন, এমনকি সৈনাপত্যও করেন। ফলে পশ্চিম আরবের বহু কবীল শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেননি, পরন্তু তাঁর মৃত্যুকালে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কিছুটা হ্রাস করে একটি সংগঠনে আবদ্ধ হতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং সমগ্র আরব ভাষা-ভাষীদেরও এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছিলেন।

২. পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী

পয়গম্বর মুহম্মদ স্বয়ং রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না, তাই প্রথমে তিনি স্বীয় প্রতিবেশী রাজগণ —ইরাণের শাহ, রোমের কাইজার-কে ইসলাম সমর্থন করতে আহ্বান করেন এবং তাঁদের রাজ্যে কোনোরকম হস্তক্ষেপের চিন্তা করেননি ; তা সত্ত্বেও তিনি আরব এবং তার দ্বারা সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার সামনে যে রাজনৈতিক কাঠামোর চিত্র রেখেছিলেন তাতে, রাজতন্ত্র কি, সঠিকভাবে ভাবতে গেলে রাজতন্ত্রেরও উপযোজক না হয়ে, টুকরো টুকরো কবীলস্থানের পরিবর্তে বহুদেশব্যাপী এক বিশাল কবীল বা জনসমাজ গড়ে তোলার কল্পনা কাজ করছিল ; যাতে আরব ও আরবের বাইরের দেশেও ইসলাম সফল হয়, এবং সমস্ত আরবী-অনারবী মুসলমানই নিজেকে এক কবীলা বা জনসমাজের লোক বলে বোঝে। পয়গম্বর সারাজীবনই তাদের কাছে ঈশ্বর-প্রেরিত নেতা ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী নেতাকেও তো ইসলামী জনগণের বিশ্বাসভাজন হতে হবে। মানুষের আস্থা অর্জনের উপায় সম্পর্কে পয়গম্বর স্পষ্ট করে কোনো ব্যবস্থা করেননি ; নয়ত কবীলের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী যে ব্যবস্থা নেওয়া যেত তা বনী-উমাইয়ার (৬৬১-৭৫০খৃঃ) সিন্ধু থেকে সুদূর স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যে প্রয়োগ করা যেত না। এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে মুহম্মদ তাঁর উত্তরাধিকারী শাসক-(= খলিফা) গণ সম্পর্কে মনে করতেন যে তাঁরা কবীলের নেতার মতোই জনগণের সামনে স্বীয় দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেবেন এবং কাইজার বা সুলতানের মতো নিজেকে নিরঙ্কুশ মনে করবেন না। কিন্তু ঐ ব্যবস্থা ছোট এক কবীলে সাফল্যের সঙ্গে চললেও বহু-ভাষা-সংস্কৃতি-দেশ নিয়ে গঠিত বিশাল ইসলামী রাজ্যে চলতে পারে না। এবং আবুবকর (৬২২-৬৪২ খৃঃ), উমর (৬৪২-৬৪৪ খৃঃ), ওসমান (৬৪৪-৬৫৬ খৃঃ), আলী (৬৫৬-৬৬১) প্রভৃতি পয়গম্বরের

নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী সহকারীগণের খিলাফত অর্থাৎ উত্তরাধিকার-শাসন একেবারেই অচল অকেজো বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। পয়গম্বরের মৃত্যুর ৩৯ বছর পরে আমীর-ম্বাবিয়ার হাতে শাসন ভার চলে যায় এবং তখন থেকেই তাঁর সমস্ত উত্তরাধিকারী খলিফাগণ, এমনকি তাঁর নিজের বংশের লোকেরাও—বনী উমাইয়ার (৬৬১-৭৪৭ খৃঃ) বংশ কিংবা বনী-আব্বাসের (৭৪৯-১০৩৭ খৃঃ) বংশ —যিনিই হোন না কেন সকলেই সুলতান বা কাইজারের মতো স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। নিচে এই খলিফাগণের একটি বংশলতিকা দেওয়া হলো।

(১) বনী-উমাইয়া বংশ—ম্বাবিয়া (৬৬১-৬৮০ খৃঃ), প্রথম মাজীদ (৬৮০-৭১৭ খৃঃ), দ্বিতীয় উমর (৭১৭-৭২০ খৃঃ), দ্বিতীয় মাজীদ (৭২০-৭২৪ খৃঃ), হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খৃঃ), বালীদ (৭৪৩ খৃঃ), তৃতীয় মাজীদ (৭৪৩-৭৪৪ খৃঃ), ইবনে ম্বাবিয়া (৭৪৪-৭৪৭ খৃঃ)।

(২) বনী-আব্বাসের বংশ—আবদুল আব্বাস (৭৪৯-৭৫৪ খৃঃ) এবং তাঁর সন্তানগণ।

৩. অনুগামীগণের প্রথম মতভেদ

প্রত্যেক কবীলে ভিন্ন ভিন্ন (ইলাহীকে) অপসারিত করা ইসলাম প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করেছিল—কারণ এক কবীলের ইলাহীকে অন্যটি কেন স্বীকার করবে! আবার যতদিন পর্যন্ত এক আল্লা এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে একীকরণের কাজ কেবলমাত্র আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন এক ভাষা, এক সংস্কৃতি তথা এক জাতীয়তার জন্য কোনো বড় রকম অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি ; কিন্তু, যখন থেকে অনারবীয় জাতিগুলি ইসলাম গ্রহণ করে তার ধার্মিক ও লৌকিক রাজ্যের অংশীদার হতে লাগল তখন এক আল্লা তথা তাঁর রসুলের দ্বারা কাজ চালানো সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়েই হোক অথবা নিজের গরজেই হোক যখন দুই সভ্যতার প্রতিনিধি দুই জাতির মিলন হয়, তখন তাদের আদান-প্রদানও স্বাভাবিকই হয়, কিন্তু যখন একটি অপরটিকে সম্পূর্ণ-লুপ্ত করে তার জায়গা নিতে চায় তখনই ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়, কারণ সেখানে রাজ্যশাসন অপেক্ষা সাংস্কৃতিক বৈষম্যই প্রধান অন্তরায় হয়। এই সাংস্কৃতিক বিবাদই বর্ধিত হয়ে আরবের ইসলামী শাসনকে অনারবীয় শাসনে পরিণত করেছিল। এ বিষয়ে আমি এবার আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আরবের ভিতর বিভিন্ন আরব-অনারব সমাগমের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব কিভাবে পড়েছিল, সেই কথাই বলতে চাই।

তৃতীয় খলিফা ওসমান (৬৪৪-৬৫৬ খৃঃ) সিরিয়া বিজয়ের পরে উমাইয়া বংশের নেতা ম্বাবিয়াকে দামাস্কাসের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। দামাস্কাস ছিল রোমান ক্ষত্রপের রাজধানী এবং সেখানকার রাজকার্য রোমান আইন-ব্যবস্থা অনুযায়ী

পরিচালিত হতো। মুয়াবিয়া এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, এই নতুন জায়গার শাসন-পদ্ধতিতে আরবী কবীলের রাজ্যব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে, না রোমান সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাই চালু রাখা হবে। অস্ত্রের জোরে এই প্রশ্নের সমাধান করা যায় না, কেন না, শাসন-পরিবর্তন দ্বারা সামাজিক বিধি ও কাঠামোর পরিবর্তন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কবীলাশাহীর পরবর্তী বিকাশ, সামন্ততন্ত্র থেকে কবীলাশাহীতে ফিরে যাওয়ার অর্থ ছিল মানবসমাজের প্রগতিকেই পিছু হঠানো। মুয়াবিয়া তাঁর ব্যবহারিক বুদ্ধি থেকে ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, এটা করতে গেলে সিরিয়ার লোকদের প্রথমে বদ্দু তথা অর্ধ-বদ্দু কবীলে পরিবর্তিত করতে হবে, তাঁর সুতীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁকে বলে দিয়েছিল যে, রোমান সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে বজায় রেখেই মানুষকে তাঁর শাসন মানতে তথা আরও বেশী মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করে তাদের শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করলেই, ভালো ফল পাওয়া যাবে। অতএব মুয়াবিয়া রোমের রাজ্য-শাসন প্রণালীকেই স্বীকার করে নিলেন।

ইসলামকে যাঁরা আরবীয়ানার অভিন্ন অঙ্গ মনে করতেন তাঁদের কাছে এটা খারাপ লেগেছিল। যাঁরা পয়গম্বরের সাদাসিধে জীবন-যাপন প্রত্যক্ষ করেছেন, কবীলগুলিতে বিলাসশূন্য সাম্য ও সৌভ্রাত্রময় সমাজ-জীবন দেখেছেন, তাঁদের নিকট মুয়াবিয়ার আচরণ-ভঙ্গি খুবই আক্ষেপের কারণ হয়েছিল। হয়ত উমর যখন খলিফা ছিলেন তখন দাসকে উটের পিঠে চড়িয়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন, মুয়াবিয়া সে রকম করতে পারেননি, কিন্তু দিন-বদলের পালা চলছিল। মুয়াবিয়ার ঐ রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার কথা যখন পয়গম্বরের জামাতা এবং একান্ত অনুগত ভক্ত আলী জানতে পারেন, তখন এর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন এতে ইসলামের ওপর নিদারুণ আঘাত হানা হয়েছে। তাঁর মতে রোম বা ইরাণ যেখানেই তাঁদের রাজত্ব হোক না কেন তা আরবদেশীয় কবীলার সাম্য-সৌভ্রাত্র নীতি অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু আলীর এই কথা ছিল অরণ্যে-রোদন মাত্র। সফল শাসক মুয়াবিয়াকে খলিফা ওসমান চটাতে চাননি। মুয়াবিয়া এবং আলীর মধ্যে স্থায়ী বিরোধ গড়ে ওঠে; কিন্তু তা আর কেবলমাত্র দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ হিসেবে থাকল না। এর পিছনে এল প্রথমত দুই সমাজ-ব্যবস্থা—সামন্তশাহী অথবা কবীলাশাহীকে গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত দুই সভ্যতার সংঘাতে দুইয়ের মধ্যে কেবলমাত্র একটিকে গ্রহণের প্রশ্ন।

আলী (৬৫৬-৬৬১ খৃঃ) ছিলেন পয়গম্বরের চাচাতো ভাই এবং একমাত্র জামাতা। যেহেতু নিজগুণে তিনি পয়গম্বরের স্নেহভাজন ছিলেন সেহেতু কারও কারও ধারণা হয়েছিল যে তিনিই পরবর্তী খলিফা হওয়ার যোগ্য। কিন্তু শক্তি-শালী প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় আবুবকর, উমর, ওসমানের মৃত্যুর পরে তিনি খলিফা পদের অধিকারী হন। দামাস্কাসের শক্তিশালী শাসক মুয়াবিয়ার সঙ্গে তাঁর

বনিবনা ছিল না, কিন্তু কবীলদের গড়ে তোলা মদিনায় বসে আলী মাবিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করে বনী-উমাইয়া বংশকে শত্রুতে পরিণত করে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে সম্মত ছিলেন না। মাবিয়া বর্হিসভ্যতা দ্বারা ইসলামকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টা যখন অর্ধ-প্রকটিত তখনই আলীর শাসন শুরু হয়। যদিও আলী মাবিয়ার কোনো ক্ষতি করতে পারেননি, তবুও মাবিয়া, আলী ও তাঁর সন্তানগণের দিক থেকেই সব চেয়ে বেশী বিপদের আশঙ্কা করতেন। আলীর মৃত্যুর পর যদিও মাবিয়া খিলাফতী নিজের অধিকারভুক্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু পয়গম্বরের একমাত্র কন্যা ফতিমা এবং আলীর দুই পুত্র হাসান ও হুসেন জীবিত থাকায় তিনি শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তো সরলমতি আরবীরা খলিফা মাবিয়ার বাদশাহী চাল-চলনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে না পেরে স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কিত হতে পারত। মাবিয়া এদিকে হাসানকে তাঁর স্ত্রীর সাহায্যেই বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেন এবং মাবিয়ার পুত্র য়াজীদ হুসেনকে নিজেদের পথ থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র করেন। তিনি হুসেনের বশ্যতা স্বীকার করে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়ে তাকে কুফায় (কুফা ছিল বস্রার সুবেদার য়াজীদের রাজধানী) আমন্ত্রণ করেন। পথে আফগানিস্থানের কারবালা প্রান্তরে কি নিষ্ঠুরভাবে হুসেনকে সপরিবারে হত্যা করানো হয়েছিল সেই হৃদয় বিদারক কাহিনী ইতিহাসের সকল ছাত্রছাত্রীই জানে।

হুসেনের এই পরিণতি বেদনাময়। হুসেন ও তার ৬৯ জন সঙ্গীর প্রতি সকল সহৃদয় ব্যক্তিরই যে সহানুভূতি জাগ্রত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? হুসেনের ছিন্নমস্তক যখন কুফার দরবারে য়াজীদের সামনে এনে রাখা হলো এবং ক্ষমতামত্ত নিষ্ঠুর য়াজীদ যখন লাঠির আঘাতে তা সরিয়ে দিলেন তখন এক বৃদ্ধের মুখ দিয়ে আর্তনাদ বেরিয়েছিল—"আরে! ক্ষান্ত হও! ইনি পয়গম্বরের নাতি। আল্লার দিব্যি, আমি স্বচক্ষে এঁর ওষ্ঠে হজরতকে চুম্বন করতে দেখেছি।" মানবিকতার আদালতে আমরা য়াজীদকে নিশ্চয়ই দোষী সাব্যস্ত করতে পারি; কিন্তু প্রকৃতি এরূপ মানবতার প্রমাণ প্রয়োগে অভিভূত হয় না, তার প্রতিটি পদক্ষেপ পূর্ববর্তী ধ্বংসের ওপরেই বেড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আলী, হুসেন বা তাঁদের অনুগামীগণ সকলেই সামাজিক বিকাশকে সামন্ততন্ত্রের থেকে আরও এগিয়ে না দিয়ে বরং তাকে সেই প্রাচীন কবীলাশাহীর দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এতে যদি সাফল্য আসত তবে কিন্তু ইসলাম সেই কলা, সাহিত্য, দর্শনে উৎকর্ষ লাভ করতে পারত না, যাকে আমরা ভারত, ইরাণ, মেসোপোটেমিয়া, তুর্কী ও স্পেনে দেখেছি। এবং গ্রীক দর্শনের মাধ্যমে ইউরোপে সেই পুনর্জাগরণও সম্ভব হতো না, যা ক্রমবিকাশিত হয়ে বৈজ্ঞানিক যুগকে অস্তিত্ব দান করে, জগতের রূপ পাল্টে দেওয়ার আয়োজন করেছিল।

৪. ইসলামী সিদ্ধান্ত

ইসলামী ধর্মগ্রন্থ কোরাণের মুখ্য সিদ্ধান্ত হলো —ঈশ্বর এক, বহু রূপে বিরাজিত এবং তিনি এই জগৎ থেকে বহু দূরে ছয় আকাশেরও পরে সপ্তমাকাশে অবস্থান করেন। তিনি শুধু 'হও' উচ্চারণ করেই অভাব থেকে ভাব-জগৎ নির্মাণ করেছেন। প্রাণী-কুলের মধ্যে অগ্নি থেকে সৃষ্ট 'ফরিস্তা' (দেবতা) এবং মৃত্তিকাজাত মনুষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। ফরিস্তাগণের মধ্যে কেউ কেউ নীতিচ্যুত হয়ে আল্লার দুশমনে পরিণত হয়েছে, তারা মানুষকেও পথভ্রষ্ট করার জন্য সদা সচেষ্ট, এদের বলে শয়তান। এই শয়তানদের নেতা ইব্লিস যখন ফরিস্তা ছিলেন তখন তাঁর নাম ছিল আজাজীল। মনুষ্য মাত্র একবারই জন্মগ্রহণ করে। এবং কোরাণ বা আল্লার বিচার অনুযায়ী কর্মফলস্বরূপ অনন্তকালের জন্য পাপী নরকে এবং পুণ্যবান স্বর্গে যায়। স্বর্গে মনোরম প্রাসাদ, দ্রাক্ষা-বাগিচা, সুধার ফোয়ারা, একাধিক অপ্সরী (হুরী) তথা বহু তরুণ পরিচারক (গিল্মান) আছে। জীবে দয়া, সত্য-ভাষণ, চুরি না-করা প্রভৃতি সব ধর্মের সাধারণ পুণ্যকর্মের অতিরিক্ত নমাজ-পাঠ, রোজা-পালন (উপবাস), দান এবং হজ (অর্থাৎ জীবনে একবার কাবায় তীর্থযাত্রা) হলো চারটি প্রধান পুণ্যকর্ম। নিষিদ্ধ বা পাপকর্ম হলো —বহু দেবতা বা মূর্তি-পূজা, মদ্যপান, হারাম মাংস (কলমা না পড়ে মারা পশুর এবং শুকরের মাংস) ভক্ষণ।

তৃতীয় অধ্যায়

আয়োনীয় (গ্রীক; দর্শনের প্রবাস এবং তার আরবী অনুবাদ

§ ১. অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের পুনঃপ্রচার

ইসলামীক দর্শন হলো গ্রীক দর্শন—বিশেষত অ্যারিস্টটলের দর্শন তথা নব্য প্লেটোনিক (পিথাগোরাস-প্লেটো-ভারতীয় দর্শন) দর্শনেরই বিবরণ এবং নতুন ব্যাখ্যা। যদিও প্লেটো এবং অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকের গ্রন্থও আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তথাপি ইসলামীক দার্শনিক সর্বদা অ্যারিস্টটলকেই অনুসরণ করেছেন, তাই আমাদের উচিত ও প্রয়োজন অ্যারিস্টটলের সুকৃতিপূর্ণ জীবন যাত্রার পুনরালোচনা করা। কারণ সেই যাত্রার এক মহত্বপূর্ণ অংশ ইসলামীক দর্শনেরই সৃষ্টি।

১. অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের গতি

অ্যারিস্টটলের মৃত্যুর (৩২২ খৃঃ পূঃ) পর তাঁর শ্যালক ও শিষ্য থিওফ্রেস্টাস তাঁর যাবতীয় স্বরচিত এবং সংগৃহীত গ্রন্থগুলি প্রাপ্ত হন। থিওফ্রেস্টাস স্বয়ং দার্শনিক এবং দর্শন অধ্যাপনায় অ্যারিস্টটলের উত্তরাধিকারী হওয়ায় ঐ গ্রন্থসমূহের যথার্থ কদর বুঝতেন। ২৮৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর এই পুস্তকসমূহ তাঁর শিষ্য নেলিয়াসের হাতে চলে যায় এবং ১৩৩ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে পুস্তকগুলি তাঁর পরিবারেই ছিল। এরপর তাঁর পরিবার ক্ষুদ্র-এশিয়ার প্রবাসী হন এবং সেই গ্রন্থরাশিও সঙ্গে নিয়ে যান। দ্বিতীয়-তৃতীয় খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসের বহু গ্রন্থানুরাগীরই পুস্তক সংগ্রহের প্রবল নেশা ছিল। (এঁদেরই একটি নমুনা, ভারতের যবনরাজা মিনান্দার)। নেলিয়াস তাই মাটিতে এক গর্ত করে গুপ্তকক্ষে গ্রন্থগুলি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এরপর ১৩৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোমানগণ যখন ক্ষুদ্র-এশিয়াসহ গ্রীক-শাসিত দেশগুলি অধিকার করে তখন নেলিয়াসের পরিবার-বর্গ বইগুলি রক্ষা করতে পারেননি কারণ তা কাগজে লিখিত ছিল না; আর

এতে তাঁদেরও কোনো লাভ ছিল না বরং তাঁরাই পুস্তকগুলি বাজারে বিক্রয় করতে শুরু করেন। বইগুলি এথেন্সের একজন বিদ্যোৎসাহী আমীর অ্যাপ্লিকনাস ক্রয় করেন ও বহুদিন ধরে রক্ষা করেন। ৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোমান সেনাপতি সালরাসেল যখন এথেন্স জয় করেন তখন তিনি এই ঐতিহাসিক নগরের সঙ্গে তাঁর মহান্ উপহার অ্যারিস্টটলের এই অমূল্য গ্রন্থরাজিও অধিকার করে রোমে নিয়ে যান এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গুপ্তকক্ষের পরিবর্তে রোমের জাতীয় গ্রন্থাগারে সাদরে স্থান দেন। এইভাবে দুই শতাব্দী পরে অ্যারিস্টটলের কীর্তিসমূহ প্রজ্ঞাবান বোদ্ধাগণের মনে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। আন্দ্রানিকাস, অ্যারিস্টটলের রচনাগুলি কাল ও ক্রমানুযায়ী সূচিবদ্ধ করেন।

আজকাল অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের যে তিনটি প্রাচীন সূচিপত্র চালু আছে তার মধ্যে দেবযানী লরেটোর সূচিতে পুস্তকের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ১৪৬টি, অনানিমু-র সূচি সংখ্যা প্রায় একই রকম। কিন্তু আন্দ্রানিকাস স্বয়ং অ্যারিস্টটলের গ্রন্থসমূহ দেখে যে সূচিপত্র তৈরী করেছেন তাতে উপরোক্ত দু'জনের হিসেব অপেক্ষা কমসংখ্যক গ্রন্থই উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বের দুই সূচীকার অ্যারিস্টটল সংবাদ ও রচনা, কথা-পুস্তক সমূহ, প্রাণী-বনস্পতি বিষয়ক সাধারণ রচনা, ঐতিহাসিক রচনা, প্রবাদ, ধর্ম সম্বন্ধে মামুলী গ্রন্থ সবকিছুই অ্যারিস্টটলের রচনা বলে প্রচার করেছেন, যেগুলি আন্দ্রানিকাস কিন্তু অ্যারিস্টটলের মৌলিক রচনা বলে মনে করেননি। বস্তুত আমাদের ব্যাসদেব, বুদ্ধ, শঙ্করের একই নামের অন্যান্য লেখকগণের গ্রন্থকেও যেমন তাঁদের গ্রন্থ বলে চালানো হয়েছে, সেই একই অবস্থা হয়েছে অ্যারিস্টটলের ক্ষেত্রেও।

অ্যারিস্টটলের গ্রন্থগুলিকে বিষয় অনুযায়ী যে কয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়, তার মধ্যে প্রধান হলো —(১) তর্কশাস্ত্র, (২) বস্তুশাস্ত্র, (৩) অধ্যাত্মশাস্ত্র (৪) নীতিশাস্ত্র এবং (৫) রাজনীতি। অলঙ্কারশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং প্রাণীশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থগুলি তর্কশাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।

২. অ্যারিস্টটলের পুনর্পঠন-পাঠন

আলেকজাণ্ডার আফ্রীডিসিয়াস অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের পঠন-পাঠনকে সহজতর করার জন্য কিছু বিবরণ রচনা করেন। এই কাজে অ্যারিস্টটলের মৌলিক গ্রন্থের প্রতি তাঁর সযত্ন মনোনিবেশের ফলে আন্দ্রানিকাসের সূচীর সঙ্গে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেলে তার শাসনভার মিশরীয় সেনাপতি টলেমির অধিকারভুক্ত হয়; এবং তখন থেকে ৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তা টলেমির বংশের অধীনে থাকে এবং ক্রমশ মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া

ব্যবসাকেন্দ্র ব্যতীত বিদ্যাকেন্দ্র হিসেবে দ্বিতীয় এথেন্সে পরিণত হয়। রোমে খৃষ্ট-ধর্মের প্রচার যখন তুঙ্গে, তখন গ্রীক দর্শনের পঠন-পাঠনের শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। সেই সময় নব্য-প্লেটোনিক দর্শনও বহুল প্রচারিত ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার একজন প্রখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন ফিলো-জোডাস (২৫-৫০ খৃঃ পূঃ)। ২০৫-২৭১ খৃষ্টাব্দের আলেকজান্দ্রিয়ার আর একজন দর্শনের অধ্যাপক হলেন প্লটিনাস। এঁরা সকলেই রহস্যবাদী নব্য-প্লেটোনিক দর্শনের অনুগামী ছিলেন, যদিও পঠন-পাঠনে অ্যারিস্টটলের গ্রন্থকেও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। পারফিরিয়াস নব্য-প্লেটোনিক দার্শনিক হলেও অ্যারিস্টটলের রচনার গভীরতা উপলব্ধির চেষ্টা করেছিলেন। ২৩৩ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার তায়র নগরে এঁর জন্ম হয় এবং শিক্ষালাভ হয় আলেকজান্দ্রিয়ায় প্লটিনাসের নিকট। শিক্ষান্তে তিনি অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। ইনি অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের বিবরণ ও ভাষ্য রচনা করেন। তর্কবিদ্যার ছাত্রদের জন্য তাঁর লিখিত গ্রন্থ ইসাগোজী-কে আরবে অ্যারিস্টটলের রচনা বলে মনে করা হয়েছিল। সংস্কৃত টোলের তর্ক-সংগ্রহ ও মুক্তাবলীর মতোই এই গ্রন্থ আজও আরবী মাদ্রাসায় অবশ্য-পাঠ্য পুস্তক।

খৃষ্টধর্ম অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্মের মতোই দর্শনের বিরোধী ছিল, যে বিরোধ ভক্তিবাদ ও যুক্তিবাদের (দর্শন) মধ্যে সর্বত্রই দেখা যায়। খৃষ্টানদের হাতে রাজ্য শাসনভার আসার পর তারা এই দর্শন নামক আপদটাকে বিদায় করতে চাইল। ৩০০ খৃষ্টাব্দে কিভাবে পাদরী থিওফিলাস আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করেন এবং ৪১৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানগণ আলেকজান্দ্রিয়ার বিদূষী গণিতজ্ঞা হাইপেনিয়াকে কি নির্মমভাবে বধ করেছিল তা আমি আগেই বলেছি। এর পরেই খৃষ্টান রাজা জাস্টিনিয়ান ৫২৯ খৃষ্টাব্দে এক রাজাজ্ঞা-বলে দর্শনের পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেন।

§ ২. আয়োনীয় (গ্রীক) দার্শনিকগণের প্রবাস ও দর্শনানুবাদ

১. গ্রীক দার্শনিকগণের প্রবাস

দর্শনদ্রোহী জাস্টিনিয়ানের শাসনকাল থেকেই রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তার প্রতিবেশী দেশ ইরাণ, যে কখনও কোনো খৃষ্টধর্ম বা অসহিষ্ণু ধর্মকে স্বীকার করেনি। সেই সময়ে ইরাণের সুলতান ছিলেন কবদ (৪৮৭-৪৯৮ খৃঃ)।

মজদক—কবদের সময়ে ইরাণের বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তিনি বস্তুবাদী দার্শনিক এবং সাম্যবাদ ও সঙ্ঘবাদের প্রচারক। সম্পত্তি ব্যক্তিগত নয় সঙ্ঘগত এবং সমস্ত মানুষকেই সমান ও এক পরিবারভুক্তের মতো সম্মিলিত করা প্রয়োজন—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। সংযমী, শ্রদ্ধাশীল ও জীবের প্রতি দয়ালু

ব্যক্তিই মনুষ্য নামের যোগ্য। মজদকের শিক্ষা যখন ইরাণে দ্রুত প্রচারিত হয় এবং স্বয়ং কবদও যখন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তখন আমীর ও পুরোহিতবর্গ যেন বিপদের গন্ধ পান। মজদকের সিদ্ধান্তকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করতে না পেরে তরবারির জোরে তাকে খণ্ডনের প্রচেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেন। কবদকে বন্দী করে তাঁর ভাই জামাস্পকে (৪৯৮-৫৫০ খৃঃ) সিংহাসনে বসিয়ে পুরোহিত ও সামন্ত প্রভুরা যদিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন কিন্তু মজদকের শিক্ষার অপ্রতিহত প্রভাবেই জামাস্প ভ্রাতৃ-শোণিতে হস্তরঞ্জিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কবদ কোনো মতে কারাগার থেকে পলায়ন করেন। ঐ সময়ে ইউরোপ এবং এশিয়ায় (ভারতেও) মধ্য এশিয়ার অসভ্য বদতু-হুন জাতিরা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। কবদ তাদেরই সাহায্যে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। কবদ প্রথমে তো মজদকের বিচারের সঙ্গে একমত ছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদের প্রয়োগ যখন সফল হতে লাগল, তখন সকল কালেরই শিক্ষিত 'আদর্শবাদীগণে'র মতো তিনিও মজদকের বিরোধী হয়ে গেলেন এবং তাঁরই আদেশে হাজার সাম্যবাদী মজদকীকে হত্যা করা হয়।

৫২৯ খৃষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান দর্শনের চর্চা নিষিদ্ধ করে দেন। এর আগে ৫২১ খৃষ্টাব্দে কবদের কনিষ্ঠ পুত্র খুশরু (৫২১-৫৭০ খৃঃ) ভাইদের হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। মজদকপন্থী সাম্যবাদীগণ তখনও নিজেদের প্রভাব বর্ধিত করে যাচ্ছিলেন, তাই পুরোহিত ও আমীরবর্গের সমর্থনপুষ্ট খুশরু এক লক্ষ মজদকপন্থী আদর্শবাদীকে খুন করে নিজের 'ন্যায়পরায়ণতা'-র পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এই 'সুকীর্তি'-র সাফল্য উপলক্ষে 'নৌসেরবান' (নতুন শাহ্‌) উপাধি ধারণ করেন; আমীর-পুরোহিত বর্গ তাঁকে 'ন্যায়পরায়ণ' (আদিল) পদবীতে ভূষিত করেন।

২. গ্রীক দর্শন-গ্রন্থের ইরাণী অনুবাদ

নৌসেরবান কৃত কয়েকটি প্রশংসনীয় কাজের মধ্যে একটি হলো নিঃস্ব গ্রীক দার্শনিকদের আশ্রয় দান। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে যে সাত জন নব্য-প্লেটোনিক দার্শনিক এথেন্স থেকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নৌসেরবানের শরণ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ডায়োজেনিস, হারমিয়াস, ইউলেলিয়াস, প্রিসিয়ান, ইসিডোর, ডুমাসিয়াস এবং সিম্পলিসিয়াস। এঁদের আশ্রয় দানের পিছনে নৌসেরবানের আন্তরিকতা যত না ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল রোমান কাইজারের বিরোধীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিসন্ধি। পূর্বপুরুষদের মতো তিনিও কাইজারের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইতেন। ৫৪৯ খৃষ্টাব্দে অসমাপ্ত এক যুদ্ধের ওপর নির্ভর করে তিনি রোমকে পরাজিত করে তাঁর শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করেন। সন্ধির এই শর্তের মধ্যে একটি হলো রোমের কাইজার তাঁর রাজ্যে ধার্মিক বিচারক তথা

দার্শনিকগণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবেন। এরই ফলে কিছু পণ্ডিতের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হলেও ডুমাসিয়াস ও সিম্পলিসিয়াস সেই অনুমতি পাননি।

(১) ইরাণী (পহ্লবী) ভাষায় অনুবাদ—নৌসেরবান জন্দেশাপোরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যেখানে বিশেষভাবে দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হতো। এ ছাড়া কিছু গ্রীক দর্শন-গ্রন্থের এবং অন্য কিছু গ্রন্থেরও (যার মধ্যে পৌলুস পার্সা অনূদিত অ্যারিস্টটলের তর্কশাস্ত্রও আছে) অনুবাদ হয়েছিল। কয়েকজন অনুবাদক নেষ্টোরীয় সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান হওয়ার কারণে কাইজারের সমর্থনপুষ্ট খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন ছিলেন।

ইরাণী নাস্তিক্যবাদ (জ্রুবানবাদ)—এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে আগে থেকেই ইরাণে একটা স্বতন্ত্র বিচারধারা চলে আসছিল। নৌসেরবানের আগে দ্বিতীয় যজ্‌দাগির্দ-এর সময়ে এক নাস্তিক্যবাদ প্রচলিত ছিল যার নাম হলো জ্রুবানবাদ। পহ্লবীভাষায় কালকে জ্রুবান বলা হয়। এই ব্যক্তিগণ কালকেই মূল কারণ বলে মনে করতেন তাই এঁদের জ্রুবানবাদী-কালবাদী বলা হয়। নাস্তিক হলেও তাঁরা নিয়তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

(২) সুরিয়ানী (সিরিয়ার) ভাষায় অনুবাদ—খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বিশ্বের বাণিজ্যক্ষেত্রে সিরিয়ার বণিকদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। একদিকে যেমন ইরাণ, রোম, ভারত ও চীনের বাণিজ্যক্ষেত্রে সিরিয়ার প্রাধান্য বজায় ছিল, অন্যদিকে তেমনই পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং পশ্চিমে ফ্রান্স পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপেও বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। এমনকি মাদ্রাজের সিরিয়ান খৃষ্টানগণ প্রমাণ করেছিল যে দক্ষিণভারত পর্যন্তও তারা গিয়েছিল। বাণিজ্যের সঙ্গে ধর্ম-সংস্কৃতিরও আদান-প্রদান হয়, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে গ্রীক দর্শনও প্রচারিত হচ্ছিল। সিরিয়ান পণ্ডিতগণ গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক দর্শনকেও আলেকজান্দ্রিয়া (মিশর) এবং আণ্টিয়োক (ক্ষুদ্র-এশিয়ার এক গ্রীক নগর) থেকে তুলে নিয়ে ইরাণ (জন্দেশাপোর), মেসোপোটেমিয়া এবং নিসিবী পর্যন্ত প্রচার করেছিল। ইরাণের পূর্ব-পশ্চিম দুই দিকেই খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম ও ভাষা ছিল সিরিয়ার নিজস্ব। সেই সঙ্গে তাদের মঠে গ্রীক ভাষাও পড়ানো হতো। এদেস্‌সা (মেসোপোটেমিয়া)-তেও খৃষ্টানগণের এক বিদ্যাকেন্দ্র ছিল যার ফলে এদেস্‌সা ভাষা (সিরিয়ার এক আঞ্চলিক ভাষা) সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা পেয়েছিল। এখানকার অধ্যাপকগণকে নেষ্টোরীয়-ভাবাপন্ন দেখে ৪৮৯ খৃষ্টাব্দে এদেস্‌সার মঠ-বিদ্যালয় নিষিদ্ধ করে তা সিরিয়ায় (নিসিবীতে) স্থানান্তরিত করা হয়।

(ক) নিসিবী (সিরিয়া)—নিসিবী নগর ইরাণের অধিকৃত প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এবং তার শাসনভার ছিল সাসানী সুলতানের হাতে। নেষ্টোরীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখানে দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রও শেখানো হতো। দর্শনের ছাত্র এবং শিক্ষকগণের মর্যাদায় ধর্মনেতাগণ ঈর্ষাপরবশ হয়ে

৫২০ খৃষ্টাব্দে একটি আইন প্রবর্তন করেন যে, যে গৃহে ধর্ম-পাঠ হয় সেখানে লৌকিক শিক্ষা দান করা চলবে না।

মেসোপোটেমিয়ার যে অঞ্চলে নিসিবী এদেস্‌সা প্রভৃতি ইরাণী শহর অবস্থিত ছিল সেখানে তখন সিরিয়ান ভাষা-ভাষীগণ বাস করতেন। পরবর্তী মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খৃঃ) পরে মেসোপোটেমিয়ার সিরিয়ান খৃষ্টানগণকে যে কি নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয় তা আজও বহু পাঠক ভুলে যাননি। আজ ইরাক, সিরিয়া, মিশর, মরক্কোয় যে আরবী ভাষা প্রচলিত আছে, তা ইসলাম ও আরবের প্রসারের জন্যই হয়েছে। এইভাবে প্রাথমিক খৃষ্টীয় শতকগুলিতে এদেস্‌সা ও তার প্রতিবেশী নগর ইরাণও ছিল সিরিয়ান ভাষা-ভাষী অধ্যুষিত।

চতুর্থ থেকে অষ্টম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মেসোপোটেমিয়ার এই বিদ্যালয়ে প্রচুর গ্রীক দর্শন ও শাস্ত্রীয় পুস্তকের অনুবাদ হয়েছিল, যার মধ্যে সার্জিয়াসের অনুবাদ ছিল বিক্রয় ও পরিমাণ দুই দিক থেকে বিচারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মেসোপোটেমিয়া যখন ইসলামের দ্বারা অধিকৃত হয়, তখনও সিরিয়ানদের অনুবাদ-কর্ম থেমে ছিল না; এদেস্‌সার ইয়াকুব (৬৪০-৭০৮ খৃঃ) এই সময়েই তাঁর অনুবাদ-কর্ম শেষ করে-ছিলেন। এতে সর্বত্রই মূলকে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, শুধু গ্রীক মহাপুরুষ ও দেবদেবীগণের পরিবর্তে খৃষ্টান মহাপুরুষের নাম করা হয়েছিল। এই ব্যাপারে আরবী অনুবাদ আরও এক ধাপ এগিয়ে ছিল। সিরিয়ায় অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার অনুবাদই বেশী হয়েছিল এবং তৎকালীন সিরিয়ান পণ্ডিতগণ অ্যারি-স্টটলকে শুধুমাত্র যুক্তিশাস্ত্রবিদ্‌ বলেই মনে করতেন।

অষ্টম থেকে দশম খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার শিক্ষিত লোকেরা বাগদাদের খলিফার শাসনকালে গ্রীক গ্রন্থ-সমূহের সিরিয়ানী অনুবাদ তথা তার স্বতন্ত্র রূপের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে আরবী ভাষায় তা অনুবাদ করেন। তাঁদের সব চেয়ে বড় মহত্ত্ব হলো, গ্রীকগণ তাঁদের দর্শন চর্চা যে জায়গায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, সিরিয়ানগণ তাকে সেখান থেকেই নিয়ে বিচারোত্তীর্ণ নয় কালোত্তীর্ণ করেছিলেন, এবং আরবকে আরও প্রগতি দান করে নিজেদের কর্তব্য সমাপ্ত করেছিলেন।

(খ) ইরাণের সাবী (ধর্মাধ্যক্ষ)—যখন গ্রাক তথা অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলি খৃষ্টধর্মের শক্তিশালী প্রচারের ফলে গ্রীক এবং অন্যান্য দেশের দেব-দেবীদের ভুলে গিয়েছিল তখনও মেসোপোটেমিয়ার ইরাণ নগরে সুসভ্য মূর্তিপূজকগণ ছিলেন যাঁরা গ্রীসের দার্শনিক বিচারের সঙ্গে তাঁদের দেব-দেবীদের প্রতিও শ্রদ্ধায় অবিচল ছিলেন। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইসলামীক বিজয়ের ফলে তাঁদের পক্ষে দেবতা ও মন্দিরের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়নি তাই পূজার্চনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; অবশ্য তাঁদের দার্শনিক বিচারকে নষ্ট করে দেওয়া এত সহজ ছিল না। পরে এইসব সাবী অর্থাৎ ধর্মাধ্যক্ষগণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে নিজেদের দার্শনিক বিচারকে একত্রিত করতে গিয়ে বড়ই ভুল করেছিলেন, এর জন্য গোঁড়া মুসলমানগণ

চিরকাল তাঁদের দোষারোপ করে এসেছেন। গ্রীক দর্শনের আরবী অনুবাদ করার পিছনে তাঁদের স্পষ্ট প্রভাব ছিল।

৩. গ্রীক দর্শন-গ্রন্থের আরবী অনুবাদ (৭০৪-১০০০ খৃঃ)

প্রথম চারজন আরবী খলিফার পর আমীর ম্বাবিয়ার খলিফা হওয়া, কবীলাশাহী (আরবী) এবং সামন্তশাহী ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব, হুসেনের পরিণতির সঙ্গে কবীলাশাহীরও কবরস্থ হওয়ার কথা আমি আগেই বলেছি। ম্বাবিয়ার বংশ বনী-উমাইয়ার খিলাফতীর দিনগুলিতে ইসলাম ধর্মকে যতদূর সম্ভব বহির্জগতের প্রভাব থেকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু রাজ্য-ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহির্দুনিয়ার সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক ছিল তা থেকেই আরব ঐ সভ্যজাতি-সমূহের কিছু কিছু রীতিনীতি শিখে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, বিশেষত দরবারী চাল-চলন, আদব কায়দা প্রভৃতিতে তারা ইরাণীদের নকল করত। অজ্ঞ এবং উগ্রস্বভাব আরবীদের কঠোর সমালোচনা ও সক্রিয় ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য ম্বাবিয়া অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে প্রথমেই তাঁর রাজধানী মদিনা থেকে দামাস্কাসে স্থানান্তরিত করলেন, ফলে মদিনার মহত্ত্ব বজায় থাকল কেবল তীর্থক্ষেত্র হিসেবে।

এ কথা আমি আগেই বলেছি যে, বনী-উমাইয়া বংশের শাসনকালে ইসলামীক শাসন ও প্রচার মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং মোটামুটি যখন পর্যন্ত আরবে অস্ত্রের জোরই বড় ছিল ততদিনই তাঁরা সাফল্যের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলেন। এরপর ইউরোপ, এশিয়া এবং ভারত সাগরের তীরবর্তী বহু অঞ্চলেই ইসলাম ধর্ম বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু এই সাফল্যের জন্য আরব নয় অনারবীয় মুসলমানগণই অধিক কৃতিত্বের দাবিদার। প্রথম চোটেই আরবী মুসলমানগণ কবীলাশাহীকে সমর্থন করা থেকে বিরত হয়েছিল, কিন্তু তাতে সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। ইরাণী এবং সিরিয়ানগণের মধ্যে যাঁরা ইসলামকে স্বীকার করেছিলেন তাঁরা আরবের অসভ্য বদ্দু নন, বরং আরবের চেয়ে অনেক উন্নত সভ্যজাতি; তাই তাঁরা বরং আরবের ইসলামরূপী তরবারির সামনে বুক পেতে দিতে রাজী ছিলেন, তবু নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিতে সম্মত হননি। কারণ, এ রকম কাজের অর্থ দাঁড়াত সমস্ত জাতির বৌদ্ধিক যোগ্যতাকে নষ্ট করে তাকে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ তারুণ্যকে শৈশবে পরিণত করা। অবশ্য বনী-উমাইয়া বংশের পরবর্তী শাসকগণকে অনেক বেশী বোঝাপড়া করতে দেখা গেছে।

ম্বাবিয়া, য়াজিদ, দ্বিতীয় উমর প্রভৃতি শাসকগণ দক্ষ ছিলেন বটে, তবে প্রাচীন রাজবংশগুলির খলিফাগণ ক্রমশই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ছিলেন; এমনকি ম্বাবিয়ার অষ্টমতম উত্তরাধিকারী ইবনে ম্বাবিয়া (৭৪৪-৭৪৭ খৃঃ)-কে সিংহাসনচ্যুত হতেও

হয়েছিল। যে কুফায় শাসক থাকাকালীন য়াজিদ হুসেনের রক্তে নিজের হাত রাঙিয়েছিলেন, সেই কুফারই এক আরবী নেতা আব্দুল আব্বাস (৭৪৯-৭৫৪ খৃঃ) নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। খলিফাকে কবীলাদের বিশ্বাসভাজন হতে হবে এই নীতি বনী-উমাইয়া বংশই ধ্বংস করে, আর দুনিয়ার অন্যান্য ক্ষমতাবান রাজগণের মতো তলোয়ারকে চরম মীমাংসক বলে মেনে নেন, কাজেই আব্বাসের আচরণের বিরুদ্ধে আর কি অভিযোগ করা যেত? আব্বাস বনী-উমাইয়ার শাহজাদাগণের মধ্যে যাকে পেয়েছেন তাকেই নির্বিচারে হত্যা করেছেন; যদিও এই হত্যাকাণ্ড কারবালা প্রান্তরের শহীদগণের তুলনায় অধিক বেদনাদায়ক ছিল না, তবুও তা ইতিহাসের কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি তো বটেই। এই শাহজাদাগণের মধ্যেই একজন আব্দুর রহমান পশ্চিম দিকে পালিয়ে গিয়ে স্পেন ও মরক্কোয় নিজের বংশগত রাজত্ব কিছুদিন টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আব্বাস সমগ্র এশিয়ার ইসলামী রাজ্যগুলিতে অধিকার বিস্তার করেছিলেন। সূচনাতে আব্বাসী বংশের রাজধানী দামাস্কাসেই ছিল, কিন্তু তাঁর পুত্র খলিফা মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খৃঃ) ৭৬২ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে নগর-পত্তন করে সেখানেই রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এবার খিলাফতী আরবী বাতাবরণ ছেড়ে অনারবীয় —ইরাণী, সিরিয়ানী-পুষ্ট-বাতাবরণে এসে গেল, ফলে আব্বাসী খিলাফতে বাইরের প্রভাবই বেশী দেখা যায়। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে শুরু থেকেই মুসলমানগণ আরবী রক্তকে বিশুদ্ধ রাখতে খুব সচেষ্ট ছিলেন না, বিশেষ করে মাতৃকুলের। পয়গম্বরের নাতি হুসেনের স্ত্রী হুসনেবানু ছিলেন ইরাণের সুলতান তৃতীয় য়জদগির্দের (৬৩৪-৬৪২ খৃঃ) কন্যা। এই ব্যাপারে বনী-উমাইয়া বংশ ছিল আরও উদার। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যে সকল খলিফাকে আজও আরবীরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাঁদের ধমনীতেও অনারবীয় রক্তই বেশী। অতএব আরও কত দেশের কত প্রভাবে যে এঁরা পুষ্ট তা সহজেই অনুমেয়।

(১) **অনুবাদ কার্য** —উপরোক্ত কারণেই বাগদাদের খলিফাগণকে তাঁদের পূর্বসূরী খলিফাগণের বিচার সম্বন্ধে ঔদার্য প্রদর্শন করতে হয়েছিল। (বাগদাদ একটি পারসী নাম, যার সংস্কৃত রূপ হলো ভগ [বদ্‌] দত্ত অর্থাৎ ভগবানের দান)। এঁদের রাজত্বে বুখারা, সমরখন্দ, বল্‌খ্‌, রে, নৈ-শাপোর, বাগদাদ, কুফা, দামাস্কাস প্রভৃতি স্থানে বড় বড় বিদ্যাপীঠ স্থাপন করা হয়। প্রথমদিকে যদিও এই সব বিদ্যাপীঠে কোরাণ ও ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হতো, কিন্তু পরে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। আরবের মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খৃঃ), হারুন (৭৮৬-৮০৯ খৃঃ) এবং মামুন (৮১১-৮৩৩ খৃঃ) ছিলেন ভারতের শালিবাহন বা বিক্রমাদিত্যের তুল্য, যাঁদের দরবারে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের বড়ই সমাদর ছিল। এঁরা স্বয়ং বিদ্বান হওয়ায় দেশে শিক্ষাব্যবস্থা শুধু কোরাণ, বাণিজ্য প্রভৃতির গতানুগতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ

রাখেননি, তাঁরা গ্রীক দর্শন, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রকেও শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নিয়েছিলেন। এই প্রকার আব্বাসী খলিফা বংশে যদি আরবের সরল বদ্দু সভ্যতা কিছু রয়ে গিয়ে থাকে তবে তা ছিল আরবী ভাষা, যা ছিল তৎকালীন সমগ্র ইসলাম রাজত্বের রাজকীয় তথা সাংস্কৃতিক ভাষা।

প্রথম য়াজীদের (৬৮০-৭১৭ খৃঃ) পুত্র খালিদের (মৃত্যু ৭০৪ খৃঃ) রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। কথিত আছে যে তিনি প্রথমে একজন খৃষ্টান সাধুকে দিয়ে একটি রসায়ন গ্রন্থ গ্রীক থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। মনসুরের শাসনকালে চিকিৎসাশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যার গ্রন্থ সিরিয়ান বা পহ্লবী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সেই সময়ের অনুবাদ কর্মে ইবনে-আল-মুকফ্‌ফা-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইরাণী জাতি ও ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুকফ্‌ফা কিছু গ্রীক দর্শন-গ্রন্থেরও অনুবাদ করেছিলেন বটে, তবে অধিকাংশ আরবী অনুবাদকের মতো তিনিও যুগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কালোত্তীর্ণ হতে পারেননি। কিন্তু তিনিই যে প্রথম দার্শনিক বিচার ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে একটা বড় কীর্তি রেখে গেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হারুন ও মামুনের সময়কার অনুবাদকদের মধ্যে কিছু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ কর্মে সাহায্য করেছিলেন। তৎকালীন কিছু দর্শন গ্রন্থের অনুবাদক ও তাঁদের অনূদিত গ্রন্থের নাম নিচে দেওয়া হলো।

অনুবাদক	কাল	অনূদিত গ্রন্থ	মূল গ্রন্থকার
যোহন (যোহন্না বিন্‌-বিতরিক)	নবম শতক	তেমাউস	প্লেটো
”	”	প্রাণীশাস্ত্র	অ্যারিস্টটল্
”	”	মনোবিজ্ঞান	”
”	”	যুক্তিবিদ্যার অংশ	”
আব্দুল্লা নাইমলহিম্‌সি	৬৩৫ খৃঃ	‘সোফিস্টিক’	প্লেটো
”	৮৩৫ খৃঃ	অ্যারিস্টটলের পদার্থ-বিদ্যার টীকা	ফিলোপেনাস
কস্তা ইবনে লুকা অলবলবক্কী	”	”	”
”	”	”	আলেকজাণ্ডার আফ্রাদিসিয়াস

মামুনের পরেও অনুবাদের কাজ চলছিল। ঐ সময়ের প্রসিদ্ধ অনুবাদকগণের মধ্যে —হোনেন ইবনে-ইস্থাক (৯১০ খৃঃ), হোবৈশ ইবনে-উল-হাসান, আবুবিশ্র

মত্তা ইবনে-ইউনুস আল-কান্নাই (৯৪০ খৃঃ), আবু জক্রিয়া ইবনে-আদী-মন্তিকী (৯৭৪ খৃঃ), আবু-আলী ইসাজুরা (১০০৮ খৃঃ) এবং আবুল-খৈর আল-হাসান খম্মার (জন্ম ৯৪২ খৃঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(২) সমকালীন বৌদ্ধ তিব্বতী অনুবাদ—অনুবাদের দ্বারা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ তথা জাতিকে সুশিক্ষিত করতে প্রত্যেক উন্নয়নশীল সভ্য এমনকি অসভ্য জাতিকেও দেখা যায়। এই কারণেই খৃষ্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত চীনদেশ এক হাজার ভারতীয় গ্রন্থের চীনাভাষায় অনুবাদ করার এক বিরাট আয়োজন করে এবং প্রচণ্ড পরিশ্রমে সফল হয়। তিব্বতীরাও আরবী বদ্দুদের মতো খানাবদোশ, অক্ষরজ্ঞানহীন, সাংস্কৃতিক চেতনাশূন্য এক অসভ্য জাতি ছিল। সেই সময়ে তারা স্রোঙচেন-স্গেম-পো-এর মতো নেতার নেতৃত্বে সমগ্র হিমালয়, মধ্য এশিয়া তথা চীনের পশ্চিমে তিনটি দেশ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। আর একবার তো তিব্বতী অশ্ব গঙ্গা-গণ্ডকের সঙ্গমস্থলের জল পর্যন্ত পান করেছিল। আরবীদের মতো তিব্বতীরাও একটা বিস্তৃত রাজ্য স্থাপনের পর কবীলা-শাহী পন্থা ত্যাগ করে সামন্তশাহী রীতি, কৃষ্টি শিক্ষা করেছিল যার মধ্যে রাজনীতি শিক্ষা চীন থেকে নেওয়া। পয়গম্বর মুহম্মদের মতো ধর্ম-ভাবুক না হয়েও স্রোঙচেন-স্গেম-পো চীন, ভারত, মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁকে তাদের জাতীয় কৃষ্টি, শিল্প, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই দান করেছিল. কিন্তু সেই সঙ্গে তার দুঃখবাদ তথা আদর্শবাদী অহিংসবাদ এত গভীরভাবে তাঁর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছিল যে স্রোঙচেন-স্গেম-পো'র বংশের (৬৩০-৯০২ খৃঃ) সঙ্গেই তিব্বতী জাতির জীবন-স্রোত শুকিয়ে গিয়েছিল। তিব্বত ও আরব একই সঙ্গে দিগ্বিজয় আরম্ভ করেছিল, একই সঙ্গে বিজিত জাতির সভ্যতাকে শিক্ষার অঙ্গ করে নিয়েছিল। যদিও অতিরিক্ত শীতপ্রধান হওয়ার ফলে তিব্বত বেশী দূর যেতে পারেনি, তবু পশ্চিমে কাশ্মীর (বল্‌তিস্তান), লাদাক, লাহুল ও স্পিতি পর্যন্ত, দক্ষিণে হিমালয়ের বহু অংশ, ভুটান ও বর্মায় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল! আরব ও তিব্বতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য হলো—আরবের মনসুর, হারুন এবং মামুনের যুগ (৭৫৪-৯৩৩ খৃঃ) ও তিব্বতের টি-দে-চুগ্‌-তন্, ঠি-স্রোঙ-দে-চন এবং ঠি-দে-চন্-এর যুগ (৭৪০-৮৭৭ খৃঃ) প্রায় সমসাময়িক। একই সময়ে উভয় দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে আরবের মতো তিব্বতও সহস্রাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ নিজস্ব ভাষায় করিয়েছিল। এগুলি প্রায় সবই আজও সুরক্ষিত আছে। এই দুই জাতি পরস্পরের নিকট অপরিচিতও ছিল না। পূর্বদিকে মধ্য এশিয়া তথা গিলগিতের (বর্তমান সিন্-ক্যাং) কাছেই ছিল উভয় রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকা। ফলে দুই রাজশক্তির মধ্যে মিত্রতা ও সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল; যদিও এর ফলে সীমান্তবর্তী জাতি—বিশেষত তাজি-দের খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল।

(৩) আরবী অনুবাদ—যদি আমরা ধর্মের ভিত্তিতে অনুবাদকগণের বিচার করি তবে তিব্বতী ও আরবী অনুবাদকগণের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান দেখতে পাব। তিব্বতী অনুবাদকগণ ভারতীয়ই হন বা তিব্বতী হন সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। এ রকম হওয়া প্রয়োজনও ছিল, কেন না বৈদ্যক, ছন্দ, কাব্য ছাড়া যে সকল গ্রন্থের অনুবাদ তাঁরা করেছিলেন তা ছিল সবই বৌদ্ধ ধর্ম এবং দর্শনের ওপর। তিব্বতী অনুবাদের শুদ্ধতার উদাহরণ তার ভাষার মধ্যে পাওয়া দুঃসাধ্য। এখানে আমি কয়েকজন আরবী অনুবাদকের নাম দিলাম যাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন ইহুদী; খৃষ্টান কিংবা সাবী ধর্মাবলম্বী।

জর্জ বিন-জিব্রীল	খৃষ্টান বিন-ইউনুস	ইব্রাহিম হারানী
কস্তা বিন-লুকা	সাবিত বিন-কর	ইয়াকুব বিন-ইস্‌সাহ কিন্দী (মুসলিম)
মা সার্জিয়াস	জোরিয়া হাম্‌সি	হনান ইবনে-ইস্‌সাক (মুসলিম)
খৃষ্টান বিন-সার্জিয়াস	ফীসোন সার্জিস	আয়ুব রহাবী
হুজ্জাজ বিন-মত্রো	বসিল মতরান	ইউসুফ তাবিব
কজ্জা রাহাবী	হৈরান	আবু ইউসুফ-যোহন্না
অব্দ যশুআ বিন-বহেজ	তদরস	বিতরিক
শের যশুআ বিন-কত্রব	সনান বিন-সাবিত	যহ্মা বিন-বিতরিক
সাদরি আস্কফ		

অ-মুসলিম অনুবাদকগণ কখনই ধর্মান্তরিত হতে চাননি। তাঁদের পৃষ্ঠপোষক শাসকগণ এ ব্যাপারে কি নীতি নিয়েছিলেন তার জলন্ত উদাহরণ ইবনে-জিব্রীল। খলিফা মনসুর জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি কেন মুসলিম ধর্ম নাও না?" জিব্রীল উত্তর দেন—"আমার পিতৃপুরুষের ধর্মে স্থির থেকেই মরতে চাই। স্বর্গ-নরক যেখানেই তাঁরা থাকুন না কেন আমি সেখানেই তাঁদের সঙ্গে থাকতে চাই।" খলিফা নিজের ভুল বুঝতে পেরে জিব্রীলকে পুরস্কৃত করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

দর্শনের প্রভাব এবং ইসলামের মধ্যে মতভেদ

§ ১. ইসলামে মতভেদ

কোরাণের ভাষায় শব্দালঙ্কার, উপমার প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তা এতই সরল ও সাধারণ যে একজন নিরক্ষর বদদু এবং সাধারণ আরবী ভাষাভাষী ব্যক্তির পক্ষেও রসগ্রহণে অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ এর ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য। পয়গম্বরের প্রভাব যতদিন আরবের বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে অপ্রতিহত ছিল ততদিন সব ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু ইসলামী জগৎ যখন বহির্দুনিয়ায় বিস্তৃত হলো এবং সেখানে এর বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হলো তখন ইসলামের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিলো।

১. ফিকা বা ধর্ম মীমাংসকগণের বিশ্বাস ও উদ্যম

কোরাণ এবং পয়গম্বরের বাণী প্রত্যেক প্রশ্নের সমাধান করতে যথেষ্ট ছিল। তাঁর দেহান্তের পর তাঁর সদাচারকে প্রমাণ বলে মানাও হচ্ছিল। যদিও পয়গম্বরের বাণী ও স্মৃতিসমূহ (হদিস) সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তবুও তাঁর মৃত্যুর পর এক শতাব্দী যেতে না যেতেই বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং বুদ্ধি, যুক্তি ও শব্দ, ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। আমাদের মীমাংসকগণের মতোই ইসলামী মীমাংসকগণের বিশেষত ফিকাকারী (মন্তব্যকারী) ফকিরগণেরও বিশ্বাস ছিল যে কোরাণ স্বতঃপ্রমাণিত, এর পরেই পয়গম্বর-বাণী তথা সদাচার প্রমাণ হয়। মীমাংসকগণের তিন রকম কর্ম : (১) নিত্য —যা না করলে পাপ হয় সেই অবশ্য কর্ম ; (২) নৈমিত্তিক —পাপাদি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ; (৩) কাম্য —কামনা পূরণের জন্য কর্ম, যা না করলেও চলে ; —এর মতো ফিকাগণও নিম্নে উল্লিখিত রূপে কর্মকে ভাগ করেছিলেন—

(১) নিত্য বা অবশ্যকরণীয়, যা না করলে পাপ হয়, যেমন নমাজ-পাঠ ;

(২) ধর্মের দ্বারা বিহিত নৈমিত্তিক কর্ম, যা করলে পুণ্য হয়, কিন্তু না করলে পাপ হয় না ;

(৩) অনুমোদিত কর্ম, এর ওপরে ধর্মের বিধিনিষেধ খুব বেশী নেই ;

(৪) অসম্মত কর্ম, যাতে ধর্মের সম্মতি না থাকলেও এর কর্মীকে দণ্ডনীয় মনে করা হয় না ;

(৫) নিষিদ্ধ কর্ম, যে কাজে ধর্মের বারণ আছে এবং কর্মকর্তাকে দণ্ড দেওয়া চলবে ;

ফিকার আচার্যগণের মধ্যে চারজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন—

১. ইমাম আবু-হানিফা (৭৬৭ খৃঃ) ছিলেন কুফার অধিবাসী। তাঁর শিষ্যগণ হানফি নামে পরিচিত। ভারতেও এঁর খুব আধিপত্য ছিল।

২. ইমাম মালিক (৭১৫—৭৯৫ খৃঃ) ছিলেন মদিনা নিবাসী। তাঁর শিষ্যদের বলা হয় মালিকী। স্পেন ও মরক্কোর মুসলমানগণ সকলেই প্রথমে মালিকী ছিলেন। ইমাম মালিক ধর্মনির্ণয়ে পয়গম্বর-বচনকে অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, যার ফলে বিদ্বানগণ বাণীগুলি (হদিস) জমা করতে শুরু করেন এবং তাঁদের একটি প্রভাবশালী সংগ্রহশালা তৈরী হয়।

৩. ইমাম শাফই (৭৬৭—৮২০ খৃঃ) শাফই নামক তৃতীয় ফিকা-সম্প্রদায়ের সমর্থন করেছেন। ইনি সদাচারের ওপর বেশী জোর দিয়েছিলেন।

৪. ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল হাম্বালিয়া নামক তৃতীয় ফিকা সম্প্রদায়ের সমর্থক। ইনি ঈশ্বরকে সাকার বলে বিশ্বাস করতেন।

হানফি এবং সাফাই উভয় মতেই উদাহরণ দ্বারা সমাধানে পৌছানো যায়। এটা স্পষ্ট যে ইমাম হানিফাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কুফার বুদ্ধি-জগৎ প্রচুর উৎসাহ দান করেছিল। এ ক্ষেত্রে শাফই হানিফির মতবাদ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন।

কোরাণ, সুন্নত (=সদাচার), এবং কয়াস (=দৃষ্টান্ত) ব্যতীত হজ্জা (=বহুমত) নামে চতুর্থ এক মতবাদকেও মানা হতো। এতে পূর্বাপর প্রমাণ-গুলি শক্তিশালী মনে করা হয়েছে।

২. মতভেদ সমূহের (ফিত্নো) প্রারম্ভ

(১) হলুল—মুশ্লিম ঐতিহাসিকগণ ইসলামের প্রথমদিকের মতভেদকে সপ্তম শতাব্দীতে জাত ইবনে-সবার (সবা-পুত্র) নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ইবনে-সবার ইহুদী থেকে মুসলমান হয়েছিলেন। এবং বিরোধীগণের সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় পয়গম্বরের জামাতা হজরত আলীর প্রতি খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। ইনি হলুল নামে একটি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন, যার অর্থ হলো :—জীবমাত্রই আল্লার মধ্যে বিলীন হয়।

প্রাচীন শিয়া —ইবনে-সবার পরে শিয়া এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

কিন্তু তখন পর্যন্ত এই মতভেদসমূহ দার্শনিক বিচারে নয় বরং কোরাণ ও পয়গম্বরের সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের ওপরেই বেশী নির্ভরশীল ছিল। শিয়াগণের বক্তব্য হলো, পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবি শুধু তাঁর কন্যা ফতেমা ও জামাতা আলীর সন্তানগণের। এই শিয়াগণ দার্শনিক মতভেদেরও সদ্ব্যবহার করেছেন এমনকি মোতজলা তথা সুফী সম্প্রদায়ের মতবাদ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং শেষে আরব-ইরাণের দ্বন্দ্ব থেকেও ফায়দা তুলতে এত সাফল্য অর্জন করেছিলেন যে পঞ্চদশ শতকে যখন ইরাণে সফাবী বংশের (১৪৯৯-১৭৩৬ খৃঃ) রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তাঁরাও শিয়ার মতবাদকেই রাজধর্ম বলে ঘোষণা করেন।

(২) কর্মে জীবের স্বাধীনতা —পয়গম্বরের সহকারীগণের মধ্যে একজন ছিলেন আবু-ইউনুস ইরাণী। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো —যদিও কর্মে জীবের স্বাতন্ত্র্য (স্বাধীনতা) আছে তবু জীব যদি তার কর্মে স্বতন্ত্র না হয় তবুও সে দণ্ডনীয় নয়। বনী-উমাইয়ার শাসনকালে এই সিদ্ধান্তই রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল। মাবদ বিন-খালিক জাহানী কর্ম-স্বাতন্ত্র্যের প্রচার দ্বারা মানুষকে শাসকগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করেন। আবার এর বিরুদ্ধে অন্যদিকে শাসক বনী-উমাইয়া কর্ম-পারতন্ত্র্যের সিদ্ধান্তকে ইসলামসম্মত বলে প্রচার শুরু করেন।

(৩) ঈশ্বর নির্গুণ (বিশেষণ রহিত) —জহাম বিন-সফবান বলেছিলেন যে আল্লা সমস্ত রকম গুণ বা বিশেষ-শূন্য। যদি তাঁর কোনো গুণ মানা হয় তবে তাঁর সঙ্গে অন্য বস্তুর অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হবে। যদি তাঁকে জ্ঞাতা (জ্ঞান গুণবিশিষ্ট) বলে মনে করা হয় তবে সেই বস্তুর চিরন্তনতাকেও মানতে হবে যার জ্ঞান ঈশ্বরের আছে। অতঃপর এ রকম অবস্থায় ইসলামের ঈশ্বর-অদ্বৈতবাদ টেকে না। অতএব আল্লা কর্তা, জ্ঞাতা, শ্রোতা, স্রষ্টা বা দণ্ডদাতা ···কিছুই নন। এই ধারণার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষ চিন্মাত্রের (বিশেষণহীন চেতনাই একমাত্র তত্ত্ব) কতটা সাদৃশ্য আছে সেই তুলনামূলক আলোচনা পরে করা যাবে। অবশ্য তখনও শঙ্করের (৭৮৮-৮২০ খৃঃ) জন্ম হয়নি ; তবে সেই সময়ও নব্য-প্লেটোনিক মতবাদ এবং বৌদ্ধের ভাববাদ প্রচলিত ছিল।

(৪) অন্তস্তমবাদ বা আন্তরিকতাবাদ (বাতিনী)— ইরাণীগণের (আজমি)আর একটি সিদ্ধান্ত অনুসারে কোরাণের বাণীসমূহের দু'রকম অর্থ —এক হলো বাহ্যিক (জাহিরী), দ্বিতীয়টি হলো অন্তস্তম বা আন্তরিক (বাতিনী)। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোরাণের প্রতিটি বাণীর অর্থকেই শব্দ থেকে পৃথক করা সম্ভব এবং এইভাবে সমগ্র ইসলামিক পরম্পরাকেই উল্টে দেওয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত যাঁরা মানেন তাঁদের জিন্দীক বলা হয় —তাঁরা, তালিমিয়া (শিক্ষার্থী), মূলহিদ, বাতিনী, ইসমাইলী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। আগাখানী মুসলমানগণও এই মতবাদে বিশ্বাসী।

§ ২. ইসলামের দার্শনিক সম্প্রদায়

আফগানিস্তানে সরল মানুষের ইসলামের ওপর একটা সহজ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক-প্রগতি এর মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে। মেসোপোটেমিয়ার বসরার মতো নগর ছিল এই ধরনের মতভেদের জন্য উপযুক্ত স্থান, তা পরবর্তী অংশের পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারবেন।

১. মোতজলা সম্প্রদায়

মোতজলীগণের জন্ম ও কর্মভূমি ছিল বসরা। মোতজলা ইসলামের প্রথম সম্প্রদায় যাদের সিদ্ধান্তগুলিতে দর্শনের প্রভাব দেখা গেছে। এই সিদ্ধান্তগুলি হলো—

(১) **জীব কর্মে স্বতন্ত্র** —জীবের পরতন্ত্রতা মেনে নেওয়ার পর তার মন্দ কর্মের জন্য দণ্ড দেওয়া অন্যায়, তাই আবু-ইউনুসের মতো মোতজলীগণও বলেছেন জীবের কর্মে স্বাতন্ত্র্য আছে।

(২) **ঈশ্বর শুভের স্রোত** —ইসলামের সরল বিশ্বাস হলো ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং অদ্বিতীয়, তাঁর ওপরে আর কোনো শক্তি নেই। মোতজলীগণের তর্কপ্রণালী এই প্রকার —জগতে শুভ-অশুভ উভয়কেই আমরা দেখি, কিন্তু এই অশুভের স্রোত কখনই ঈশ্বর নন, কেন না, তিনি কেবল শুভের স্রোত (শিব); তাই তিনি মানুষকে নরকাদি যন্ত্রণা দিতে পারেন না।

(৩) **ঈশ্বর নির্গুণ** —জহাম বিন-সফবানের ন্যায় মোতজলা মতবাদেও ঈশ্বরকে নির্গুণ বলে মনে করা হয়। দয়াদি গুণযুক্ত ঈশ্বরের অতিরিক্ত সেই বস্তুসমূহের সনাতন অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হবে যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর গুণ প্রদর্শিত করেন, যার অর্থ হবে ঈশ্বর ব্যতীত আরও কিছু সনাতন পদার্থ আছে।

(৪) **ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা সীমিত** —ইসলামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর অসীম ক্ষমতার অধিকারী। মোতজলীগণের প্রশ্ন —ঈশ্বর অন্যায় করতে সক্ষম কি-না ? যদি তার উত্তর হয় 'না' তবে তার অর্থ দাঁড়ায় যে অন্যায় করার মতো বিস্তৃত ক্ষমতা তাঁর নেই। প্রাচীন মোতজলীগণের মতে ঈশ্বরের ঐরূপ কর্মে সামর্থ্য থাকলেও শিব বা কল্যাণরূপী হওয়ার কারণে তিনি কোনো অশুভ কাজ করেন না। কিন্তু পরবর্তী যুগের মোতজলীরা ঈশ্বরের এরূপ শক্তির অভাব আছে বলেই মনে করেন।

(৫) **ঈশ্বরীয় অলৌকিকতা ভুল** —অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামে —এবং

কোরাণেও —ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের ইচ্ছানুযায়ী অলৌকিক ঘটনাসমূহকে মানা হয়েছে। মোতজলী চিন্তাবিদ্‌গণ বলেছেন —প্রতিটি পদার্থেরই একটা অপরিবর্তনীয় স্বাভাবিক গুণ থাকে ; যেমন অগ্নির উষ্ণতা তথা দাহ্যগুণ। পয়গম্বরের জীবনের যে সমস্ত ঘটনাকে আমরা অপ্রাকৃত মনে করি তার অন্য কোনো অর্থও তো থাকতে পারে অথবা তা এমন কোনো প্রাকৃতিক নিয়মে হয়ত ঘটেছিল যা আমরা জ্ঞাত নই বলেই অপ্রাকৃতিক ঘটনা বলে মনে করি।

(৬) জগৎ অনাদি নয় —অন্যান্য মুসলমানদের মতো মোতজলাপন্থীগণও জগৎকে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং অভাব থেকে ভাবের উদয়ে বিশ্বাসী ছিলেন ; অতএব তাঁরা অ্যারিস্টটলের জগৎ-অনাদি তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন।

(৭) কোরাণও অনাদি নয় —মোতজলীগণের এই 'জগৎ-সাদি' (জগতের আরম্ভ বা আদি আছে) তত্ত্বে সনাতনপন্থী মুসলমানরা খুশী হতে পারেননি। কারণ জগৎ ও কোরাণকে তাঁরা ঈশ্বরসৃষ্ট অতএব সেগুলির আদি আছে (সাদি) বলে মনে করেছেন ; এবং এইভাবেই মোতজলীগণ বলেছেন —আল্লার ন্যায় কোরাণকে অনাদি বলে মানা এবং দ্বৈতবাদ তথা মূর্তিপূজা একই রকম দুষ্কর্ম। আমি আগেই বলেছি যে জাহানী কর্ম-স্বাতন্ত্র্যের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বনী উমাইয়ার খিলাফতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। অতএব বনী উমাইয়া-শাসনকে পরাজিত করে যখন আব্বাসীয় খিলাফতি শুরু হলো তখন তাঁদের সমর্থন যে কর্ম-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের তথা তাঁদের উত্তরাধিকারী —মোতজলীদের ওপর পড়বে তাতে সন্দেহ কি ? বাগদাদের মোতজলী খলিফা কোরাণের অনাদি হওয়ার সিদ্ধান্তকে নাস্তিকতা বলে মনে করতেন এবং তার জন্য মানুষকে রাজদণ্ড দিতে দ্বিধা করেননি। মোতজলীগণের কোরাণকে 'সাদি' বলার উদ্দেশ্য আল্লার প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন নয় বরং কোরাণও যে একটা অনিত্য গ্রন্থ এবং তাই তার ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা আছে এই কথা বোঝানোই ছিল তাঁদের মূল অভিপ্রায়। এইভাবে পুস্তক অপেক্ষা বুদ্ধির মাহাত্ম্যকেই প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব। তাঁদের মতে ঈশ্বর যখন জগৎ, প্রাণী তথা মনুষ্য সৃষ্টি করেছেন তখন একই সঙ্গে মানুষকে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা যাচাই করা এবং ঈশ্বরকে অনুভব করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি-মেধাও দিয়েছেন। এইভাবে মোতজলীগণ গ্রন্থোক্ত ধর্ম অপেক্ষা প্রকৃতি (বুদ্ধি) সিদ্ধ ধর্মের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। এই তত্ত্ব এতই গুরুতর ছিল যে সনাতনী মুসলমান মোতজলীদের ক্ষমা করতে পারেননি ; বস্তুত, আজও তাঁদের ভাষায় কাফের মোতজলী তথা দহরিয়া (নাস্তিক, জড়বাদী) প্রভৃতি হচ্ছে শ্লেষাত্মক শব্দ।

(৮) ইসলামিক বাদ-শাস্ত্রের (তর্ক-শাস্ত্রের) প্রবর্তক —যদিও মোতজলীগণ গ্রন্থবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না তবু গ্রন্থকে অপ্রামাণিক বলেও চালাতে চাননি। তাঁরা ভালোভাবেই অনুভব করেছিলেন যে, এই জগতে

আরবীগণের তন্ময় শ্রদ্ধা দিয়েই শুধু কাজ চলবে না। তাই তাঁরা গ্রন্থ ও বুদ্ধিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো এই যে, তাঁরা কিছু প্রাচীন বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে বাধ্য হলেন ও কোরাণের ব্যাখ্যার মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য আরোপেরও প্রয়োজন হলো। এই সমন্বয় সাধনের জন্য তাঁদের ইসলামী বাদ-শাস্ত্র (ইল্‌ম-কালাম)-কে সমর্থন করতে হয়েছিল। বৌদ্ধিক নবজাগরণের সময়ে বাগদাদের খলিফাগণের নিকট যা ভালো মনে হয়েছিল পরবর্তীকালে অশ্‌অরী, গাজ্জালীর মতো 'প্রাচীনবাদী' আধুনিকগণের দৃষ্টিতে তাই মন্দ বলে প্রতিভাত হয়েছিল।

মোতজলীদের ইসলামের প্রতি সদিচ্ছার ব্যাপারে তো সন্দেহ না করার এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে তাঁরা গ্রীক দর্শন তথা অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিত্তার কঠোর বিরোধী ছিলেন, তবে এই কাজে তাঁরা বুদ্ধিকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন যার ফলে তাঁদের কয়েকবারই ইসলামের 'সোজা-রাস্তা' থেকে ভ্রষ্ট হতে হয়েছিল।

(৯) মোতজলী আচার্য—অন্য কোনো ভাষার পুস্তককে আরবী ভাষায় অনুবাদের জন্য হারুণ-মামুনের শাসনকাল (৭৮৬-৮৩৩ খৃঃ) ছিল স্বর্ণযুগ। এই অনুবাদের ফলে বুদ্ধি-জগতে যে নবজাগরণ হয় এবং তার ফলে ইসলামের প্রতি মানুষের যে সন্দেহ হতে থাকে, তারই সঙ্গে লড়াই করার জন্য মোতজলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মোতজলার পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে যে বিদ্বানগণ এই সংগ্রামকে পরিচালিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ও পরিচয় নিচে দিলাম—

(ক) আল্লাফ আবুল হুজৈল আল-আল্লাফ—ইনি মোতজলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর দেহান্ত ঘটে, এই হিসেবে তিনি ছিলেন শঙ্করাচার্যের সমসাময়িক। শঙ্করের মতো আল্লাফও একজন শক্তিশালী তার্কিক ছিলেন এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দর্শনকে ব্যবহার করেছিলেন। ঈশ্বর-অদ্বৈতকে নির্গুণ সিদ্ধ করতে তিনি যে যুক্তি দেখান তা শঙ্করের 'নির্বিশেষ চিন্মাত্র' তত্ত্বের সদৃশ। আল্লার (ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের) মধ্যে কোনো গুণ (=বিশেষণ) থাকতে পারে না ; কেন না, গুণ দুই ভাবে থাকতে পারে, হয় তিনি গুণী থেকে বিচ্ছিন্ন, নয়ত গুণী-স্বরূপ। গুণীবিচ্ছিন্ন মানলে তিনি অদ্বৈত নন, আবার অদ্বৈত মানলে নির্গুণ ঈশ্বর তথা গুণ-স্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে শব্দেরই ব্যবধান হবে। আল্লাফ মনুষ্যের কর্মকে দুই প্রকার বলে মনে করেছেন—এক হলো, প্রাকৃতিক কর্ম অর্থাৎ কায়িক বা ইন্দ্রিয়গত, দ্বিতীয়ত, আচার (পাপ-পুণ্য) সম্বন্ধী বা হার্দিক কর্ম। যে কর্ম আমরা বিনা বাধায় সম্পন্ন করতে পারি তাই-ই আচার-সম্বন্ধী। আচার-সম্বন্ধী কর্ম মনুষ্যের অর্জিত সম্পদ, তার প্রযত্নের ফল। ভগবান ও ভগবদ্বাণী (কোরাণাদি) এবং কিছু নৈসর্গিক (প্রকৃতি) প্রকাশ থেকে মানুষ জ্ঞানার্জন করে। ভগবদ্বাণীকে জানার আগেও কখনো কখনো প্রাকৃতিক চেতনা দ্বারা মানুষ কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে, যা পরে ঈশ্বর-সম্বন্ধী জ্ঞান দান

করে ; ভালো-মন্দ জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি থেকে জন্মে, এবং সদাচারী, সৎ ও নিষ্কাম জীবন-যাপন করতে সক্ষম হয়।

(খ) নজ্জাম—নজ্জাম সম্ভবত আল্লাফের সহচর ছিলেন। ৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কিছু লোকের ধারণা ছিল তিনি উন্মাদ, কারও বা ধারণা ছিল তিনি নাস্তিক। নজ্জামের মতে ঈশ্বর মন্দ কর্ম করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ভগবান তাঁর জ্ঞানানুযায়ী যে কাজ তাঁর ভক্তদের জন্য ভালো বলে মনে করেন তাই শুধু করতে পারেন। বস্তুত যেটুকু তিনি করেন সেইটুকুই মাত্র তাঁর সর্বশক্তিমত্তার সীমা। যার কোনো বস্তুর প্রয়োজন থাকে তারই ইচ্ছা থাকে, অতএব ইচ্ছাশক্তি ভগবানের গুণ হতে পারে না। ভগবান একবারই সৃষ্টি করেন ; প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে তিনি সেই শক্তিই নিহিত করেন যার দ্বারা ভবিষ্যতেও তাঁর নির্মাণক্রম কার্যকরী থাকবে। নজ্জাম পরমাণুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। পিণ্ড পরমাণু থেকে নয়, ঘটনা থেকে সৃষ্ট—তাঁর এই ধারণার মধ্যেই আধুনিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রূপ, রস, গন্ধের মতো গুণাবলীকেও নজ্জাম পিণ্ড (পদার্থ) বলে মনে করতেন, কারণ গুণ কখনও গুণীথেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের আত্মা ও বুদ্ধিও এক প্রকার পিণ্ড। সমস্ত দেহের মধ্যে ব্যাপ্ত আত্মা হলো মানুষের অতি শ্রেষ্ঠ অংশ। শরীর তার সাধন। কল্পনা ও চিন্তন আত্মারই গতি-স্বরূপ। ভাগ্য ও ধর্মের মধ্যে কাকে প্রমাণ বলে মানা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে নজ্জামের কথা শিয়াদের তুল্য—ফিকার জটিল তত্ত্বের দ্বারা এর মীমাংসা সম্ভব নয়, তার জন্য যথার্থবাক্যই একমাত্র প্রমাণ হতে পারে। মুসলমানের বহুমতকে তিনি প্রমাণ বলে মানেননি। তাঁর কথা হলো—সকল সম্প্রদায়েরই কিছু ভুল ধারণা থাকতে পারে, যেমন তাঁদের একটা ধারণা হলো অন্যান্য পয়গম্বর অপেক্ষা মুহম্মদের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল, তা হলো তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত ; কিন্তু এখানে তো এটাই ভুল যে মাত্র একজনকে আল্লা প্রেরণ করেছেন ; পয়গম্বর শব্দটির অর্থানুযায়ী তো সকল পয়গম্বরকেই ঈশ্বর প্রেরিত বলে ধরে নিতে হবে।

(গ) জাহিজ (৮৬৯ খৃঃ)—নজ্জামের শিষ্য জাহিজ একজন সিদ্ধহস্ত লেখক এবং গম্ভীরচেতা দার্শনিক ছিলেন। তিনি মনে করতেন সত্য নির্ণয়ের জন্য ধর্ম এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সমন্বয় সাধন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যেই প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে, আর সেই কাজের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। মানববুদ্ধিই জ্ঞানের স্রষ্টা।

(ঘ) মুআম্মর—আনুমানিক ৯০০ খৃষ্টাব্দের মোতজলী আচার্য। তিনি তাঁর পূর্বসূরীগণ অপেক্ষাও অধিক 'নির্গুণবাদী'। ঈশ্বর সর্বপ্রকার দ্বৈত থেকে সর্বদাই মুক্ত অতএব তাঁর মধ্যে কোনো গুণ-বিশেষণের সম্ভাবনা নেই। ঈশ্বর নিজেকে বা অন্য কোনো বস্তু অথবা গুণকে জানেন না, কারণ জ্ঞান স্বীকার করার 'পর জ্ঞাতা জ্ঞেয় ইত্যাদি নানা অসংখ্য দ্বৈত এসে হাজির হবে, মুআম্মরের মতে গতি-স্থিতি

সাম্য-অসাম্য সমস্তই কাল্পনিক ধারণা, এদের কোনো বাস্তবিক সত্তা নেই। মানুষের ইচ্ছা বন্ধনহীন। ইচ্ছাই মানুষের একমাত্র ক্রিয়া। বাকি ক্রিয়াসমূহ কেবল শারীর-সম্বন্ধী।

(৬) **আবু-হাসিম বস্রী** (৯৩৩ খৃঃ)—এঁর মতে ঈশ্বরের গুণ, ঘটনাবলী, জাতি (=সামান্য) জ্ঞান যুক্ত কিছু স্থিতি সত্তা ও অ-সত্তার মধ্যে অবস্থান করে। সমস্ত জ্ঞানের মধ্যেই সন্দেহের উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন।

২. করামী সম্প্রদায়

মোতজলীগণের কোরাণের ব্যাখ্যাকে শ্রদ্ধাশীল মুসলমানগণ অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মোতজলীগণের বিরুদ্ধে যাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে করামী সম্প্রদায়ও ছিলেন। এর প্রবর্তক মুহম্মদ বিন-করাম ছিলেন সীস্তান (=ইরাণ)-এর বাসিন্দা। মোতজলীগণ ঈশ্বরকে সাকার তো দূরের কথা সগুণ বলে মানতেও রাজী হননি, ইবনে-করাম কিন্তু তাঁকে একজন মনুষ্য—রাজা-তুল্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। ইবনে তৈমিয়ার মতো তিনিও তর্ক করেছেন—যে বস্তু নিরাকার তা অস্তিত্বহীন।

৩. অশ্‌অরী সম্প্রদায়

যে সময়ে মোতজলী এবং করামী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরের নির্গুণবাদ ও সাকারবাদ নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল, সেই সময়েই এক মোতজলী পরিবারে আবুল-হাসান-অশ্‌অরী জন্মগ্রহণ করেন (৮৭৩-৯৩৫ খৃঃ)। তিনি দেখেছিলেন, যে ধরনের আঘাত থেকে মোতজলীগণ ইসলামকে রক্ষা করতে চাইছেন, তাকে উপেক্ষা করা যায় না, তাই কিছুদূর পর্যন্ত তাঁদের বুদ্ধিমূলক বিচারের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া দরকার; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে নব্য-যুক্তিবাদ ইসলামের নিকট একটা বিপজ্জনক বস্তু। এই ধরনের পারস্পরিক অবহেলা থেকে ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসাদির সৃষ্টি যাতে না হতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার, কিন্তু যুক্তিবাদের উদ্দীপনাকেও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা অনুচিত হবে কারণ তার অর্থ হবে ইসলামের প্রতি শিক্ষিত প্রতিভার তিরস্কার। তাই অশ্‌অরী বলেছেন যে, ঈশ্বর রাজা বা মানুষের মতো সাকার নন। এ ব্যাপারে অশ্‌অরী সম্প্রদায়ের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি হলো এই প্রকার—

(১) **কার্যকারণ নিয়ম (হেতুবাদ)-কে অস্বীকার**—মোতজলা সিদ্ধান্তানুযায়ী, বস্তুর নৈসর্গিক গুণ অপরিবর্তনীয়, অতএব অপ্রাকৃতিক অলৌকিকতা ভুল। দার্শনিকগণের বক্তব্য ছিল যে, কার্যকারণের নিয়ম অটুট, কারণ

ব্যতীত কার্য হয় না। অতএব ঈশ্বরকে কর্তা বলে মানার পরও তার কারণের (=উপাদান-কারণ) প্রয়োজন হবে, নয়ত জগতের উপাদান-কারণ (প্রকৃতি)-কে স্বীকার করার পর ঈশ্বর অদ্বৈত তথা 'জগৎ-সাদি' এই দুটি ইসলামী সিদ্ধান্তই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে। এই সঙ্কট দুটি থেকে বাঁচার জন্য অশ্‌অরীগণ কার্যকারণ নিয়মকে মানতে অস্বীকার করেছেন; কোনো বস্তুই কোনো কারণ থেকে জাত নয়; খোদা কার্যকেও সেইভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করেছেন যেভাবে তিনি কার্যের আগের বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন, একেই আমরা ভুলবশত কারণ বলি। সমস্ত পদার্থই পরমাণুময় এবং প্রতিটি পরমাণুই মুহূর্তনির্ভর। বিভিন্ন ক্ষণের পরমাণুর মধ্যে কোনো চুক্তিবদ্ধ সম্বন্ধ নেই। সকল পরমাণুকেই ভগবান কোনো কারণ ব্যতীতই (=অভাব থেকে) সৃষ্টি করেছেন। অশ্‌অরীর মতে বাষ্প সূর্যকিরণ থেকে সৃষ্টি হয় না, বাষ্প থেকে মেঘ জন্মে না, বায়ু মেঘকে ওড়ায় না, এবং বর্ষার বারিপাতও মেঘের ফল নয়। বরং আল্লা এক একটি বিন্দুকে অভাব থেকে ভাবরূপ দান করেন, কোনো উপাদান-কারণ (=বাষ্প) ছাড়াই সরাসরি মেঘ সৃষ্টি করেন···। অশ্‌অরী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিক্ষণে কার্যকারণ সম্বন্ধহীন সম্পূর্ণ নতুন এক নির্মাণের উদাহরণ হিসেবে লেখককে উপস্থিত করেছেন। ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করেন, তারপর তার ইচ্ছাকে, শেষে তার রচনা প্রতিভার উন্মেষ ঘটান; এরপর তার হাতে গতিদান করে কলমের মধ্যে তা সঞ্চারিত করেন। এই সমস্ত ক্রিয়াকেই ঈশ্বর পৃথক পৃথকভাবে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ ছাড়াই সরাসরি করেন। কার্যকারণ নিয়ম ব্যতীত জ্ঞানও সম্ভব নয়—এর উত্তরে অশ্‌অরী বলেছেন—সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধেই আল্লার জ্ঞান আছে, তিনি বিশ্বকে একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু হিসেবেই দেখেন, জগৎকে শুধু সৃষ্টিই করেন না, মনুষ্য-চিত্তে জগৎ-সম্বন্ধী জ্ঞানও দান করেন।

(২) ভগবৎবাণী কোরাণ (=শব্দ) একমাত্র প্রমাণ—হিন্দু মীমাংসকদের মতো অশ্‌অরী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণও মনে করেন যে স্রেফ শব্দ প্রমাণ দ্বারাই অভ্রান্ত জ্ঞান লাভ সম্ভব। অবশ্য পার্থক্যও আছে, তা হলো—মীমাংসকগণের ন্যায় কোনো অপৌরুষেয় শব্দ প্রমাণকে (=বেদ) না মেনে আল্লার কলাম কোরাণকেই (=ভগবৎবাণী) সর্বোপরি প্রমাণ বলে মেনেছেন। কোরাণের সহায়তা ব্যতীত স্বর্গ, নরক, ফরিস্তাদি বস্তুকে জানা যায় না। ইন্দ্রিয়াদি থেকে হয়ত ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় না, কিন্তু বুদ্ধি আমাদের ভুল রাস্তায় নিয়ে যেতে পারে।

(৩) ঈশ্বর সর্বনিয়ম থেকে মুক্ত—ভগবান সর্বশক্তিমান প্রভু। তিনি কোনো উপাদান-কারণ ছাড়াই সমস্ত জিনিসকে প্রতি মুহূর্তে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দান করেন। এইভাবে বিশ্বের সমস্ত দৃশ্যমান নিয়ম থেকে তিনি মুক্ত। শরহ-মুবাফিক-এ এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে—"আল্লার পক্ষে মানুষকে অপরিসীম,

অসহ্য কষ্ট দেওয়া, নিজের সৃষ্ট প্রজাগণকে ইচ্ছামতো পুরস্কার বা শাস্তিদান—সে তারা অপরাধী হোক বা না হোক, ভক্তদের প্রতি স্বেচ্ছামতো ব্যবহার, প্রভৃতি সব আচরণই ঠিক, সমালোচনার ঊর্ধ্বে। ভক্ত-সেবকগণের অন্তরের ভাবকে বোঝার কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই। আল্লার পরিচয় কোরাণ থেকেই পাওয়া সম্ভব, বুদ্ধি দ্বারা নয়।"

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে অশ্‌অরী কোরাণের বাণীসমূহকে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেছেন। যেমন—"হুব'ল্‌-কাহিরী ফৌক-ইবাদিহী" (তিনি তাঁর সেবকগণের ওপর সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র)।

"কুল-কুল্লুন মিন্‌ ইন্দে ল্লাহে" (বলো, আল্লার নিকট থেকেই সব)।

"ব মা তসাবূন ইল্লা অন্‌য্যঁশাঅ'ল্লাহ" (আল্লা যতক্ষণ না চাইবেন ততক্ষণ তুমি কিছু চাইতে পার না)।

এইভাবে ঈশ্বরের সীমাহীন সর্বশক্তিমত্তা, অশ্‌অরীর প্রধান সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি।

(৪) দেশ, কাল ও গতির মধ্যে বিচ্ছিন্ন বিন্দুবাদ—অশ্‌অরীর হেতুবাদ অস্বীকারের প্রকরণে আমি আগেই বলেছি যে তাঁরা না মানতেন জগতের কার্যকারণ নিয়মকে, না জাগতিক বস্তুকে দেশ, কাল, গতির মধ্যে কোনো রকম অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের পটভূমিতে। গণিত—এক, দুই, তিন ····-এর মধ্যে কোনো প্রকার অবিচ্ছিন্ন ক্রমকে মানে না। এক সংখ্যাটি সমাপ্ত হলে তবেই দুই অস্তিত্ব-প্রাপ্ত হয়—প্রশ্ন হলো এক থেকে দুইয়ে সংখ্যাজ্ঞান সর্পের ন্যায় পিচ্ছিল গতিতে হয়, না ভেকের ন্যায় লম্ফ দিয়ে; উত্তর হবে—লাফিয়ে। দেশ বা দিশায় বস্তুর গতি। বন্যাকে দেশ থেকে দেশান্তরে চলতে দেখা যায়। প্রশ্ন ওঠে যদি বন্যা সব সময়ে কোনো স্থানে স্থিত থাকে—তবে তা গতিশূন্য—অতঃপর একে গতি বলা ভুল হবে। এখন যদি আপনি দৃষ্টি গতিকে সিদ্ধ করতে চান তবে তার একমাত্র রাস্তা হলো সর্পের ন্যায় পিচ্ছিল নয়, সংখ্যার মতো গতিকে এক-একটি লম্ফ বলে মেনে নেওয়া। অকারণ পরমাণু প্রতি মুহূর্তের জন্য সৃষ্টি হয়েই লয় প্রাপ্ত হয়। আর একটি নতুন অকারণ পরমাণু তার দেশ ও কালের জন্য জন্মে ও বিনষ্ট হয়। এই প্রথম ও দ্বিতীয় পরমাণুর মধ্যে শূন্যতা—গতিশূন্যতা, দেশ-শূন্যতা। এমন নয় যে প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় মুহূর্তের ('এখনই') মধ্যে সম্বন্ধ না থাকায় তাকে কালিক-শূন্যতা বলা যাবে—যা কাল তাই-ই 'এখন'=ক্ষণ, যা 'এখন' নয় তা কাল নয়। আবার যেখানে দুটি 'এখন'-এর মধ্যে আমরা কিছুই পাই না; একেই বলে কালিক-শূন্যতা। অশ্‌অরী ভেকের লম্ফের (প্লুতির) উপমার সিদ্ধান্ত দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিমত্তার হেতুবাদ-নিষেধ, তথা বস্তু-গতি-দেশ-কালের পরমাণু-রূপতা সবকিছুকেই এইভাবে সিদ্ধ করেছেন। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখার মতো কথা হলো এই যে, অশ্‌অরী এই 'ভেক-লম্ফন', 'বিচ্ছিন্ন-প্রবাহ',

'বিন্দু-ঘটনা,' 'বিচ্ছিন্ন পরমাণু-সন্ততি'-কে বস্তু-স্থিতি থেকে উৎপন্ন কোনো সম্ভাব্য জটিলতাকে মুক্ত করার জন্য স্বীকার করেননি, যা কি-না আমরা বর্তমানের আপেক্ষিকতাবাদ (=Relativity), কোয়াণ্টামবাদ (=Quantum Theory) অথবা বৌদ্ধের ক্ষণিক অনাত্মবাদ এবং মার্কস-এর (দ্বান্দ্বিক) বস্তুবাদে পাই। অশ্‌অরী এর দ্বারাই দিব্যদর্শন, অলৌকিকতা, ঈশ্বরের নিরঙ্কুশতা ইত্যাদি সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। সন্দেহ নেই যে, এই সিদ্ধান্তসমূহ থেকেই আল্লার নিরঙ্কুশতার আবরণে স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজগণ তাঁদের নিরঙ্কুশতাকেও আচ্ছাদিত করে রাখার চমৎকার সুযোগ পেয়েছিলেন।

(৫) **পয়গম্বরের লক্ষণ**—'পয়গম্বর কে' এর উত্তরে মুবাফিক বলেছেন— "পয়গম্বর তিনিই যাকে আল্লা বলেন—'আমি তোমাকে পাঠালাম' বা 'এই ব্যক্তি আমারই প্রেরিত' এই রকম সব শব্দ। পয়গম্বর হওয়ার কোনো শর্ত বা যোগ্যতা নেই, বরং আল্লা তাঁর ভক্তদের মধ্যে যাকে চান তাকেই নিজের কৃপার পাত্র করে নেন।" ("মণ্‌ কালা লহু অর্সল্‌তোকা ঔ বল্লগ্‌হুম্‌ অন্নী, ওযো নব্‌হহা মিন্‌'-ল্‌ অল্‌ফাজে। ওয়ো লা যস্তেরোতো ফীহে শতূর্ন্‌, ওয়ো লা এস্তেঅ্‌দাহুন্‌ বলি'ল্লাহো যখ্‌তস্‌সো বেরহ্‌ মতেহী মন্‌ য্যশাও মিন্‌ এবাদেহী।")

(৬) **দিব্য চমৎকার (=সিদ্ধি)**—এমন দাবিও তো কেউ করতে পারেন যে খোদা আমাকে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন, তাই অশ্‌অরীগণ ঐশ্বরিক প্রমাণ হিসাবে দিব্য চমৎকার বা সিদ্ধিকে পয়গম্বরত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। এই দিব্য-অলোকিকতাকে সিদ্ধ করার জন্য তাঁরা কিভাবে হেতুবাদকে অস্বীকার করেছেন এবং খোদা কর্তৃক প্রতি মুহূর্তে নতুন পরমাণু সৃষ্টির কল্পনা করেছেন সে বিষয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচ্যের ইসলামী দার্শনিক (১)

(শারীরিক ব্রহ্মবাদী)

§ ১. আজুজীদ্দীন রাজী (৯২৩ বা ৯৩২ খৃষ্টাব্দ)

শারীরিক ব্রহ্মবাদ বা পিথাগোরাসের প্রাকৃতিক দর্শনের ইসলামী সমর্থকগণের মধ্যে ইমাম রাজী এবং 'পবিত্র-সংঘ'ই প্রধান। কোনো অজ্ঞাত কারণে পবিত্র সংঘের অপযশ হওয়ায় তার পক্ষে মুসলমানগণের ওপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু এ ব্যাপারে রাজীকে তাঁর স্নিগ্ধ দর্শনশৈলীর ফলে সৌভাগ্য-শালীই বলা চলে। এখন আমি এঁর সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করব।

(১) জীবনী —আজুজীদ্দীন রাজী পশ্চিম ইরাণের রে শহরে আবির্ভূত হন। ধর্ম শিক্ষার অতিরিক্ত গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন (বিশেষত পিথাগোরাসের) প্রভৃতি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, এবং সেই সময়ে একজন প্রথিতযশা হাকিম বা চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

যুক্তিবিদ্যার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না, এবং অ্যারিস্টটল রচিত একখানি তর্কশাস্ত্র ছাড়া তিনি এ বিষয়ে আর কোনো পুস্তক পাঠ করেননি।

সরকারী চিকিৎসক হিসাবে তিনি প্রথমে রে শহরে এবং পরে বাগদাদের চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে উদাসী হয়ে দেশ ভ্রমণের নেশায় বেরিয়ে পড়েন। এই ভ্রমণকালে তিনি কতিপয় সামন্ত প্রভুর কৃপাপাত্র হয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে ইরাণী সামানী বংশের (৯০০-৯৯৯ খৃঃ) শাসক ইবনে ইশ্‌হাকও ছিলেন; এঁকে রাজী স্বরচিত একটি চিকিৎসা গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।

সাধারণ বিচার —চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি রাজী পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই বিদ্যা সহস্র বর্ষের উপলব্ধির ফলশ্রুতি। রাজীর বক্তব্য, ক্ষুদ্র এই জীবনে কতিপয় ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অপেক্ষা সহস্র বর্ষের অভিজ্ঞতার দ্বারা সঞ্চিত জ্ঞানই আমার নিকট অধিক মূল্যবান।

১—দার্শনিক বিচার

(ক) আত্মা এবং শরীর—আত্মা ও শরীরের মধ্যে রাজী আত্মাকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। আত্মা-সম্বন্ধী অসুস্থতা শরীরের ওপরেও মন্দ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। তাই রাজী আত্মার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তবুও নিরাশাবাদের প্রতি রাজীর আগ্রহ অধিক থাকায় আত্মার চিকিৎসা বহু ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল—জগতে শুভের চেয়ে অশুভের পাল্লাই বেশী ভারী হয়।

রসায়ন শাস্ত্রের ওপর রাজী অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বস্তুজগতের বিভিন্ন মূল উপাদানের মিশ্রণ ধাতুতে পরিবর্তিত হতে পারে। রসায়নের বিভিন্ন মিশ্রণ থেকে বিচিত্র গুণের উদ্ভাবন দেখে তিনি অনুমান করেন যে দেহের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত গতি সৃষ্টি করার মতো যথেষ্ট শক্তি আছে। সন্দেহ নেই যে তাঁর এই বিশ্লেষণ মূল্যবান কিন্তু প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি একে আর বিকাশিত করতে পারেননি।

(খ) পঞ্চ সংখ্যক নিত্য উপাদান—(১) কর্তা (=পুরুষ বা ঈশ্বর), (২) বিশ্বাত্মা, (৩) মূল ভৌতিক উপাদান, (৪) পরমার্থ দিশা এবং (৫) পরমার্থ কাল, এই পাঁচটি উপাদানকে রাজী নিত্য বলে এবং সদা সহাবস্থিত বলে মেনেছেন। এই অত্যাবশ্যক উপাদানগুলি ছাড়া বিশ্ব সৃষ্টি হতে পারত না। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারা বাহিক পদার্থ 'ভৌতিক উপাদান'-কে জানতে পারি, এ ছাড়া আর কোন বস্তুকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করে? বিভিন্ন বস্তুর স্থিতি তার স্থান বা দিশাকে নির্দেশ করে। বস্তুর যে সদা পরিবর্তনশীলতা—আগে ঐ রকম ছিল, এখন এই রকম—আমাদের কাছে কালের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। প্রাণীর অস্তিত্ব তথা জড়পদার্থের সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য প্রমাণ করে যে আত্মাও এক পদার্থ। আত্মাসমূহের মধ্যে কয়েকটি বুদ্ধি—শিল্প প্রভৃতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা—থাকে, যাতে বোঝা যায় যে এই বুদ্ধির স্রোত কোনো বুদ্ধিমান কর্তা।

(গ) বিশ্বের বিকাশ—রাজী তাঁর পঞ্চ উপাদানকে নিত্য এবং সদা একত্রিত বলেও এর মধ্যে বিশেষ একটিকেই প্রধান বলে মেনেছেন অর্থাৎ তিনি এই নিত্যতাকে কিছু শর্তের সঙ্গে মেনেছেন। সৃষ্টির কাহিনী তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—প্রথমে একটা শুদ্ধ আধ্যাত্মিক জ্যোতি আবির্ভূত হয়েছিল, এই জ্যোতিই আত্মার (জীবের) উপাদান-কারণ, অতএব আত্মা এক সাধারণ, প্রকাশোন্মুখ আধ্যাত্মিক উপাদান। যে ঊর্ধ্বলোক বা জ্যোতির্লোক থেকে আত্মার আগমন, সেই স্থানকেই ব্রহ্ম বা ঐশ্বরিক জ্যোতির প্রকাশ বলা যেতে পারে। দিবসের অনুগামী যেমন রজনী, প্রকাশের অনুসরণকারীও তেমন অন্ধকার বা তমঃ। এই তমঃ থেকেই পশুজাতীয় আত্মার (জীবের) জন্ম, যাদের কাজ হলো বুদ্ধিমান

আত্মার (= মানব) বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করা। আধ্যাত্মিক জ্যোতি যখন অস্তিত্ব প্রাপ্ত হলো তখন তার সঙ্গে একটি মিশ্রিত বস্তুও ছিল, সেটার নামই অশরীরী অবয়ব। এরই ছায়া থেকে উষ্ণতা, শৈত্য, রুক্ষতা এবং নম্রতা এই চারটি 'স্বভাব' উৎপন্ন হয়। অন্তে এই চারটি 'স্বভাব' থেকে আকাশ ও পৃথিবীর সব পিণ্ড —শরীর —সৃষ্টি হয়। এইভাবে যা সৃষ্টি হয়েছে তার পাঁচ উপাদানকে নিত্য বলা হলো কেন? রাজী এর উত্তরে বলেছেন —কেন না, এই সৃষ্টি সব সময় চলছে, ঈশ্বর কখনই নিষ্ক্রিয় নন। এইভাবে জগতের নিত্যতাকে স্বীকার করে রাজী ইসলামের আরম্ভবাদের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে গিয়েছেন, তা সত্ত্বেও রাজীর নামের সঙ্গে 'ইমাম' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের অন্তরে তিনি নিজের জন্য একটি কোমল স্থান করে নিয়েছিলেন।

(ঘ) মধ্যমার্গী দর্শন —রাজীর আবির্ভাবের আগে থেকেই এমন নাস্তিক জড়বাদী দার্শনিকগণের পরম্পরা চলে আসছিল যাঁরা জগতের কোনো স্রষ্টাকে মানতেন না। তাঁদের ধারণা জগতের স্বয়ংসৃষ্ট হওয়ার ক্ষমতা আছে। অন্যদিকে ছিলেন ঈশ্বর-অদ্বৈত (তৌহীদ)-বাদী মোল্লা সম্প্রদায়, যাঁরা কোনো অনাদি আত্মা, জড়-উপাদান —দিশা, কাল প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করাকে মনে করতেন আল্লার সৌন্দর্য ও পৌরুষে কলঙ্কলেপনের তুল্য। রাজী জড়বাদী অথবা অদ্বৈত-বাদী কারও মতকেই সঠিক বলে মনে করতেন না তাই তিনি একটা মধ্যপন্থাকে স্বীকার করেছিলেন —ধারণাকে যুক্তিসম্মত করার জন্য ঈশ্বরের অতিরিক্ত আত্মা, প্রকৃতি, দিশা, কালেরও প্রয়োজন, এবং বুদ্ধিমান মানবাত্মাকে প্রকট করার জন্য প্রয়োজন কর্তার।

§ ২. পবিত্র-সংঘ (= অখবানুস্‌সফা)

মোতজলা, করামী, অশ্‌অরী ; এই তিন সম্প্রদায়ই ছিল দর্শনদ্রোহী। কিন্তু সেই সময়ে বস্‌রায় পবিত্র-সংঘ নামে নতুন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা দর্শন —বিশেষত পিথাগোরাসের দর্শনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং ইসলামকে দার্শনিকতার রঙে রঞ্জিত করতে চেয়েছিলেন। এই সম্প্রদায় শুধু ধার্মিক বা দার্শনিকই নয়, এঁদের একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনাও ছিল। এঁরা দর্শনকে শুধু আত্মার তৃপ্তিদায়ক বিষয় বলে মনে করেননি, তার দ্বারা এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠাও করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য কোরাণের দ্বৈত অর্থ করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন। এবং জগতে একটা ইউটোপিয়ান (Utopian, কাল্পনিক আদর্শ) ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

(১) অতীতানুসারী ইবনে-মৈমুন —নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মোতজলী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আল্লাফের দেহান্ত হয় এবং তার কাছাকাছি সময়েই আব্দুল্লা

ইবনে-মৈমুনের জন্ম হয় (৮৫০ খৃঃ)। আজমী বা ইরাণীদের মুসলিম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ইসলাম প্রচণ্ড ভুল করেছিল। ইসলামের মধ্যে যত মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার অধিকাংশেরই প্রবর্তক ছিলেন এই ইরাণীগণ। ইবনে-মৈমুনও ছিলেন এঁদেরই একজন। দামাস্কাসের ম্বাবিয়া বংশ (=বনী-উমাইয়া) প্রথম দিকে আপোস-মীমাংসা দ্বারা তাঁদের অধীনস্থ বিদেশের সভ্য জাতি সমূহের নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিবৃত্ত করেছিলেন। বাগদাদের আব্বাসী বংশ এই পথে অধিকতর গতিদান করে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থার অনেক কিছুই ইরাণী কৃষ্টির রঙে রাঙিয়ে নিয়েছিলেন — তাঁরা ইরাণী পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট সম্মানই শুধু দান করেননি, ইরাণী রাজনীতিজ্ঞদের মন্ত্রী —মহামন্ত্রিত্বে বরণ করে শাসনকার্যের অংশীদার পর্যন্ত করে ছিলেন। কিন্তু মনে হয়, এতেও তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইবনে-মৈমুন যে দলের নেতা ছিলেন সেই করমতী দল আব্বাসী শাসনকে হঠিয়ে নতুন এক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করতে চেয়েছিল, কেমন শাসন তা আমি পরে বলব। ইবনে-মৈমুনের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাঁকে একজন ষড়যন্ত্রকারী নীতিহীন ব্যক্তি বলে মনে করতেন, কিন্তু তাঁকে মহাত্মা ও উচ্চস্তরের দার্শনিক বলে মনে করার মতো বহু মানুষও ছিলেন। মৈমুনের সম্প্রদায় শুভ্র বর্ণকে নিজেদের প্রতীক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করতেন তাঁদের ধর্ম পরিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল এবং এই ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হওয়াই আত্মার চরম লক্ষ্য।

(**শিক্ষা**) —করমতী লোকের শিক্ষাই ছিল কর্তব্যের কাছে শরীর ও ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ মনে করতে হবে। সংঘের ভ্রাতৃগণের কল্যাণের প্রতি সর্বদা মনোযোগী হতে হবে। সংঘের জন্য আত্মসমর্পণ, নেতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও তাঁর আজ্ঞাপালনে পূর্ণ তৎপরতা —প্রত্যেক করমতীভুক্ত ব্যক্তিরই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সংঘের কল্যাণ ও নেতার আজ্ঞায় মৃত্যুকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে হবে।

২—পবিত্র-সংঘ

(১) পবিত্র-সংঘের স্থাপন —বসরা এবং কুফা ছিল করমতী সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। দশম শতাব্দীর শেষার্ধে বসরায় একটি ছোট-খাট সংঘ (পবিত্র-সংঘ) স্থাপিত হয়। এই সংঘে চারটি শ্রেণীবিভাগ ছিল। প্রথম শ্রেণীতে সম্মিলিত ছিল ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক তরুণ। আত্মিক বিকাশের জন্য গুরুর আজ্ঞাপালন এদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ৩০ থেকে ৪০ বছরের সদস্যগণ। আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে এঁদের বহির্জগৎ সম্বন্ধেও জ্ঞানার্জন করতে হতো। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ৪০ থেকে ৫০ বছরের সদস্যভ্রাতৃগণ; এঁরা জগতের দিব্য-নীতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি করতেন, এঁরা ছিলেন পয়গম্বরতুল্য। ৫০ বছরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণ ছিলেন চতুর্থ,

অর্থাৎ সর্বোচ্চ শ্রেণীর সদস্য। তাঁরা ছিলেন সত্য-দ্রষ্টা এবং তাঁদের মর্যাদা ছিল ফরিস্তা —দেবতার —সমান। প্রকৃতি, সিদ্ধান্ত, ধর্ম সব কিছুর উর্ধ্বে ছিল তাঁদের স্থান। এই শ্রেণী বিভাজনের কাজে পবিত্র-সংঘ যে ইবনে-মামুনের করামতী দল তথা প্লেটোর প্রজাতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে তাঁরা তাঁদের এই শ্রেণীবিভাজনকে কতটা বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছিলেন।

(২) পবিত্র-সংঘের গ্রন্থাবলী ও নেতৃবর্গ—পবিত্র-সংঘ তাঁদের সমকালীন জ্ঞানকে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করেন, যার নাম 'রসায়ল্ অখবান্থসফা' (পবিত্র-সংঘ গ্রন্থাবলী)। এই গ্রন্থাবলী ৫১টি পুস্তকের সংকলন (সম্ভবত শুরুতে ছিল ৫০টি)। গ্রন্থের বর্ণনাশৈলী থেকে মনে হয় এতে বিভিন্ন লেখকগণ ছিলেন এবং সম্পাদনাতেও সামঞ্জস্য বিধানের কোনো চেষ্টা দেখা যায় না। এতে রাজনৈতিক পদক্ষেপের সঙ্গে প্রাকৃতিক ভাবের আধারে জ্ঞানবাদের বিবেচনা করা হয়েছে। সংঘের নেতৃবর্গ এবং গ্রন্থাবলী রচয়িতা সম্বন্ধে পরবর্তী পুস্তকে যে সব নাম পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ—

(১) মুকদ্দসী বা আবু-সুলৈমান মুহম্মদ ইবনে মুশীর অল্-বস্তী ;
(২) জজানী আবুল-হাসান আলী ইবনে-হারুণ অল্-জজানী ;
(৩) নহ্মাজুরী বা মুহম্মদ ইবনে-আহ্মেদ অল্-নহ্মাজুরী ;
(৪) ঔফো বা আল ঔফো ; এবং
(৫) রিফাঅ বা জৈদ ইবনে-রিফাঅ।

পবিত্র সংঘ যে সময়ে কাজে নেমেছিল সেই সময়ে বাগদাদের খলিফা প্রাধান্য হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং জায়গায় জায়গায় স্বতন্ত্র শাসকগণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে-ছিলেন। মুসলিম সুলতানগণ এই সময়েও অবশ্য খলিফাকে পোপের ন্যায় ধর্মগুরু মনে করে সম্মান করতেন এবং উপঢৌকন পাঠিয়ে বড় বড় পদবী পাওয়ার আশা করতেন। বাগদাদের প্রতিবেশী তথা ইরাণের পশ্চিমাংশে ছিল বুবায়হা বংশের শাসন; এই বংশ স্পষ্টতই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পবিত্র-সংঘ গ্রন্থাবলীতে মোতজলা-শিয়া-গ্রীক দর্শনের ভিত্তির ওপর নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই কাজে সেই সময় বা কাল কতটা অনুকূল ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

(৩) পবিত্র-সংঘের সিদ্ধান্ত—তৎকালীন ধার্মিক অসহিষ্ণুতার সঙ্গে পবিত্র-সংঘের পরিচয় থাকায় তাঁরা চাইতেন যে লোকে ইব্রাহিম মুসা, জর্তুস্তী (জোরোয়াস্ত্রা), মুহম্মদ, আলী সকলকেই ভগবানের দূত —পয়গম্বর —বলে মানুক ; এমন নয় যে ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধির আপোস রফা করার জন্য তাঁরা পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটোকেও ঋষি বা পয়গম্বরের শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। তাঁরা সক্রেটিস, যীশু তথা খৃষ্টান শহীদগণকেও হাসান-হুসেনের মতোই পবিত্র শহীদ বলে মানতেন।

(ক) দর্শন-প্রধান—পবিত্র-সংঘের বক্তব্য ছিল যে ধর্মে বিশ্বাস, নীতি নিয়ম পালন প্রভৃতি সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত মানুষের পক্ষে ঠিক কাজ; কিন্তু মেধাবী, জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত হলো উচ্চপর্যায়ের দার্শনিক অন্তদৃষ্টি থাকা।

(খ) জগতের উৎপত্তি বা নিত্যতা-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ভুল—বুদ্ধের ন্যায়ই পবিত্র-সংঘের দার্শনিকগণও জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করাটাকে নিছক পণ্ডশ্রম বলে মনে করেছেন। আমি কি বা কে? এই প্রশ্ন আমার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং লাভজনক। "মানব-বুদ্ধি যখন এই প্রশ্নেরও ঊর্ধ্বে যেতে চায় তখনই সে নিজের সীমাকে অতিক্রম করে। নিজেকে উন্নত করতে করতে ক্রমশ শুদ্ধ ও সর্বমহান্ জ্ঞানে (ব্রহ্মে) উপনীত হওয়াই হয় তার চরম লক্ষ্য, যা কি-না সংসার ত্যাগ এবং সদাচার দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।"

(গ) অষ্ট (নবম) পদার্থ—পবিত্র-সংঘ গ্রীক তথা ভারতীয় দার্শনিক-গণের ন্যায় উপাদানের বর্গীকরণ করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ঈশ্বর, পরমাত্মা বা অদ্বৈত, যা থেকে ক্রমশ নিম্নলিখিত আটটি উপাদানের বিকাশ হয়েছে।

(১) নফ্‌স্‌-ফআল (ভাব বা বুদ্ধি) = কর্তা-ভাব (Creative spirit) = ব্রহ্মা = সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছা বা মনন।
(২) নফ্‌স্‌-ইন্‌ফআল = অধিকরণ বা সর্বভাব।
(৩) হেবলা = মূল প্রকৃতি বা জড় উপাদান।
(৪) নফ্‌স্‌-আলম = জগৎ-জীবন (সমূহ মানবাত্মা)।
(৫) জিস্মে-মুত্‌লক = মহৎ শরীর, পরম উপাদান।
(৬) আলম-অফলাক = ফরিস্তা বা দেবলোক।
(৭) অনাসর-অর্বঅ = (পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি) এই চার পদার্থ।
(৮) মবালীদ-সলাসা = বস্তুজাত তিন প্রকার পদার্থ (ধাতু, বনস্পতি, প্রাণী)।

কর্তা-ভাব, অধিকরণভাব, মূল-প্রকৃতি এবং জগৎ-জীবন এই চারটি অমিশ্র পদার্থ। পরম শরীরকে নিয়ে এই চারটি পদার্থ মিশ্রিত। এই মিশ্রণ হয় দ্রব্য বা গুণ (= ঘটনা) রূপে।

প্রথম দ্রব্য হলো মূল জড় উপাদান বা আকার; প্রথম গুণ হলো দিশা, কাল, গতি, যার মধ্যে প্রকাশ এবং মাত্রাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। মূল জড় উপাদান একটিই এবং সাংখ্যের ন্যায় তা সর্বদা একক। ভিন্নতা এবং বাহুল্যের কারণ হলো আকৃতি, এ বিষয়ে পিথাগোরাসও একমত ছিলেন। প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক দুটি বস্তু—কল্পনাও নয় বস্তুস্থিতিও নয়।

পবিত্র-সংঘের মতে মূল বস্তুতত্ত্বেরও ঊর্ধ্বে কর্তা-ভাবই হলো সকল চেতন অচেতন তত্ত্বের মূল উপাদান-কারণ।

(ঘ) মানবাত্মা—মানবাত্মা (= মন) অধিকরণ ভাব থেকে সৃষ্ট। সকল মানবাত্মার সমষ্টিকে এক পৃথক দ্রব্য বলে মানা হয়েছে—যাকে 'পরম-মানব' বলা যায়

বা 'মানবতার আত্মা'। প্রত্যেক মানবাত্মা বস্তু থেকে বিকাশিত হয়, কিন্তু ক্রমবিকাশের মাধ্যমে তা আত্মায় পরিণত হয়। শিশুর আত্মা তথা মন সাদা কাগজের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্যিক জগৎ থেকে যে বিষয়কে গ্রহণ করে তা প্রথমে মস্তিষ্কে সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হয়, তারপর মধ্যভাগে বিষয়টির বিশ্লেষণ শুরু হয় এবং শেষে সংস্কার দ্বারা জ্ঞানরূপে মস্তিষ্কের শেষভাগে সঞ্চিত হয়। বহিরিন্দ্রিয়ের সংখ্যা মানুষ ও পশুর সমানই, তবে মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো তার বিচারক্ষমতা, বাকশক্তি এবং ক্রিয়া আছে।

(ঙ) ঈশ্বর (= ব্রহ্ম) —সৃষ্টিধর্মী ভাবই ঈশ্বর। ঈশ্বর থেকেই সমস্ত উদ্ভূত। অষ্ট উপাদানেরও ঊর্ধ্বে ঈশ্বর বা পরম অদ্বৈত-উপাদানের অবস্থান। সবকিছুর মধ্যেই এই উপাদান আছে এবং এই উপাদানই সবকিছু।

(চ) কোরাণের স্থান —কোরাণকে পবিত্র-সংঘ কি দৃষ্টিতে দেখতেন তা এই বাক্য থেকেই বোঝা যাবে —"আমাদের পয়গম্বর মুহম্মদ এমন এক অসভ্য রেগিস্তানী জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, যাদের না ছিল ইহলোকের সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনো জ্ঞান, না ছিল পরলোকের আধ্যাত্মিক স্বরূপের ধারণা। এদের জন্য কোরাণে ব্যবহৃত স্থূল ভাষাকে সুসভ্য মানুষের উচিত আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করা।" এই উদ্ধৃতি দ্বারা স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে পবিত্র-সংঘ, জর্তুস্তী (জোরোয়াস্ত্র) খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্মকে অধিকতর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। ঈশ্বরের ক্রোধ, নরক-যন্ত্রণাদির গল্প অন্ধ-সংস্কার বা মূঢ় বিশ্বাস। তাঁদের মতে পাপী ও মূর্খ আত্মাগণ ইহজীবনেই নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রলয়কে তাঁরা নতুন অর্থে এবং দুইভাবে মেনেছেন। দেহ থেকে আত্মার চ্যুতি একটি ক্ষুদ্র প্রলয় ; আর মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে সমস্ত আত্মাই পরম ব্রহ্ম তথা অদ্বৈতে বিলীন হয়ে যায়।

(ছ) পবিত্র-সংঘের ধর্মচর্যা —ত্যাগ, তপস্যা ও আত্মসংযমের ওপর পবিত্র সংঘ সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। কোনো প্রেরণাবিনাই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত বুদ্ধি দ্বারা যা উচিত বলে মনে হয়, সেই প্রকার কর্মই প্রশংসনীয়। দিব্য-বিশ্ব নিয়মের অনুসরণই সর্বোচ্চ ধর্মাচরণ। সকলের অধিক উচ্চস্থান প্রেমের —পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার (জীবের) মিলনের জন্য প্রেম সদা সক্রিয়। এরূপ প্রেমেরই একটি অংশ হলো সেই প্রেম, যা প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে ইহজীবনে ক্ষমা, সহানুভূতি এবং স্নেহ রূপে প্রকাশিত হয়। প্রেম ইহলোকে মানসিক সান্ত্বনা, হৃদয়ে স্বাতন্ত্র্য দেয় তথা সর্বশ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে, এবং পরলোকে নিত্যজ্যোতির সঙ্গে মিলন ঘটায়।

পবিত্র-সংঘ যদিও আত্মিক জীবনের ওপরেই বেশী জোর দিয়ে শরীরের প্রতি অধিক মনোযোগ দেননি ; তবুও শরীরকে একেবারেই অবহেলা করার পরামর্শও দেননি। —"ঠিক মতো দেহের যত্ন নেওয়া উচিত …যাতে আত্মা নিজেকে পূর্ণরূপে বিকাশিত করার সুযোগ ও সময় পায়।"

আদর্শ ব্যক্তিকে এরূপ হতে হবে —"প্রাচ্য ইরাণীদের ন্যায় উচ্চ বংশোদ্ভূত,

আরবীগণের মতো শ্রদ্ধাশীল, ইরাকজাতির তুল্য শিক্ষিত, ইহুদীগণের মতো ব্যক্তিত্ব--সম্পন্ন, যীশুর শিষ্যগণের ন্যায় সদাচারী ও মার্জিত, সিরিয়ানী সাধুর মতো পবিত্র ভাব বিশিষ্ট, গ্রীকগণের তুল্য বিভিন্ন বিজ্ঞানে নিপুণ, হিন্দুর মতো রহস্যের ব্যাখ্যাকারী এবং সুফীর ···মতো সন্ত।" পবিত্র-সংঘের অনেক সিদ্ধান্তই বাতিনী, ইসমাইলী, দশ্‌খা প্রভৃতি ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়, এতে মনে হয় তাঁরা একে অপরের তথা সম্মিলিত চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন।

§ ৩. সুফী সম্প্রদায়

আরব থেকে উদ্ভূত ইসলাম ছিল ভক্তিপ্রধান ধর্ম। খৃষ্ট এবং ইহুদী ধর্মেও ভক্তিরই প্রাধান্য দেখা যায়। গ্রীক দর্শন যুক্তিপ্রধান। কেবল ভক্তি-প্রাধান্য যেমন বুদ্ধিকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, তেমনই যুক্তি-প্রাধান্যও শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরকে তৃপ্ত করতে সক্ষম নয়। সমাজে স্থিরতা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণের প্রয়োজন আছে ; তাঁদের শ্রদ্ধাকে বিচলিত করে দড়ি-ছাড়া উটের মতো স্বেচ্ছাচারী পলায়নপর বুদ্ধিকে নিরস্ত করা প্রয়োজন —এই ধারণাকে অবলম্বন করে গ্রীকগণ প্রাচীন ভারতীয় রহস্যবাদের সঙ্গে মিশ্রিত নব্য-প্লেটোনিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন। যখন ইসলামও একই ধরনের সঙ্কটে আক্রান্ত হয়, তখন সেখানেও সেই হাতিয়ারই ব্যবহৃত হয়েছিল।

খৃষ্টান সাধক তথা হিন্দু-বৌদ্ধ যোগীগণ তৎকালেও ছিলেন এবং তাঁরা কত সাফল্যের সঙ্গে ভক্ত ও দার্শনিক উভয়ের নিকটেই শ্রদ্ধাভাজন হন, তা ইসলামিক তত্ত্বজ্ঞ দেখেছিলেন ; তাই ইসলামও সুফীবাদের নামে গৃহস্থ ও ত্যাগী ফকিরগণের এক সম্প্রদায় গঠন করেন।

১. **সুফী শব্দ** —সোফী (=সোফীস্ট) গ্রীক ভাষার শব্দ। গ্রীক দর্শনের প্রকরণে এই পরিব্রাজক দার্শনিকগণ সম্বন্ধে আমি আগেই আলোচনা করেছি। অষ্টম শতাব্দীতে যখন আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ শুরু হয়েছিল, তখন সোফী শব্দটিও দার্শনিক অর্থে আরবীতে এসে যায় এবং পরে বর্ণমালাগত ত্রুটিতে 'সোফী' সুফীতে পরিণত হয়।

সর্বপ্রথম সুফী উপাধি পান আবুহাসিম সুফী, তাঁর মৃত্যু হয় ১৫০ হিজ্‌রী সন, অর্থাৎ আনুমানিক ৭৭০ খৃষ্টাব্দে। পয়গম্বরের জীবৎকালে বিশেষ ধর্মাত্মা পুরুষগণকে বলা হতো 'সহাবা' (=সাথী)। পয়গম্বরের সমকালীন এই ব্যক্তিদের ভবিষ্যতেও এই নামে স্মরণ করা হতো। পরে জাত মহাত্মাগণকে প্রথমে তাবইন (=অনুচর) আরও পরে তাবঅ-তাবইন (=অনু-অনুচর) বলা হতে থাকে। এরপর জাহিদ (=শুদ্ধাচারী) ও আবিদ (=ভক্ত) এবং তারও পরে সুফী শব্দটি এসেছে। মুসলমান লেখকগণ সুফী শব্দটিকে নিম্নলিখিত অর্থে প্রযুক্ত করেছেন—

"সুফী তাঁরাই, যাঁরা সবকিছু ছেড়ে ঈশ্বরকেই আপন করে নিয়েছেন"
—(জুন্নুন মিশ্রী);

"যাঁদের জীবন-মৃত্যু শুধুমাত্র ঈশ্বর-নির্ভর" —(জানীদ বাগদাদী);

"যাঁরা সম্পূর্ণ শুভাচারী ও দুরাচরণ থেকে মুক্ত" — (আবুবক হারীরী);

"যাঁদের অন্য কেউ পছন্দ করে না, অন্যদেরও যাঁরা পছন্দ করেন না"
—(মনসুর হুল্লাজ);

"যাঁরা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের নিকটেই আত্মসমর্পণ করেন" —(রোয়ম্);

"যাঁদের মধ্যে পবিত্র জীবন, ত্যাগ ও কল্যাণগুণ একত্রিত হয়েছে"
—(শাহাবুদ্দীন সুহরাবর্দী)।

গজালী (১০৫৯—১১১১ খৃঃ) সুফী শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন সুফী শব্দটি জ্ঞান ও আচরণ বা কর্মের সংমিশ্রণ। কোরাণের ভক্তিমার্গ এবং সুফী-মার্গের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, কোরাণোক্ত শরীঅতে জ্ঞানের পরে এসেছে আচরণ, এবং সুফীমার্গে আচরণের পরে জ্ঞান।

২. **সুফী পন্থের নেতা** —আমি আগেই বলেছি যে ইসলামিক সুফীবাদ হলো নব্য-প্লেটোনিক দর্শন ও রহস্যবাদ এবং ভারতীয় যোগের সংমিশ্রণ। এই ধরনের পন্থা ইরাক, ইরাণ, মিশর সকল দেশেই ছিল, এ রকম অবস্থায় ইসলামের ভেতর ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হওয়া তার পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন নয়। কিছু লোকের মতে পয়গম্বরের জামাতা আলীই ছিলেন সুফী-জ্ঞানের প্রথম প্রবর্তক, কিন্তু মাবিয়ার সঙ্গে মনোমালিন্যের সময়ে আমরা দেখেছি যে আলী ইসলামের মধ্যে আরবীয়ানার কি রকম দৃঢ় পক্ষপাতী ছিলেন। অতএব, এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ অবস্থায় একজন সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির পক্ষে বিচার-স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে বেশী প্রগতিশীল হওয়া সম্ভব নয়। মনে হয় ইরাণীগণ বিজয়ী আরবীগণকে অবদমিত করে নিজেদের জাতীয়তাবাদী স্বতন্ত্র চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যেভাবে আরবীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নেওয়ার জন্য আলী-সন্তানদের তথা শীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল, সেইভাবেই ইসলামের আরবী শরীঅত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সুফীমার্গকে উর্ধ্বে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে হজরত আলীর নামের সঙ্গে তা যুক্ত করে দিয়েছিল।

মোল্লাগণের ভয়ে সুফীমত প্রথমে নিঃশব্দে অব্যবস্থিতভাবে চলছিল, কিন্তু ইমাম গজালীর (একাদশ শতক) ন্যায় প্রভাবশালী বিদ্বান মোল্লা যখন খোলাখুলি তাঁদের সপক্ষে লেখনী ধারণ করলেন এমনকি তাঁদের শিক্ষাকেও সুব্যবস্থিত পট-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন তখন তাঁরা যেন পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেলেন।

৩. **সুফী সিদ্ধান্ত** —পবিত্র-সংঘ যে সুফীমতের প্রশংসক ছিলেন, তা আগেই বলেছি। সুফী দর্শনে জীব ব্রহ্মেরই অংশ, ব্রহ্মের মধ্যে লীন হওয়াই তার প্রধান আরাধ্য বিষয়। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। শঙ্করের ব্রহ্ম-অদ্বৈতবাদ

এবং সুফীর অদ্বৈতবাদে কোনো প্রভেদ নেই। ভারতে মুসলমান সুফীগণ যে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পথে এত সাফল্য অর্জন করেছিলেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হক্ (সত্ বা ব্রহ্ম)-এর সঙ্গে জীবের মিলনের একটিই পথ আছে, তা হলো প্রেম (ইশ্ক)-এর। যদিও তা শুদ্ধ, আধ্যাত্মিক প্রেম তবু অন্তত কয়েকবার তাকে লৌকিক ক্ষেত্রেও পদার্পণ করতে হয়েছিল, কাব্যক্ষেত্রে—ইরাণেই নয়, ভারতেও তো এই প্রেম বহু প্রসিদ্ধ কবির জন্ম দিয়েছে। শম্স, তব্রেজ, ওমর-খৈয়াম, মৌলানা রুমী, জায়সী, কবীর প্রভৃতির ন্যায় বিখ্যাত কবিগণ তো এই প্রেমেরই কবি।

৪. **সুফী যোগ**—ভারতীয় যোগের মতো—(আর ভারতীয় যোগের অনেক কিছু তো নিয়েছে) সুফী যোগেরও তাই অনেকগুলি সোপান আছে, যেমন—

(১) **বৈরাগ্য বা মায়ার বন্ধন ত্যাগ**—বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, কামিনী কাঞ্চন, ধন-দৌলত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হলো সুফী যোগের প্রথম সোপান।

(২) **একান্ত-চিন্তন**—যেখানে চিত্তচাঞ্চল্যজনক বস্তু নেই সে রকম নির্জন স্থানে নিবিষ্ট-অন্তরে ঈশ্বরের ধ্যান করতে হবে।

(৩) **জপ**—ধ্যানকালে এমনভাবে ঈশ্বরের নাম 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্', উচ্চারণ করে যেতে হবে যাতে জিহ্বা না জড়িত হয় এবং মনে হয় যেন ঐ নাম স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই উচ্চারিত হচ্ছে।

(৪) **মনোজপ**—ধ্যানের সময় শুধু মুখে নয় অন্তরের মধ্যেও নামজপ করতে হবে।

(৫) **ঈশ্বরে তন্ময়তা**—মনোজপ বর্ধিত হয়ে চিত্তের একাগ্রতা এত গভীর হবে যে সেখানে বর্ণ, শব্দ, উচ্চারণের কোনো খেয়ালই থাকবে না এবং ঈশ্বর (আল্লাহ্)-এর ধ্যানে অন্তর এত গভীরভাবে নিমগ্ন হবে যে তার থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না।

(৬) **দিব্যদর্শন (মুকাশফা)**—ঐ রকম তন্ময়তা ঘটলে দিব্যদর্শন হয়। দিব্যদর্শনের ফলে আধ্যাত্মিক সত্যতা—যাকে মানুষ কেবল শ্রদ্ধা বা সংস্কারবশত মেনে এসেছে—তা স্পষ্ট দেখা যায়। পয়গম্বরী, আকাশবাণী (=ভগবদ্বাণী), ফরিস্তা, শয়তান, স্বর্গ ও তার সেতু, নরক ও তার যন্ত্রণা, পাপ-পুণ্যের তুলাদণ্ড, ন্যায়ের পুরস্কার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কথা যেগুলি শ্রদ্ধাবশে মেনে নেওয়া হয়—সে সবই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইমাম গজালী দিব্যদর্শনকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করেছেন—

"একবার রোমান এবং চৈনিক চিত্রকরগণের মধ্যে বিবাদ বাধে। উভয়েই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতে থাকেন। তৎকালীন বাদশাহ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করার জন্যে একটি ঘরের দুই বিপরীত দেওয়ালের একটিতে রোমান শিল্পীকে এবং অন্যটিতে চৈনিক শিল্পীকে চিত্রাঙ্কনের আদেশ দিয়ে মাঝখানে পর্দা

ফেলে দেন, যাতে তারা পরস্পরকে নকল না করতে পারে। কয়েকদিন পরে রোমান চিত্রকর বলে তার কাজ শেষ হয়েছে, চৈনিকও তাই বলে। পর্দা উঠিয়ে দেখা গেল যে উভয়ের চিত্রই আশ্চর্য রকম এক, এক চুলও পার্থক্য নেই। দেখা গেল যে রোমানটি মোটেই চিত্রাঙ্কন না করে দেওয়ালকে স্রেফ পালিশ করে আয়না বানিয়ে ছেড়েছে ফলে পর্দা তোলা মাত্রই চৈনিক চিত্রকরের আঁকা ছবিটি রোমানের দেওয়াল-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।"

মুকাশফার (দিব্যদর্শনের) পূর্বসূচনা প্রথমে হয় অকস্মাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো, পরে তা ধীরে ধীরে স্থিতি লাভ করে।

গজালী লিখিত অহ্যাউল-উলূম-এর সঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নিম্নোক্ত সূক্তিটি (২/১১) তুলনীয়—

"নীহারধূমার্কানলানিলানাং খদ্যোৎবিদ্যুতস্ফটিকাশনীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তকরাণি যোগে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচ্যের ইসলামী দার্শনিক (২)

ক. রহস্যবাদ-বস্তুবাদ

চীনের সম্রাট মিগ (৫৮-৭৫ খৃঃ) বুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শন করেন, তারপর তিনি বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ পুস্তকের অনুসন্ধান এবং অনুবাদের কাজ শুরু করান। খলিফা মামুনের (৮১১-৮৬৩ খৃঃ) সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনিও স্বপ্নে অ্যারিস্টটলকে দেখেন এবং অ্যারিস্টটল তাঁকে নিজের দর্শনের সম্বন্ধে এমন কিছু বলেন যাতে মামুন প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়ে পরের দিনই কিছু লোককে ক্ষুদ্র-এশিয়ায় অ্যারিস্টটলের গ্রন্থগুলিকে খুঁজে বাগদাদে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাতে আরবী ভাষায় সেগুলির অনুবাদ করানো যায়। মামুনের দরবারে যেভাবে অ্যারিস্টটলের প্রশংসা করা হতো, তাতে তাঁর মতো পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী যে প্রভাবিত হয়ে অ্যারিস্টটলকে স্বপ্নে দেখবেন এ আর আশ্চর্য কি? গ্রীক দর্শন গ্রন্থের আরবীতে ভাষান্তরের কথা আমি আগেই বলেছি। এখন আমি ঐ অনুবাদ এবং দর্শনচর্চা দ্বারা কিভাবে ইসলামের মধ্যেও দার্শনিকগণের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তাঁরা কি প্রকার বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন সেই বিষয়েই বলব। বাগদাদ ছিল দর্শনানুবাদ ও দর্শনচর্চা উভয়েরই কেন্দ্র, অতএব ইসলামের প্রথম দার্শনিকগণের প্রাচ্যদেশে আবির্ভূত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম দার্শনিক হলেন কিন্দী, তাই তাঁকে নিয়েই আমি আমার আলোচনা শুরু করছি।

§ ১. আবু-ইয়াকুব-কিন্দী (৮০০-৮৭০ খৃঃ)

১. **জীবনী** —আবু-ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে-ইসহাক আল-কিন্দী —(কিন্দী বংশজ ইসহাকপুত্র আবুল-ইয়াকুব), কিন্দা নামক আরবী-কবীলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। কিন্দা কবীলা দক্ষিণ আরবের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু যে পরিবারে দার্শনিক কিন্দী ভূমিষ্ঠ হন, তাঁদের কেউ পুস্তো থেকে ইরাকে এসে বসবাস করেছিলেন। আবু-ইয়াকুব-কিন্দীর জন্মের সময়ে তাঁর পিতা ইসহাক কিন্দী ছিলেন কুফার রাজ্যপাল। নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে তিনি সম্ভবত

নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে একটি পুস্তক থেকে জানা যায় যে তিনি ৮৭০ খৃষ্টাব্দে (আল-কিন্দীর মৃত্যুকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ৮৭০ কিংবা ৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান।) জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে ফলিত জ্যোতিষের এমন কিছু যোগাযোগ ঘটছিল যাকে অবলম্বন করে করমতী দল আব্বাসী বংশের শাসনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছিল। কিন্দীর শিক্ষা প্রথমে বসরায় এবং পরে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা সংস্কৃতির পীঠস্থান বাগদাদে হয়েছিল। কিন্দী ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ইসলামী দার্শনিক, তাঁকে আরব বংশজ বলা যেতে পারে, কিন্তু তা কেবল পিতৃপরিচয় হিসেবে। বাগদাদ ঐ সময়ে নামেমাত্র ছিল খলিফার রাজধানী, বস্তুত তা ছিল ইরাণী সভ্যতা এবং গ্রীক দর্শনচর্চার কেন্দ্র। বাগদাদে বসবাসকালে কিন্দী অনুভব করেছিলেন যে প্রাচীন আরবী সারল্য তথা ইসলামী ধর্মবিশ্বাস দুই-ই প্রাচীন জাতির সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে সঠিক নিরূপণ করতে পারেনি। গ্রীক চিন্তাধারার দ্বারা তিনি এতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি বলেছিলেন, দক্ষিণ আরবের কবীলাদের (কিন্দীও যাদের মধ্যে একটি) পূর্বপুরুষগণ পূর্বোক্ত গ্রীকদের (গ্রীকগণের প্রথম পুরুষ)-ভ্রাতা। বাগদাদে আরবী, সিরিয়ানী, ইহুদী, ইরাণী, গ্রীক প্রভৃতি রক্তের এতই সংমিশ্রণ ঘটেছিল যে সেখানে জাতি-পার্থক্যের নামে কোনো অসহিষ্ণুতা দেখা যায়নি।

কিন্দী আব্বাসের দরবারে কতদিন ছিলেন তা জানা যায়নি। গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদকগণের মধ্যে তাঁর নাম পাওয়া যায়। তিনি শুধু স্বয়ং অনুবাদই করেননি, অন্যের অনুবাদের সংশোধন এবং সম্পাদনাও করেছিলেন। একাধারে জ্যোতিষী এবং চিকিৎসক হওয়ার ফলেই রাজদরবারে তাঁর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক না কেন, এটা স্পষ্ট যে পরে আর তিনি আব্বাসী দরবারের কৃপাপাত্র ছিলেন না। খলিফা মুতবক্কিল (৮৪৭—৮৭১ খৃঃ) তাঁর পূর্বের খলিফাগণের ধার্মিক উদারতা ত্যাগ করে 'সনাতনী' মুসলমানগণের পক্ষ অবলম্বন করেন, ফলে বিচার স্বাতন্ত্র্যের ওপর আঘাত শুরু হয়, কিন্দীরও তার শিকার না হয়ে উপায় ছিল না এবং বহুদিন পর্যন্ত তাঁর পুস্তাকালয় বাজেয়াপ্ত ছিল।

কিন্দীর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। তৎকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতির —ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন —সবেরই একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী হওয়ায় সবেতেই তাঁর দখল ছিল। গণিত, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ভূগোল, চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং দর্শনের ওপরেই তিনি বেশী পুস্তক রচনা করেছেন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, একদিকে কিন্দী রসায়নশাস্ত্রকে ভ্রান্ত বলে তাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে নির্বুদ্ধি বলেছেন, অন্যদিকে গ্রহের হাতে মানুষের ভাগ্যকে সমর্পণ করা ছিল তাঁর কাছে বিজ্ঞান।

২. ধর্মীয় বিচার —কিন্দীর সময়ে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার এত বেড়ে গিয়েছিল

যে খোলাখুলি নিজের মতামত প্রকাশ করা বিপজ্জনক ছিল। অতএব কিন্দী যে ধর্মীয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছিলেন তা কতটা আন্তরিক ছিল সে বিষয়ে সতর্কভাবে বিচার করে মতামত দেওয়া উচিত। তিনি যে মোতজলায় কিছু ধর্মীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন তা বোঝা যায়, তবে নেকী এবং ঈশ্বর-অদ্বৈত মতেই তাঁর সর্বাধিক বিশ্বাস ছিল। যথার্থ জ্ঞানের জন্য যুক্তিই (প্রত্যক্ষ, অনুমান) যথেষ্ট, আপ্ত বা শব্দপ্রমাণের বেশী প্রয়োজন নেই, এই ভারতীয় সিদ্ধান্ত ইসলামী দার্শনিকগণের মধ্যেও প্রখ্যাত হয়েছিল। কিন্দী মজহবীর পক্ষ অবলম্বন করে বলেছেন পয়গম্বরী (=আপ্তবাক্য) ও প্রমাণ ; আবার তিনি যুক্তিবাদ এবং শব্দবাদের সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে থেকে যে একটি বাক্য তিনি সর্বধর্মেই পেয়েছেন তা হলো নিত্য, অদ্বৈত, 'মূল-কারণ'-এর বিচার। আমাদের বুদ্ধিজনিত জ্ঞান এই 'মূল-কারণ'-কে সম্পূর্ণ সিদ্ধ (প্রতিষ্ঠিত) করতে সমর্থ নয়। মানুষ যাতে এই 'মূল-কারণ' —অদ্বৈত ঈশ্বর-কে বুঝতে সক্ষম হয় তার জন্যই পয়গম্বর প্রেরিত হন।

৩. **দার্শনিক বিচার** —কিন্দীর যুগের আগে থেকেই নব্য-পিথাগোরাসীয় প্রাকৃতিক দর্শন (প্রকৃতি ব্রহ্মের কায়া, অতএব প্রকৃতির কার্য ব্রহ্মেরই কার্য)-এর বিচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। নিজের গ্রন্থসমূহে অ্যারিস্টটল সম্বন্ধে তিনি অনেক লিখেছেন, কাজেই কিন্দীর দার্শনিক চিন্তায় উপরোক্ত চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল।

(১) যুক্তিবাদ —কিন্দী যুক্তিবাদকে অবশ্যই সমর্থন করতেন, তবে তা আপ্তবাদ (পয়গম্বরবাদ) -এর সুবিধার দিকে নজর রেখে।

(২) তত্ত্ববিচার —(ক) ঈশ্বর —কিন্দী এই বিশ্বকে ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে মেনেছেন এবং কার্য-কারণ নিয়ম ও হেতুবাদকে সমর্থন করেছেন। কার্য কারণের নিয়ম বিশ্বব্যাপী এই কথা বলে তিনি আরও বলেছেন —এই জন্যই আমরা গ্রহ-নক্ষত্রের ভবিষ্যৎ অবস্থিতি এবং তাদের (ফলিত জ্যোতিষ অনুযায়ী) ভালো-মন্দ ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি। ঈশ্বর 'মূল-কারণ' হতে পারেন কিন্তু জগতে কৃত কর্মের সঙ্গে তিনি সরাসরি সম্বন্ধ না রেখে মধ্যবর্তী কারণের দ্বারা কার্যসিদ্ধি করেন। পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা পরবর্তী কার্য হয়, আবার এই কার্য কারণে রূপান্তরিত হয়ে তারও পরবর্তী কার্য সৃষ্টি করে, কিন্তু কার্য কখনও তার পূর্ববর্তী কারণ রূপ ধারণ করতে পারে না বা তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না ; উদাহরণ স্বরূপ —মাটি পিণ্ড প্রস্তুত করে, পিণ্ড হলো কার্য, মাটি তার কারণ, আবার কার্য-পিণ্ড কারণে পরিণত হয়ে কার্যরূপ ঘড়া নির্মাণ করে, কিন্তু ঘড়া দ্বারা পিণ্ডের কোনো রূপদান সম্ভব নয়, পিণ্ডও মাটির কিছু করতে পারে না।

(খ) জগৎ —ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের দুটি প্রকার, প্রকৃতি-জগৎ এবং শরীর-জগৎ। শরীর বা কায়ার উর্ধ্বে সমগ্র জগৎ-ই প্রকৃতি-জগৎ।

(গ) জগৎ-জীবন —ঈশ্বর (মূল-কারণ) ও জগতের মধ্যবর্তী হলো জগৎ-চেতন বা জগৎ-জীবন (বা সমূহ আত্মা)। এই জগৎ-চেতন (নফ্‌স্‌-আলম) থেকেই প্রথমে ফরিস্তা বা দেবতার এবং পরে মানবজীব (মানবাত্মা) সমূহ উৎপন্ন হয়েছে।

(ঘ) মানবাত্মা এবং তার আরাধ্য —জগৎ-চেতন হতে নির্গত মানবাত্মা তার বাসনা-কামনা চরিতার্থের জন্য কায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু স্বীয় স্বরূপে সে দেহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; আর তাই যে পর্যন্ত আত্মার স্বরূপে থাকে সে পর্যন্ত গ্রহের কোনো প্রভাব তার ওপর পড়ে না। আত্মা প্রকৃত, অবিনশ্বর পদার্থ। সে ভাব (=আত্ম) লোক হতে ইন্দ্রিয়লোকে উত্তীর্ণ হয় তবুও তার মধ্যে পূর্বস্থিতির সংস্কার থেকেই যায়, ইহলোকে তার শান্তি মেলে না, কেন না, তার বেশীর ভাগ আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থেকে যায়, যার জন্য তাকে মানসিক পীড়ন সহ্য করতেই হয়। এই চলমান জগতের কোনো বস্তুই স্থির নয়, তাই আমরা জানতে পারি না যে কতদিন আমাদের প্রিয়জন বা প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করতে হবে। একমাত্র ভাবলোকেই (=ঈশ্বরে) এই প্রকার স্থিরতা আছে। যদি আমরা বাসনা পূরণ করতে এবং প্রিয়জন হতে বিচ্ছেদ না চাই তবে আমাদের ঈশ্বর ও তাঁর সনাতন কৃপা, প্রকৃতি-ভাব ও সুকর্মের প্রতি কায়মনোবাক্যে নিবিষ্ট হতে হবে।

(৩) নউস (Nous) **(=ব্রহ্ম)** —Nous একটি গ্রীক শব্দ, যাব অর্থ হলো আত্মা বা নিত্যভাব। এটা গ্রীক দর্শনের একটি প্রধান বিচার্য বিষয়। এই পরমাত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্মের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিন্দীর প্রথম আলোচনাতেই সমস্ত ইসলামী দর্শন-সাহিত্যে Nous-এর চর্চার পথ খুলে যায়। কিন্দী এর চারটি প্রকার ভেদ করেছেন —

(ক) প্রথম ভাব (=ঈশ্বর) —জগতে যতকিছু সনাতন, সত্য, আধ্যাত্মিক (অ-ভৌতিক) তার মূল কারণ ঈশ্বর বা পরমাত্মা।

(খ) দ্বিতীয় ভাব —আত্মার আন্তরিক বা অন্তর্হিত ক্ষমতা —(=বুদ্ধি) মানবাত্মার কোনো কিছুকে বোঝার যোগ্যতা, যার সাহায্যে আত্মা বিকাশিত হতে পারে।

(গ) আত্মার কার্যক্ষমতা —এ হলো সেই গুণ যাকে আত্মা ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারে, যেমন লেখকের লিখন-ক্ষমতা, শিল্পীর চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা।

(ঘ) আত্মার ক্রিয়া —এর দ্বারা আত্মার মধ্যেকার রুদ্ধ বাস্তবিকতা বাহ্য-জগতে প্রকটিত হয় —নিরাকার ক্ষমতা সাকার রূপ ধারণ করে। এই ক্রিয়া শারীরিক, মানসিক উভয় প্রকারেরই হতে পারে।

(৪) জ্ঞানের উদগম —(ক) ঈশ্বর —কিন্দী Nous-এর এই চারটি বিভাগই আত্মার নিজস্ব কাজ বলে মেনেছেন, কিন্তু আত্মার অন্তর্হিত ক্ষমতাকে ঈশ্বরের দান বলে মানেননি এমনকি অন্তর্হিত ক্ষমতাকে কার্যক্ষমতায় পরিণত

করাও ঈশ্বরের কাজ বলে মনে করেছেন, অর্থাৎ কার্যক্ষমতাও ঈশ্বরের দান; আমাদের জ্ঞানের উৎস আত্মা নয় ঈশ্বর। ইসলামী-দর্শনে "ঈশ্বর সমস্ত জ্ঞানের স্রোত" এই সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি সর্বত্র দেখা যায়। প্রাচীন ইসলাম কর্মের মধ্যেও আত্মাকে সর্বদা পরতন্ত্র বলে মানত, জ্ঞানের ব্যাপারে আর কি-ই বা বলার আছে। কিন্দী আত্মার পরতন্ত্রতা থেকে উত্থিত দার্শনিক কাঠিন্যকে বুঝে "ঈশ্বর সরাসরি সকল কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না"—এই সিদ্ধান্ত থেকে তাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ঈশ্বরকে জ্ঞান —যা দার্শনিকগণের কাছে কর্মের চেয়েও মহত্ত্বপূর্ণ —এর স্রোত বানিয়ে ইসলামের ঈশ্বর-পরতন্ত্র সিদ্ধান্তের পুষ্টি সাধন করেছেন।

কিন্দীর Nous বা আত্মা-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত অ্যারিস্টটলের টীকা ভাষ্যকার আলেকজাণ্ডর আফ্রাদিসিয়াসের থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়; কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাঁর 'আত্মা সম্বন্ধে' গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন যে অ্যারিস্টটলের মতে Nous (পরমভাব) তিন প্রকারের। কিন্দী তাঁর চারটি 'প্রকার'-কে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল উভয়ের মতবাদের ওপর স্থাপিত করেছেন। বস্তুত কিন্দীর নিজস্ব মত এই নব্য-পিথাগোরিয় এবং নব্য-প্লেটোনিক রহস্যবাদী দর্শনকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

(খ) ইন্দ্রিয় এবং মন —জ্ঞানের স্রোতকে Nous-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিন্দী আত্মা থেকে বহির্ভূত বলে মানলেও যখন তিনি রহস্যবাদের মধ্যে নেমে এসেছেন তখন তিনি বস্তুস্থিতিকেও মর্যাদা দিতে চেয়েছেন এবং বলেছেন —ইন্দ্রিয় বা চিন্তন (=মানসিক ক্রিয়া কল্পনা) দ্বারা আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত হই। তিনি স্বীকার করেছেন যে ইন্দ্রিয় কেবল ব্যক্তি বা বস্তু-স্বরূপকেই (=স্বলক্ষণ) গ্রহণ করে যা সামান্য বা স্বলক্ষণ নয় তা এর বিষয় নয়। এই-ই হলো দিগ্নাগ-ধর্মকীর্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান —"প্রত্যক্ষ কল্পনাপোঢ়।" (ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত, কল্পনারহিত)। দিগ্নাগ ধর্মকীর্তি সামান্যাদিকে কল্পনামূলক, অতএব 'বস্তুসৎ' (বাস্তব সত্য) বলে মানতে রাজী হননি, যদিও তাকে 'ব্যবহারিক সৎ' (ব্যবহারিক সত্য) বলে মানতে আপত্তি করেননি, কিন্তু কিন্দী চিন্তন দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে 'বস্তুসৎ' বলে মেনেছেন।

(গ) ভাববাদ —যাই হোক, শেষ পর্যন্ত উভয়েই দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে এক জায়গাতেই মিলিত হন, সেই জায়গা হলো বস্তুজগৎ থেকে দূরে —ভাববাদের গোলকধাঁধা। কিন্দী বস্তুত ভাববাদী হলেও খোলাখুলিভাবে অজ্ঞাত যোগাচারের ভাববাদকে স্বীকার করতে চাননি। ঐ ভাববাদ ক্ষণিক না নিত্য সে তর্কে তিনি যাননি বটে কিন্তু ভাবের যে চারটি ভেদ তিনি করেছেন এবং একের মধ্যে অন্যের রূপান্তরের কথা বলেছেন, তাতেই বোঝা যায় যে তিনি নিত্যতাকে মানতেন না। বৌদ্ধ ভাববাদী বা যোগাচারী দার্শনিকগণের ন্যায় কিন্দীর ভাববাদকেও (Nous) আলয়ভাব (=ভাবস্রোত) এবং প্রকৃতিভাব (=ক্রিয়া-পরায়ণ)-এর মনন দ্বারা বুঝতে হবে। বৌদ্ধ এবং কিন্দী উভয়ের ভাববাদেই

"সবকিছুই ভাব, ভাবের বাইরে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই" —এই তত্ত্বকে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং কিন্দী ধর্মকীর্তির সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলেছেন —ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং জ্ঞেয় (বিষয়) এবং এইভাবে মন (কল্পনা) দ্বারা জ্ঞাত পদার্থ (ধর্ম) হলো প্রথম ভাব বা আলয়ভাব (=নিত্য, ব্রহ্ম)। অবশ্য উভয়ের মধ্যে একটি মস্ত পার্থক্যও ছিল, যেখানে নিজের সহধর্মী (মুসলমান) গণের চাপে আতঙ্ক-গ্রস্ত কিন্দীর মন কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট একান্ত উক্তভাব ব্যক্ত করে তৃপ্ত হয়েছিল, সেখানে সহধর্মী (=বৌদ্ধ) গণের অনুরোধে ভীত হয়ে নিজ মত বস্তুবাদের স্থানে ভাববাদকে স্বীকার করে ধর্মকীর্তির হৃদয় গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই যদি কিন্দীর 'আলয়ভাব' এবং 'প্রথম Nous'-এর একতার কথা বলার পর ধর্মকীর্তি বলেন —"আমিই তো বন্ধু ! জেনে শুনেই অসংগের আলয়ভাবকে পরিত্যাগ করেছি, কারণ তিনি স্থিরবাদ এবং ঈশ্বরবাদকে পেছনের রাস্তা দিয়ে ভেতরে নিয়ে এসেছেন।"—তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্দীর দর্শন নব্য-প্লেটোনিক এবং অ্যারিস্টটলের দর্শনের সংমিশ্রণ।

§ ২. ফারাবী (৮৭০ ? -৯৫০ খৃঃ)

১ —জীবনী

ইসলামিক দর্শনের বিকাশে দ্বিতীয় সোপান হলেন আবু-নাসের ইবনে-মুহম্মদ ইবনে-তর্খন ইবনে-উজলগ, আল্-ফারাবী (ফারাবে বসবাসকারী উজলগের পুত্র তর্খন, এর পুত্র মুহম্মদ, এর পুত্র আবু-নাসের)। আবু-নাসেরের জন্ম হয় ফারাব জেলার বসিজ নামক স্থানে। বসিজে একটা ছোটখাট কেল্লার সেনাপতি ছিলেন আবু-নাসেরের পিতা মুহম্মদ। আবু-নাসেরের সম্পূর্ণ নাম দেখলে মনে হয় তাঁর পিতারই মুসলমানী নাম, কিন্তু তাঁর পিতামহ তর্খন এবং প্রপিতামহ উজলগের নাম অ-মুসলমানী —শুদ্ধতুর্কী —অতএব বোঝা যায় যে আবু-নাসের সাধারণ মুসলমান নন, দুই পরম্পরায় তুর্কীজাতীয় মুসলমান। ফারাবীর পিতা ছিলেন ইরাণের সেনাপতি, যার একটাই অর্থ হতে পারে যে, তিনি হয় ছিলেন পর্যটক (৮৭১-৯০৩ খৃঃ) নয়তো কোনো ইরাণী শাসক বংশের কর্মচারী। ফারাবীর বংশ-লতিকা দেখে এটাও অনুমান করা যায় যে, যদিও মধ্য এশিয়ায় স্থাপিত ইসলামী শাসন দেড়শত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল, তবুও সেখানকার সকল অধিবাসী —অন্তত তুর্কীগণ মুসলমান হননি। ফারাবীর দার্শনিক প্রতিভা এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিচার করার সময় আমাদের সেই সময়ের আড়াই শত বৎসর পূর্বে মৃত হিউ এন সাং-এর বর্ণনার কথাও মনে রাখতে হবে, যা থেকে এই প্রদেশের বিখ্যাত সব সঙ্ঘারাম এবং হাজার হাজার শিক্ষিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বিষয় জানা যায়। দুই পর্যায়ের নব্য-মুসলিম

হওয়ার অর্থ, ফারাবীর জন্মভূমিতে আজও কিছু কিছু বৌদ্ধ দার্শনিক পরম্পরা রয়েছে। বক্ষুতটবর্তী এই তুর্কী যে জ্ঞান ও কৃষ্টিতে সমুন্নত ছিল, এতে সন্দেহ নেই।

ফারাবীর প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর পিতৃগৃহেই হয়েছিল। এরপর তিনি তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র বুখারা বা সমরখন্দে গিয়েছিলেন কি-না তা জানা যায় না, তিনি কত বছর বয়সে ইসলামের নালন্দা —বাগদাদে অধ্যয়নে রত হয়েছিলেন তাও অজ্ঞাত। কিন্দী অবশ্য তখন দেহরক্ষা করেছেন কিন্তু জীবিত ছিলেন রাজী। জন্মভূমিতে বুদ্ধিস্বাতন্ত্র্যের হাওয়া তাঁকেও স্পর্শ করেছিল এবং বাগদাদে এসে তিনি যোহন্না ইবনে-হৈলানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যোহন্নার ন্যায় গৈরমুসলিম (অ-মুসলিম) বিদ্বানকে অধ্যাপক রূপে নির্বাচন করা ফারাবীর মানসিক অবসন্নতার কথাই প্রমাণ করে। বাগদাদে বিচার-স্বাতন্ত্র্যের বাতাবরণ —অন্তত মুসলমানগণের সনাতনী সম্মেলনের বাইরে —কিরূপ ছিল, সে পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। ফারাবী দর্শন ছাড়াও সাহিত্য, গণিত, জ্যোতিষ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান-লাভ করেন এমনকি সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়েও লেখালিখি করেন। ফারাবী সত্তরটি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ; তুর্কী ছিল তাঁর মাতৃভাষা, ফারসীভাষা তাঁর জন্মভূমির হাওয়ায় বিকাশিত, আরবী ইসলামের কথ্য ভাষা, ফলে এই তিনটি ভাষায় যে তাঁর অধিকার থাকবেই এ আর কি এমন আশ্চর্য। সন্দেহ নেই যে সিরিয়ানী, ইরাণী, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায়ও তাঁর সমান দখল ছিল।

শিক্ষা সমাপ্তির পর ফারাবী দীর্ঘকাল বাগদাদে ছিলেন, নবম শতাব্দীর শেষ দিকে বাগদাদের খলিফার রাজনৈতিক শক্তির শোচনীয় পতন ঘটে। দেশের প্রান্তিক তথা অন্তবর্তী ভাবী রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রভাব বাগদাদের ওপরেও কথনো কথনো এসে পড়ছিল। হয়ত এ রকম কোনো অস্থিরতার সময়েই ফারাবী বাগদাদ ত্যাগ করে হলব (আলেপ্পো)-এ বাস করা স্থির করেন। হলবের সামন্ত-প্রভু সৈফুদ্দৌল্লা খুব বিদ্যানুরাগী ছিলেন —বিশেষত দর্শনে তাঁর আগ্রহ বেশী ছিল। এই রকম একজন আশ্রয়দাতারই প্রয়োজন ছিল ফারাবীর।

সম্প্রতি বৌদ্ধ থেকে মুসলমানধর্ম গ্রহণকারী দেশ বা পরিবারেই শুধু ফারাবী ভূমিষ্ঠ হননি বরং বৌদ্ধগণের ন্যায় তিনিও শান্তিপূর্ণ একান্ত জীবন-যাপন বেশী পছন্দ করতেন। ইসলামে সুফীগণেরই প্রাধান্য ছিল, যা ছিল তাঁর শরীর ও মনের অনুকূল, তাই ফারাবী সুফী পোশাকই পরিধান করতেন। তাঁর জীবনও অন্যান্য ইসলামিক দার্শনিক অপেক্ষা গ্রীক সোফীস্ট এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জীবনের সঙ্গেই বেশী

ফারাবী ৯৫০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হলব থেকে দামাস্কাসে যান এবং সেই সময়েই সেখানে দেহত্যাগ করেন। হলবের সামন্ত তাঁর কবর সুফী পরিচ্ছদেই আচ্ছাদিত করে দেন। কথিত আছে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আশী বছর।

তাঁর মৃত্যুর ১০ বছর আগেই তাঁর সহকারী (অনুবাদক) আবু-বিশ্রমত্তার দেহান্ত হয়। তাঁর শিষ্য আবু-জকরিয়া-যহ্মা ইবনে-আদী ৯৭১ খৃষ্টাব্দে ৮১ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন।

২—ফারাবীর কীর্তিসমূহ

ফারাবী তাঁর তরুণ বয়সে লিখিত অনেক ছোট ছোট গ্রন্থে তর্কশাস্ত্র; নব্য পিথাগোরাসীয় শারীরিক ব্রহ্মবাদ এবং প্রাকৃতিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর পরিণত জ্ঞানের পরিচয় তিনি অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ অধ্যয়ন ও তার ব্যাখ্যার মধ্যেই দিয়েছেন, যার জন্য তাঁকে বলা হয় 'দ্বিতীয় অ্যারিস্টটল' বা 'হাকিম সানী' অর্থাৎ দ্বিতীয় আচার্য। অ্যারিস্টটলের ভাব-গম্ভীর দর্শন এবং বস্তুবাদী জ্ঞানের (Science) দ্বারা ইউরোপে পুনর্জাগরণ তথা আধুনিক science -এর যুগের প্রবর্তন কতটা প্রভাবিত হয়েছিল, এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে অ্যারিস্টটলের পুনর্মূল্যায়নে ফারাবীর দান অসাধারণ। ফারাবী অ্যারিস্টটলের গ্রন্থসমূহের যে সংখ্যা ও ক্রমনির্ণয় করেছেন তা আজও অক্ষত আছে। অ্যারিস্টটল নামে অন্যান্য কিছু লেখকের রচনা —'অ্যারিস্টটলের ধর্মশাস্ত্র'-কেও ফারাবী এই গ্রন্থক্রমনির্ণয়ে গ্রহণ করেছিলেন। ফারাবী অ্যারিস্টটলের আটটি যুক্তি-শাস্ত্রের ওপর, আটটি সায়েন্স-পুস্তকের ওপর এবং অধ্যাত্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতি গ্রন্থের ওপর টীকা ও বিবরণ লিখেছেন। গ্রন্থগুলি হলো—

১ ॥ যুক্তি-বিদ্যা —

(ক) The Categories
(খ) The Hermeneuties
(গ) The First Analytics
(ঘ) The Second Analytics
(ঙ) The Topics
(চ) The Sophistics
(ছ) The Rhetoric
(জ) The Poetics.

২ ॥ বিজ্ঞান —Physics

(ক) Auscultatis Physica
(খ) De Coela et mundo
(গ) De generatioe et Corruptione
(ঘ) The Meteorology
(ঙ) The Psychology
(চ) De Sensu et Sensato
(ছ) The Book of Plant
(জ) The Book of Animals

৩ ॥ অধ্যাত্ম শাস্ত্র —Metaphysics

৪ ॥ নীতিশাস্ত্র —Ethics

৫ ॥ রাজনীতি —Politics

ফারাবী চিকিৎসাশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত মনোযোগ তর্কশাস্ত্র, অধ্যাত্মশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের (বস্তুবাদ) মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

৩—দার্শনিক বিচার

উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি পড়ে অনুমান করা যায় যে দর্শনের অন্দরমহলে প্রবিষ্ট হওয়ার যে সুযোগ ফারাবী পেয়েছিলেন তা তাঁর পূর্বগামী বা তাঁর পরবর্তী কোনো ইসলামী দার্শনিক পাননি। বক্ষুতট, মেরওয়া, বাগদাদ, দামাস্কাস সবই ছিল দর্শনের পীঠস্থান, অতএব ফারাবী এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন।

(১) প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সমন্বয়—প্লেটোর দর্শন ছিল অ-বস্তুবাদী ভাববাদ এবং অ্যারিস্টটল তাঁর সমূহ দেবতা তথা ভাব (Nous)-কে মেনেও ছিলেন সবচেয়ে বড় বস্তুবাদী। ফারাবী এই পার্থক্যটা অনুভব করেছিলেন, এবং যদি নিরপেক্ষ বিজ্ঞান (Science) ভক্ত হতেন তবে কোনো আলোচনার চেষ্টা করতেন না। কিন্তু ফারাবীর অন্তরে নব্য-প্লেটোনিক দর্শন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, অথচ তাঁর চিন্তাশীল মস্তিষ্ক অ্যারিস্টটলকে ছাড়তেও প্রস্তুত ছিল না; এ রকম পরিস্থিতিতে উভয়ের সমন্বয় সাধনের আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। এমন নয় যে তিনি ইসলামের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তা যদি হতো তবে তাঁর দশাও কাফেরদের মতো হতো। ফারাবীর মতানুযায়ী প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের পার্থক্য শুধু তাঁদেব বর্ণনাশৈলীতে, আসলে উভয়ের ভাবধারা তুল্যমূল্য, উভয়েই উচ্চতম দর্শন-জ্ঞানের ঋষি (ইমাম)। এ কথা বলে দেওয়ার আবশ্যকতা নেই যে ফারাবীর হৃদয়ে এই দুই গ্রীক দার্শনিকের প্রতি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল তা আর কারও প্রতি থাকা সম্ভব ছিল না।

(২) যুক্তি—ফারাবীর মতে যুক্তি-তর্ক শুধু প্রয়োগ (=দৃষ্টান্ত)-সিদ্ধ বিশ্লেষণ মাত্র নয়, জ্ঞানের প্রামাণিকতা তথা কিছু ব্যাকরণগত নিয়মও এর অন্তর্গত। জ্ঞাত এবং সিদ্ধ বস্তুর সঙ্গে অজ্ঞাত বস্তুকে জানাই—প্রমাণসিদ্ধান্ত—হলো যুক্তি।

(৩) সামান্য (=জাতি)—গ্রীক দর্শন এবং তা থেকে গৃহীত পরবর্তী ভারতীয় ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে সামান্যকে একটি স্বতন্ত্র, বস্তুসৎ পদার্থ বলে সিদ্ধ করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। ফারাবী ইসাগোজীর (Isagoge ফোর্ফিরিয়াসের রচিত পুস্তক, যা ভুলক্রমে অ্যারিস্টটলের রচিত বলে মনে হয়েছিল) ওপর লেখার সময়ে এক জায়গায় সামান্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—শুধুমাত্র বস্তু বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারাই নয়, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেও আমরা বিশেষকে প্রাপ্ত হই। এইভাবে সামান্য বস্তু ব্যক্তির মধ্যে কেবল ঘটনা-নির্ভর হয়েই থাকে না, অন্তরের মধ্যেও একটি দ্রব্য-রূপে তা অবস্থিত। এ কথা ঠিক যে মন বস্তু দ্বারাই সামান্যকে কল্পনা করে, তবু এতে সন্দেহ নেই যে সেই বস্তু-পিণ্ডের

(=ব্যক্তি) অস্তিত্ব প্রাপ্তির আগে থেকেই সামান্য (=ব্যক্তিত্ব) সত্তা রূপে অবস্থান করে।

(৪) সত্তা—সত্তা কি ; এই প্রশ্নের উত্তরে ফারাবী বলেছেন—বস্তুর সত্ত স্বয়ং বস্তুই।

(৫) ঈশ্বর অদ্বৈত-তত্ত্ব—ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ফারাবী সত্তাবে ব্যবহার করেছেন। সত্তা দুই প্রকারের হতে পারে—হয় আবশ্যক, নয়তো সম্ভব (বিদ্যমান)। কোনো বস্তুর সত্তা তখনই বিদ্যমান হতে পারে যখন তার কোনে কারণ থাকে। কিন্তু কারণের সিদ্ধান্তকে অদ্বৈত পর্যন্ত বর্ধিত করা যায় না, কেন না শৃঙ্খল সৃষ্টিকারী নিয়ম অনন্ত নয় সান্ত। অতএব আমাদের এমন এক সত্তাকে স্বীকার করা আবশ্যক যিনি স্বয়ং কারণরহিত হয়েও সবকিছুরই কারণ; যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অপরিবর্তনীয়, আত্মতৃপ্ত, পরমশুভ, চেতন এবং পরমসত্ত (ভাব)। তিনি প্রকৃতির সমস্ত কল্যাণ-সুন্দর রূপের—যা কি-না তাঁর নিজেরও রূপ—প্রেমিক। ঐ ঐশ্বরিক সত্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় ন—কারণ তিনি স্বয়ং প্রমাণ ও সত্য—বাস্তবিকতাকে নিজের মধ্যে স্থাপিত করে বস্তুর মূল কারণ রূপে প্রকাশিত হন। এরূপ সত্তার আবির্ভাব যেমন আবশ্যক, তেমনই তাঁর এক—অদ্বৈত—হওয়াও প্রয়োজন। দ্বৈত হলে তাঁর মধ্যে সমানতা এবং অসমানতা উভয়েরই প্রকাশ হবে যার সজ্ঞাতে প্রত্যেকেরই সারল্য বিঘ্নিত হবে। তাই পরিপূর্ণ সত্তার অদ্বৈত হওয়া প্রয়োজন। প্রথম সত্তা কেবল এক তথা বস্তুসং তিনিই ঈশ্বর। সবকিছুর মূল-কারণ সেই এক সত্তায় সকল বস্তুই লীন হয়ে যায়, কোনো ভেদাভেদ সেখানে থাকে না ; তাই এরূপ সত্তার কোনো লক্ষণ নিরূপণ করা যায় না। মানুষ তবুও তাঁর কল্যাণরূপকে ব্যক্ত করার জন্য সুন্দর সুন্দর নামকরণ করে। সুন্দরতম গুণ বা বিশেষণ প্রয়োগ করে। কিন্তু তাঁকে কাব্যিক উপমার সমান করেই জানা দরকার। আমাদের দুর্বল দৃষ্টি, অক্ষম বুদ্ধি এই পরমতত্ত্বের পূর্ণ-প্রকাশকে দেখতে পায় না। বস্তুর অপূর্ণতা আমাদের অনুভূতিকে অসাড় করে রাখে।

(৬) অদ্বৈত-তত্ত্ব থেকে বিশ্বের বিকাশ—পরম সত্তা, অদ্বৈত-তত্ত্ব বা ঈশ্বর থেকে বিশ্বের বিকাশকে ফারাবী ছয়-ছয়টি সোপান এবং শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ; যার মধ্যে প্রথম নিরাকার ছয়টি শ্রেণী হলো—

১. সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যাঁর মধ্যে (পিথাগোরাসীয়) আকৃতিসমূহ অনন্তকাল ধরে অবস্থান করছে।

২. কর্তা পুরুষ থেকেই নয়জন ফরিস্তা বা দেবাত্মা প্রকটিত হন ; এদের মধ্যে প্রথমজন কর্তাপুরুষেরই সমান, তিনি (হিরণ্যগর্ভের ন্যায়) ব্রহ্মাণ্ডের বহুদূর পর্যন্ত সঞ্চালন করেন। এই প্রথম দেবাত্মা থেকেই একাদিক্রমে আটজন ফরিস্তা, দেবাত্মা বা 'অভিমানী' দেবগণ প্রকটিত হন। এই দুই শ্রেণী সর্বদা একত্রিত হয়ে থাকে।

৩. তৃতীয় শ্রেণীতে আছে ক্রিয়াপরায়ণ ভাব (Nous), যাকে পবিত্রাত্মাও বলা চলে। এই ক্রিয়াপরায়ণ ভাব স্বর্গ ও মর্তকে মিলিত করে।

৪. চতুর্থ সোপান আত্মার। বুদ্ধি ও আত্মা এই দুই শ্রেণী অদ্বৈতের স্বরূপে না থেকে মনুষ্যের সংখ্যা অনুযায়ী বহু সংখ্যক হয়।

৫. আকৃতি —পিথাগোরাসের আকৃতি, যা বস্তুতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রকারের বস্তুসৃষ্টিতে সহায়তা করে।

৬. ভৌতিক উপাদান বা বস্তু —পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু রূপের মধ্যে।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি —ঈশ্বর, দেবাত্মা, বুদ্ধি —সদাভাব (Nous) স্বরূপ নিরাকার। পরবর্তী তিনটি —আত্মা, আকৃতি, বস্তু —যদিও মূলত নিরাকার —তথাপি শরীরের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে সম্বন্ধযুক্ত।

দ্বিতীয় ছয়শ্রেণীর সাকার হলো—

১. দেব-কায়—দেহধারী ফরিস্তা বা দেবদূত।

২. মনুষ্য-কায়—শরীরধারী মানব।

৩. পশু (তির্যক)-কায়—দেহধারী পশু-পক্ষী।

৪. বনস্পতি-কায়—বৃক্ষাদি সাকার পদার্থ।

৫. ধাতু-কায়—স্বর্ণ-রৌপ্যাদি সাকার বস্তু।

৬. মহাভূত-কায়—মাটি, জল, অগ্নি, বায়ুর সাকার রূপ।

(৭) জ্ঞানের উদ্গম —কিন্দীর ন্যায় ফারাবীও জ্ঞানকে মানব-প্রযত্নসাধ্য বিষয় না মনে করে ঈশ্বর-প্রদত্ত বস্তু বলেই মনে করেছেন। আত্মার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে ফারাবী বলেছেন —আত্মা শরীরের অস্তিত্বকে পূর্ণতা প্রদান করে ; কিন্তু আত্মাকে পূর্ণতা দান করে পরমভাব (Nous), ঐ ভাবই বাস্তবিক মানব। ঐ মহাভাব শিশুর আত্মায় সুপ্তরূপে থাকে অর্থাৎ তার ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়। ইন্দ্রিয় এবং কল্পনাশক্তি সক্রিয় হলে শিশুর সাকার বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং সুপ্তভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু এই ভাবকে সুপ্ত থেকে জাগরিত অবস্থায় আনয়ন মনুষ্যের স্বীয় প্রযত্নের ফল নয়, বরং এ সেই অন্তিম নবতম দেবাত্মা (চন্দ্র) -দ্বারা প্রকটিত। দেবাত্মাগণ স্বয়ম্ভূ নন বরং নিজ সত্তা প্রকাশের জন্য মূলভাব বা ঈশ্বরের ওপরেই নির্ভরশীল।

(৮) ঈশ্বর থেকে আত্মার সমাগম —ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হওয়াই মানবের লক্ষ্য। ফারাবী একে সম্ভব বলেছেন —শেষ পর্যন্ত মানুষের Nous (ভাব) তার নিকটস্থ অন্তিম দেবাত্মার (চন্দ্র) সঙ্গে সমানতা রাখে। এবং এই দেবাত্মার মধ্যে সমানতাই মূলভাব (= ঈশ্বর)-এর দিকে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ।

এই সাম্য কিভাবে সম্ভব সে বিষয়ে ফারাবীর মত হলো —ইহজীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস হলো বুদ্ধিসম্মত জ্ঞান। কিন্তু মানুষের মৃত্যুর পর তার জ্ঞানী-আত্মা সেইরূপ পূর্ণস্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হয় যা কি-না একমাত্র Nous-এর মধ্যেই সম্ভব।

'দেবাত্মায় বিলীন হওয়ার পর ঐ পুরুষ নিজের ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে না রক্ষা করে? ফারাবী স্পষ্ট ভাষায় এর উত্তর দেননি।—মৃত্যুর পর মানুষ লুপ্ত হয়ে যায়, এক পর্যায়ের পর আসে আরেকটি পর্যায়। প্রত্যেকেই ঠিক তার সদৃশের সঙ্গেই মিলিত হয়—জ্ঞানী আত্মার কোনো দেশের সীমা নেই, অতএব তার সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য কোনো গণ্ডির প্রয়োজনও নেই, যেমন বিচারের ভেতর বিচার, শক্তির মধ্যেই শক্তির মিলনে কোনো সীমা বা পরিমিতির আবশ্যকতা থাকে না। প্রত্যেক আত্মাই তাকে চায় যে তার নিজের মতো, এই চাওয়াই আন্তরিক এবং আনন্দদায়ক।

(৯) ফলিত জ্যোতিষ এবং রসায়নশাস্ত্রে অবিশ্বাস—মহান্ দার্শনিক অ্যারিস্টটলের বিচারকে ব্যাখ্যা করা এবং অনুভব করা ব্যতীত ফারাবীর স্বতন্ত্র দার্শনিক চিন্তনকর্ম খুব বেশী ছিল না; অতএব এ ক্ষেত্রে তাঁর নিকট খুব বেশী কিছু আশা করা যায় না। ফারাবী যদিও ধর্ম এবং রহস্যবাদে কিঞ্চিৎ আতঙ্কিত ছিলেন, তবুও যুক্তি ও স্বতন্ত্রচিন্তন তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে তিনি ফলিত জ্যোতিষ এবং রসায়নশাস্ত্রকে (সেই সময়ে রসায়নের সাহায্যে তাম্রাদি, সস্তা ধাতু থেকে স্বর্ণ-নির্মাণের দ্বারা ধনী হবার প্রবৃত্তি মানুষকে পেয়ে বসেছিল) মিথ্যা মনে করেছেন।

৪—নীতিশাস্ত্র

ফারাবী ঈশ্বরকেই জ্ঞানের উৎস মনে করেছেন। অতএব এটাই সম্ভব যে ফারাবী নীতি—ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যের বিবেককেও ঈশ্বরপ্রদত্ত মনে করতেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে ফারাবী মূলভাব বা ঈশ্বর থেকে বিশ্বের উৎপত্তি-বাদকে কেবল ইসলামের 'কুন্'-এর ন্যায় অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তি এই মতবাদের মতো করেই মানেননি, এমনকি কার্যকারণ সম্বন্ধ থেকেই যে বিকাশ হয় তাও মেনেছেন; যদিও আরোহ নয় অবরোহ-ক্রমেই ভাব থেকে বস্তুতত্ত্বের বিকাশ হয়, তবুও সন্দেহ নেই যে তা অপেক্ষাকৃত বস্তুবাদী। যাই হোক না কেন, তাঁর 'জ্ঞানের উদ্গম'-এর সিদ্ধান্ত অপেক্ষা 'নীতিশাস্ত্রের উদ্গম'-এর সিদ্ধান্ত অনেক বেশী যুক্তিসম্মত। ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি যদিও বা কিছু সময়ের জন্য জ্ঞানকে মানববুদ্ধিজাত বলে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকেন কিন্তু নীতি-বিচারের স্রোতকে তাঁরা ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে মনে করবেনই। ফারাবী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তিনি জ্ঞানের স্রোতকে অ-লৌকিক বলে মেনেছেন, কিন্তু নীতি-নিয়মকে মনুষ্যসৃষ্ট বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন; শুভাশুভ জ্ঞান মানুষের বুদ্ধির ঊর্ধ্বে নয়। জ্ঞানকে ফারাবী কর্মের (আচারের) চেয়ে বড় মনে করেছেন, তাই তার উদ্গমের উৎসকে মানুষের ঊর্ধ্বে রাখতে চেয়েছেন।

শুদ্ধ জ্ঞানকে ফারাবী বলেছেন স্বাতন্ত্র্যের (মানুষের স্বাধীনতার) ভূমি ; কিন্তু তাঁর মতে এই শুদ্ধ জ্ঞান ঈশ্বর-নির্ভর হলে তবেই নিশ্চিত হয়, যার অর্থ দাঁড়ায় মানুষের স্বাতন্ত্র্যও ঈশ্বরাধীন —"তাঁর আদেশ ব্যতীত বৃক্ষের একটি পত্রও কম্পিত হয় না"—এই হলো ফারাবীর সরল ভাগ্যবাদ।

৫—রাজনৈতিক বিচার

ফারাবী প্লেটোর প্রজাতন্ত্র পড়ে অবশ্যই কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি প্লেটোর জগৎ —এথেন্স এবং তার প্রজাতন্ত্রকে সঠিকভাবে চিত্রিত করতে পারেননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজতন্ত্রের বিকল্প কোনো শাসন সম্ভব নয়—একেশ্বরবাদীগণের পক্ষে রাজতন্ত্রের বাইরে যাওয়া সহজসাধ্য নয় তাই ফারাবী প্লেটোর বহু দার্শনিকের প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে একজন আদর্শবাদী দার্শনিক রাজার শাসনাধীন সমাজ-ব্যবস্থাই কাম্য বলে মনে করেছেন। মানুষ তার জীবনচর্যায় পরস্পর-নির্ভরশীল, ভৌগোলিক পটভূমি অনুযায়ী কেউ হয় শক্তিশালী এবং অধিক কষ্টসহিষ্ণু, আবার কেউ বা হয় দুর্বল ; অতএব বিভিন্ন ধরনের মানুষেরই একজন অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজার অধীনতা স্বীকার করা আবশ্যক। ফারাবী রাজ্যের ভালোমন্দের দায়িত্ব রাজার ওপরেই ন্যস্ত করেছেন, তিনি যদি কল্যাণ-শুভ সম্পর্কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, দুরাচারী, অত্যাচারী হন, তবে তাঁরও অমঙ্গল। প্লেটোর ন্যায় দার্শনিক ব্যক্তিই আদর্শ রাজা, তিনি নিজের ন্যায় গুণী ব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ করে শাসনকার্যে সহায়ক করেন। ফারাবী একাধারে শাসকরাজার নিরঙ্কুশতাকে (যদি অঙ্কুশ কিছু থাকে তবে তা দর্শনের) বজায় রাখতে চেয়েছেন এবং নিজে একজন আদর্শবাদী দার্শনিক ছিলেন বলে তাঁর কর্তব্যও নিরূপণ করেছেন। সমস্ত কর্তব্য —অছিগিরির মূল কথা হলো এই যে, রাজ্যের শুভাশুভের জন্য দায়ী একমাত্র রাজাই। মূর্খ-শাসিত রাজ্যের বাসিন্দাগণও নির্বুদ্ধি ও পশুতুল্য হয়। এর সমস্ত দায়ও রাজার এবং সেই পাপে তাঁকে পরলোকে নরকযন্ত্রণা ভোগের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। কিছু বিস্তৃত অর্থে--

"জাসু রাজ প্রিয় প্রজা দুখারী।
সো নৃপ অবশি নরক-অধিকারী ॥" —তুলসীদাস

ফারাবীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যবহার-বুদ্ধিশূন্য ছিল, অবশ্য তার কারণও ছিল। একজন সফল চিকিৎসক হয়ে তিনি ব্যবহারিক গুণ সম্পর্কে অজ্ঞ হবেন তা তো হতে পারে না, শুধু এটুকুই বলা যায় যে তিনি ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা দার্শনিকের কল্পজগৎকেই অধিক পছন্দ করতেন। তাঁর জীবনী বিশ্লেষণ করলেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর জীবনকে একজন বিচারমগ্ন সুফী বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। পার্থিব সম্পদ না থাকলেও আন্তরিক ঐশ্বর্য কোনো

রাজার চেয়ে তাঁর কম ছিল না। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের পুস্তক পাঠ করে তিনি গভীর তৃপ্তি লাভ করতেন এবং অবসর-সময় বিনোদিত করতেন পুষ্পোদ্যানের শোভা দেখে এবং পাখীর কাকলি শুনে। সনাতনী মুসলমানগণ তাঁকে কাফের বলতেন, কিন্তু ফারাবী তাঁদের জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিধি জানতেন, তাঁদের মূর্খ বলে জানার ফলেই তাঁদের মন্তব্যে কোনো মানসিক প্রতিক্রিয়া তাঁর হতো না। পারসীগণের মধ্যে কমবেশী অনেকের নিকট তিনি ছিলেন মহান্ তত্ত্বজ্ঞানী এবং শ্রদ্ধেয়, এটুকুই ছিল তাঁর পক্ষে যথেষ্ট সন্তুষ্টির কারণ। ধর্মীয় পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তিরা ফারাবীর শুদ্ধ সরল জীবনযাত্রা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেননি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক দূরে সরে গেলেও তৎকালীন সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থা থেকে ফারাবীর ভয়ের কোনো কারণ ছিল না।

৬—ফারাবীর উত্তরাধিকারী

ফারাবীর মতো নির্জনতাপ্রিয়, প্রকৃতিপ্রেমিক পণ্ডিত দার্শনিকের নিকট খুব বেশী শিষ্য-সমাগম সম্ভব ছিল না, কাজেই তাঁর শিষ্য-সংখ্যা খুবই কম ছিল। অ্যারিস্টটলের কিছু গ্রন্থের অনুবাদক আবু-জকৃরিয়া যহ্যা ইবনে আদী (ইয়াকুবী পন্থার খৃষ্টান) তাঁর শিষ্য ছিলেন। অনুবাদক ব্যতীত তাঁদের বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলার নেই; কিন্তু ফারাবীর ইরাণী শিষ্য আবু-সুলৈমান মুহম্মদ (ইবনে-তাহির ইবনে-বহরাম আল) সজিস্তানী ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। দশম শতাব্দীর উত্তরার্ধে বাগদাদের খ্যাতনামা বিদ্বানগণ সজিস্তানীর শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সজিস্তানী-গুরু-শিষ্য-মণ্ডলীর দার্শনিক পাঠ এবং সংবাদের কিছু অংশ আজও সুরক্ষিত আছে যা থেকে তাঁদের গম্ভীর দর্শনের গভীরতাকে উপলব্ধি করা যায়। তবুও ফারাবীর তর্কশাস্ত্রের ধারা অনেক এগিয়ে গিয়ে আমাদের নব্য নৈয়ায়িকগণের মতো তত্ত্ব-বিচারের পরিবর্তে শব্দের কারিকুরিকেই প্রাধান্য দিয়েছে। বস্তুত সজিস্তানী শিষ্যমণ্ডলী তর্কশাস্ত্রকে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি-প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করে তাকে শুধু বুদ্ধির মার-প্যাঁচ এবং বাকচাতুর্য হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। এঁদের তত্ত্ববোধ এবং রুচির মধ্যে সুফীর রহস্যবাদও ছিল, যার রহস্যময় জটিলতা ছিল তার্কিকগণের তর্ক অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এই সুফী রহস্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলেই (সজিস্তানী-শিষ্য তৌহিদী ১০০৯ খৃষ্টাব্দে যেমন লিখেছিলেন) আবু-সুলৈমান সজিস্তানী তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় যতটা এম্পিডক্লেস, সক্রেটিস, প্লেটো প্রভৃতি 'রহস্যবাদী' দার্শনিকগণকে নিয়ে চর্চা করেছেন, অ্যারিস্টটলকে নিয়ে ততটা করেননি। সজিস্তানী শিষ্য-মণ্ডলীর

মধ্যে দেশ-জাতি-ধর্মের কোনো সঙ্কীর্ণতা ছিল না, তাঁদের বিশ্বাস ছিল ঐ সমস্ত বৈসাদৃশ্যই বাহ্যিক, সকলের মধ্যে অবস্থিত সত্যই একমাত্র অভিন্ন।

§ ৩. বু-আলী মস্কবিয়া (……১০৩০ খৃঃ)

ফারাবীর যুগ অতিক্রম করে এখন আমরা ফির্দৌসী (৯৪০-১০২০ খৃঃ), (আবু রেহান আল-) বেরুণী (৯৭৩-১০৪৮ খৃঃ) এবং মেহমুদ গজনবীর (মৃত্যু-১০৩৩ খৃঃ) সময়ে উপস্থিত হচ্ছি। ঐ সময়ে শুধু বিচারের নয় শাসনের রজ্জুও নামনিহাদী আরবের হাত থেকে অনারবীয় মুসলমান জাতিদের হাতে চলে গিয়েছিল এবং তাঁরা কবীলাশাহী ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত ও নিম্নশ্রেণী থেকে উত্থিত লোকশক্তিকে নতুন শাসকের (এমন ব্যক্তি, যিনি স্বয়ং দাসত্বের গ্লানি ভোগ করেছিলেন অথবা তাঁর পূর্বপুরুষগণের দাসত্বের দুঃখ ভুলতে পারেননি) নেতৃত্বে সংগঠিত করে ইসলামের অপূর্ণ বিজয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। এ ছিল সেই সময়, যখন ইসলামী শক্তির সঙ্গে হিন্দু শক্তির সরাসরি লড়াই শুরু হয়েছিল এবং হিন্দুরক্ষক পর্বতমালার নাম হয়ে গিয়েছিল হিন্দুকুশ (হিন্দুকুশ্‌ত) কারণ সেখানে হিন্দুগণকে হত্যা করা হয়েছিল। মেহমুদ গজনবী কাবুলের হিন্দুরাজ্য জয় করেই সন্তুষ্ট হননি, ইসলামী পতাকার গৌরব বৃদ্ধির জন্য ভারতের ওপর পুনঃপুনঃ আক্রমণ চালিয়ে যান। বাইরে থেকে দেখলে এগুলিকে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ বলে মনে হবে এবং বিদ্যালয়ের ইতিহাস লেখকেরাও ঘটনাটিকে সেইভাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এই হিন্দু-মুসলমান বিবাদ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না—অবশ্য তৎকালেও একে এইভাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

ইসলামের সূচনা থেকেই তার ওপর আরব কবীলাশাহীর স্পষ্ট ছাপ ছিল; এ কথা আমি আগেই বলেছি এবং এও বলেছি যে দামাস্কাসের খিলাফত তাকে অর্থাৎ ঐ কবীলাশাহীকে প্রথমে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং বাগদাদের খলিফা তাকে কবরস্থ করে দিয়েছিল। এই অবস্থা যতদিন উচ্চপর্যায়ের শাসকবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন ঠিকই ছিল। কিন্তু কবীলাশাহী কোরাণ আজও মুসলমানের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ। তাদের সমস্ত মসজিদ এবং মাদ্রাসায় কোরাণ অবশ্য পাঠ্য। আরবী এবং কবীলাদের সর্দার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সাম্য দেখা যায় কোরাণে তার কোনো স্পষ্ট বিবরণও নেই, কোনো উদাহরণও মানুষের সামনে ছিল না—বরং খলিফা এবং বিত্তবান ব্যক্তি-গণের যে উদাহরণ দেখা গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ এক বিপরীত চিত্রই আমাদের সামনে হাজির করে। অবশ্য কোরাণে ভ্রাতৃত্বের বাণী স্পষ্টভাবেই বারংবার পুনরুল্লিখিত হয়েছে, এমনকি সুলতানগণকেও মসজিদে নমাজ পাঠকালে এই ভাব

প্রদর্শন করতে হতো। যে শক্তির সঙ্গে মুসলমানগণের বিরোধ ছিল তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাবের কল্পনা এমনভাবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের সামাজিক সংগঠন এতই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল যে 'হিন্দুঝাণ্ডা' বা অন্য কোনো নামে তাদের ধরে নেওয়া সেই পরিস্থিতিতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। যদিও তখন ইসলামী ঝাণ্ডা বিশ্বব্যাপী ইসলামী কবীলাদের ঝাণ্ডা ছিল না, তথাপি তারা এই ধারণা অবলম্বন করেই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, যাতে শত্রু দেশের কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয় এমনকি সামাজিক ভিত্তিতেও আঘাত লাগছিল এবং শোষণাশ্রিত জাতপাত ভেদাভেদের ইমারতের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল। মস্কবিয়ার জন্ম হয় এ রকমই একটা সময়ে।

১—জীবনী

মস্কবিয়ার জীবন সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু জানা নেই। তিনি ছিলেন সুলতান আদূদহোল্লার (ব্যায়হি ?) কোষাধ্যক্ষ এবং ১০৩০ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মস্কবিয়া ছিলেন চিকিৎসক ; দর্শন ছাড়া ইতিহাস ও ভাষাশাস্ত্র ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। কিন্তু তাঁকে যা অমরত্ব দান করেছে তা হলো তাঁর লিখিত একটি গ্রন্থ— 'তহ্‌জিবুল এখ্‌লাক্' —(নীতি-সভ্যতা)। এটি রচনাকালে তিনি প্লেটো, অ্যারিস্টটল ও গ্যালেনের গ্রন্থের সঙ্গে ইসলামিক শাস্ত্রের মিশ্রণ ঘটিয়ে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি অ্যারিস্টটলের নিকটই সর্বাধিক ঋণী। মস্কবিয়ার এই গ্রন্থটির আধারেই গজালী তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ— 'অহ্যাউল-উলূম' —রচনা করেন। মস্কবিয়া লোভ, কার্পণ্য, লজ্জাদি অষ্টপ্রকার দুরাচারের কথা বলেছেন। এই দুরাচার হলো নৈতিক ব্যাধি, একে নিরাময়ের জন্য তিনি দুটি উপায়ের কথা বলেছেন —(১) রোগের বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ, যেমন কার্পণ্য দূর করার জন্য অধিক ব্যয় করা ; (২) সমস্ত নৈতিক ব্যাধির মূল —ক্রোধ এবং মোহ-কে উচ্ছেদ করার প্রযত্ন।

২—দার্শনিক বিচার

(মানবাত্মা) —মস্কবিয়া মানবাত্মা এবং পশুর আত্মার মধ্যে পার্থক্য করেছেন, বিশেষত ঈশ্বর ও মানুষের বৌদ্ধিক চিন্তনকে তিনি এত প্রাধান্য দিয়েছেন যাতে পশুর আত্মাকে মানবাত্মার শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। মানবাত্মা এমনই একটা অমিশ্র নিরাকার পদার্থ, যে নিজের সত্তা, জ্ঞান এবং ক্রিয়াকে অনুভব করে। তার স্বভাব যে বস্তুগত নয়, আত্মিক, তার প্রমাণ হলো এই যে, যেখানে বাস্তব

শরীর বিভিন্ন রকম আকৃতির মধ্যে মাত্র এক রকম আকৃতিই গ্রহণ করতে পারে, সেখানে আত্মা কিন্তু একই সময়ে বেশ কয়েকটি আকার গ্রহণ করতে সক্ষম। এমন নয় যে আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথা ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য উভয় প্রকার আকৃতিকেই অবাস্তব স্বরূপে গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা কলমকে আমরা লম্বা দেখি, কিন্তু স্মৃতিতে তার যে আকৃতির ধারণা সুরক্ষিত হয়, তা বাস্তবের মতো লম্বা নয়। অতএব আত্মা বাস্তবিক সীমার মধ্যে বদ্ধ নয়, আত্মার জ্ঞান এবং প্রযত্ন কায়িক সীমা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়-গোচর জগতের সীমাও অতিক্রম করে। সত্য-মিথ্যার জ্ঞান আত্মার সহজাত, ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত নয়। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিচার আত্মা করে ঐ সহজাত ক্ষমতার সাহায্যে। 'আমি জানি' —তা অনুভব করা অর্থাৎ আত্ম-চেতনাই হলো সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, আত্মা একটি অবাস্তব পদার্থ।

৩ —নীতিশাস্ত্র

(১) পাপ-পুণ্য— মস্কবিয়া তাঁর নীতিশাস্ত্রের জন্যই অধিক প্রসিদ্ধ। নীতি-শাস্ত্রের প্রথম প্রশ্ন হলো —'শুভ কি?' মস্কবিয়ার উত্তর —যার দ্বারা একজন ইচ্ছাশীল ব্যক্তি (=প্রাণী) স্বীয় উদ্দেশ্য বা স্বভাবকে পূর্ণ করতে পারে। শুভ হওয়ার জন্য এক বিশেষ ধরনের যোগ্য ও জ্ঞানী হতে হয়। অবশ্য সকলের যোগ্যতা একরকম নয়। সাধারণত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ খুবই কম। যিনি বা যাঁরা স্বভাবত ভালো কখনও তাঁরা খারাপ হতে পারেন না আবার যারা খারাপ তাদের পক্ষেও ভালো হওয়া সম্ভব নয়, কারণ স্বভাব অপরিবর্তনীয়। বাকী সব মানুষ মধ্যম স্তরের। তারা প্রথমেই ভালো অথবা খারাপ থাকে না, সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে তারা ভালো বা মন্দ হয়।

শুভ দুই প্রকারের, সাধারণ শুভ এবং বিশেষ শুভ। এর ওপরে আছেন এক পরম শুভ, তিনি হলেন পরম সৎ (=ঈশ্বর) এবং মহত্তম জ্ঞান। সমস্ত শুভই ঐ পরম শুভের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, সমস্ত ব্যক্তিরই কৃত বিশেষ কোনো শুভকর্মের মধ্যে তার আনন্দ এবং প্রসন্নতা প্রকাশিত হয়। এই আনন্দ আর কিছুই নয়, নিজেরই মুখ্য স্বভাবের সজীবতা ও পূর্ণতার প্রকাশ, নিজেরই অন্তস্তম অস্তিত্বের পূর্ণ উপলব্ধি।

(২) সমাজের মহত্ত্ব —মানুষ তখনই সুখী এবং কল্যাণময় হয়, যখন তার আচরণ হয় মানবিক —শুভাচারই মানুষের মহনীয়তা। সমাজের সব মানুষ এক-রকম নয়, কাজেই শুভ এবং আনন্দের অনুভূতিও এক একজনের এক একরকম। যে স্বভাবত মন্দও নয় ভালোও নয়, এমন কোনো মানুষকে যদি একাকী রেখে দেওয়া যায়, তবে শুভ হওয়ার কোনো সুযোগ তার থাকে না, অতএব মানুষের যূথবদ্ধ সমাজ গঠন করে বাস করা কর্তব্য। এ-ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমস্ত

রকম শুভাচরণ তথা মানবজাতির প্রতি প্রেম, এ ছাড়া কোনো সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত মানুষের সঙ্গে থেকেই মানুষ সেই সাহচর্য দ্বারা নিজের অন্তরের অভাব পূর্ণ করতে পারে, অতএব সামাজিক আচারই হলো আসল আচার। আত্মপ্রেমের সীমাকে সঙ্কুচিত করে, প্রেমকে বিস্তৃত করতে হবে বাইরে প্রতিবেশীদের মধ্যে। এই প্রেম বা বন্ধুত্ব সংসারত্যাগী, নির্জনে বসবাসকারী সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব নয়, এ কেবল সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। যে নিভৃতগুহাবাসী সাধু মনে করেন যে তিনিই সমস্ত কল্যাণ-শুভ বিতরণ করছেন তিনি আসলে নিজেকেই ধোঁকা দেন; তিনি ধার্মিক হতে পারেন, কিন্তু নীতিধর্মী নন, কারণ নীতিধর্মী হতে গেলে তাঁকে সামাজিক হতেই হবে।

(৩) ধর্ম—মস্কবিয়ার মতে মানুষের নীতিশিক্ষার সবচেয়ে বড় উপায় হলো ধর্ম, উদাহরণ স্বরূপ নমাজ পাঠ এবং হজযাত্রার মাধ্যমে লোকপ্রেমকে বড় করে দেখা যায়, ঈশ্বর তথা মানুষকে ভালোবাসার এগুলি একটি উপায়।

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার অভাব এবং মানবজীবনে সমাজকে বহু উচ্চে স্থান দেওয়া থেকে বোঝা যায় মস্কবিয়ার দৃষ্টি কত গভীর এবং ব্যাপক ছিল।

§ ৪. বু-আলী সীনা (৯৮০-১০৩৭ খৃঃ)

ফারাবী তাঁর গভীর অধ্যয়ন এবং প্রতিভার বলে দর্শনের ক্ষেত্রে যতটা কাজ করতে পারতেন তাঁর শান্ত ও নিষ্ক্রিয় স্বভাবের জন্য ততটা পারেননি। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ছিলেন একজন মহান্‌ পণ্ডিত। এখন বু-আলী সীনা সম্বন্ধে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে তাঁর জন্যই প্রাচ্যে ইসলামী দর্শন উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। বু-আলী সীনা ছিলেন মস্কবিয়া, ফির্দোসী এবং আলবেরুণীর সমসাময়িক। মস্কবিয়ার সঙ্গে উপহার-বিনিময় এবং আলবেরুণীর সঙ্গে পত্রালাপও তাঁর হয়েছিল।

১. জীবনী

আবু-আলী-আল-হুসৈন (ইবনে-আবদুল্লা ইবনে-)-সীনা ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বুখারার নিকট অফসনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের লোক পর্যায়ক্রমে ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তিনি স্বগৃহেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। যদিও মধ্য এশিয়ার এই অঞ্চলে প্রায় তিন শতাব্দী ধরে ইসলামী প্রভুত্ব চলে আসছিল, তবু মনে হয় এখানকার সভ্য জাতিকে তলোয়ারের সামনে যত সহজে মাথা নত করতে বাধ্য করা গিয়েছিল, তাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব তথা রাষ্ট্রীয় সভ্যতাকে বিসর্জন দেওয়ানো তত সহজ হয়নি। আমরা দেখেছি ফারাবী ইসলামের নির্ধারিত

সীমাকে দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে আদৌ পছন্দ করেননি; তিনিও ছিলেন সীনার স্বদেশবাসী। শুধু তাই-ই নয়, তাঁদের মাতৃভূমি বর্তমান উজবেকিস্তান (সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র) কত সহজে চান্দ্রবর্ষের মধ্যেই ধর্ম এবং মোল্লা-শাসনের সীমা অতিক্রম করেছিল তা আমরা জানি; আর আজ সোভিয়েত দেশই মধ্য এশিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল জাতি হিসেবে পরিচিত। এতেই বোঝা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও ইসলাম উজবেকিস্তানবাসীগণের জাতীয় চেতনাকে নষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। অতএব ঐ রকম সামাজিক পরিস্থিতি সীনার বিচার-ধারার বিকাশের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। সীনা স্বয়ং লিখেছেন যে বাল্যকালে আমার পিতা ও পিতৃব্যকে পরমভাব (Nous) সিদ্ধান্তের ওপর গভীর আলোচনা করতে দেখতাম এবং আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তা শুনতাম।

প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সীনা মধ্য-এশিয়ার ইসলামিক নালন্দা বুখারায় পড়াশোনা করতে যান। (বুখারা বস্তুত বিহার শব্দের বিকৃত রূপ। নালন্দার আর্য মহাবিহারের ন্যায় এখানেও 'নববিহার' নামে একটি শক্তিশালী বৌদ্ধ শিক্ষণালয় ছিল। যেভাবে নালন্দা থেকে ঐ অঞ্চলের একাংশের নাম হয়ে গিয়েছিল বিহার, সেই ভাবেই 'নববিহার' থেকে নগরের নাম হয়ে যায় বিহার বা বুখারা)। এখানে সীনা বিশেষভাবে দর্শন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 'ভবিষ্যতের আভাস আগে থেকেই পাওয়া যায়' —এই প্রবাদবাক্য অনুযায়ী তরুণ বু-আলী সীনা মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে স্থানীয় রাজা নূহ্‌ ইবনে মনসুরকে রোগমুক্ত করেন। এতে তাঁর সবচেয়ে লাভ হয়েছিল এই যে রাজ-গ্রন্থাগারের দরজা তাঁর জন্য সর্বদাই খোলা থাকত। তখন থেকে সীনা বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং চিকিৎসা বিদ্যা অনুশীলন এবং প্রয়োগে নিজেই নিজের গুরু হয়ে বসেন। এতে তিনি কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করব। তবে এ-কথা ঠিকই যে, অত্যন্ত অল্প বয়সেই বিদ্যার্জনের প্রচলিত রীতি থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি দর্শনের গতানুগতিক টীকাকার—ভাষ্যকার না হয়ে স্বতন্ত্রভাবেই গ্রীক-দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়নের দ্বারা স্ব-শৈলীকে বিকাশিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঐ সময় যশাকাঙ্ক্ষী বিদ্বান ব্যক্তির স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনো শাসকের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন হতো। সীনাকেও এরূপ পথই নিতে হয়েছিল। হতে পারে তিনি নিজের প্রতিভা এবং জ্ঞানের দৌলতে কোনো বড় দরবারে অবস্থিত হয়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং আত্মমর্যাদাবোধ এত প্রখর ছিল যে, কোনো বড় দরবারে রাজার মন জুগিয়ে চলতে পারতেন না, বরং ছোটখাট দরবারেই তিনি সহজভাবে মিশতে পারতেন, অতএব নিজের গতিবিধি তিনি ঐ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। অবশ্য সেখানেও যদি তাঁর সঙ্গে

সামান্যতম মতবিরোধও হতো তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করতেন। বিভিন্ন ধরনের কাজ তিনি বিভিন্ন দরবারে করেছেন ; কোথাও শাসনকার্যে অংশ নিয়েছেন, কোথাও বা করেছেন অধ্যাপনা, কোথাও হয়েছেন লেখক। শেষে এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি হাজির হন হমদানে (পশ্চিম ইরাণ) এবং সেখানকার শাসক শামসুদ্দৌল্লা তাঁকে উজীর পদ দান করেন। শামসুদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সীনাকে কয়েক মাসের জন্য কারাদণ্ড দিয়েছিলেন —কারণ সীনা তাঁর বংশগত ঐতিহ্যমতো কোনো রাজা বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে খোসামোদ করতে শেখেননি। মুক্তিলাভের পর তিনি ইস্পাহানের শাসক আলাউদ্দৌল্লার দরবারে আসেন। আলাউদ্দৌল্লা হমদান অধিকার করলে আবুসীনাও আবার সেখানে যান এবং ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে, মাত্র ৫৭ বছর বয়সে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আজও সেখানে তাঁর সমাধি রয়েছে। হমদান ছিল ইরাণের প্রথম রাজবংশের (মদ্রবংশ) প্রথম রাজা দেবকের (দয়উক্কু, মৃত্যু-৬৫৫ খৃঃ পূঃ) রাজধানী।

২. কৃতি

সীনা গ্রীক দার্শনিকগণের রচনার ওপর কোনো টীকাভাষ্য রচনা করেননি। তিনি মনে করতেন টীকা ও বিবরণ প্রচুর রচিত হয়েছে, অতএব প্রয়োজন হলো মূল রচনার বিচার করে নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌছানো। তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌছে-ছিলেন তাই তিনি নিজের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত দর্শন গ্রন্থের মধ্যে প্রধান তিনটি হলো—

(১) শফা (=চিকিৎসা) (আবু-আবীদী জোজজানীকে পড়াবার সময় রচিত)। (২) ইশারাত (=সঙ্কেত)। (৩) নজাত (=মুক্তি)। এগুলির মধ্যে শফা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন যে 'এখানে আমি অ্যারিস্টটলের কিছু মতকে তালিকাভুক্ত করেছি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এখানে আমার নিজের বক্তব্য কিছু নেই।' যেখানে 'পয়গম্বরী', 'সন্ন্যাসত্ব'-এর আলোচনা করা হয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই অ্যারিস্টটলের দর্শনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এইভাবে 'ইশারাত'-এর মধ্যেও পয়গম্বরী, পাপের উৎপত্তি, প্রার্থনার প্রভাব, উপাসনা কর্তব্য, অলৌকিকত্ব প্রভৃতির ওপর যা লেখা হয়েছে, তা গ্রীকদর্শন নয় ইসলামী দর্শনের সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত। সীনার একজন কঠোর সমালোচক ছিলেন রোশদ (১১২৬-১১৯৮ খৃঃ)। তিনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে সীনা কোনো কোনো জায়গায় অ্যারিস্টটলের বিরোধিতা করেছেন, কোথাও বা তাঁর ভাবকে ত্রুটিপূর্ণ করে প্রকাশ করেছেন, কোথাও বা অ্যারিস্টটলের নামে নতুন মন্তব্য সংযোজিত করেছিলেন। এই সবের শুধু একটাই অর্থ হয় যে, সীনা ছিলেন মুক্তবুদ্ধির মানুষ।

সীনা তাঁর জীবনে একটি মুহূর্তও নিষ্ক্রিয় থাকেননি। ১৭ থেকে ৫৭

বছর বয়সের এই ৪০টি বৎসর, তার প্রতিটি ঘণ্টাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। দিনের বেলা সরকারী অফিসারের কর্তব্য পালন করতেন অথবা ছাত্র পড়াতেন, সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বিবিধ প্রসঙ্গালোচনা করতেন ; কিন্তু রাত্রিতে তাঁর হাতে থাকত কলম এবং যাতে ঘুম না আসে তার জন্য সামনে থাকত মদের পাত্র। তাঁর গ্রন্থের বিষয় নির্ধারিত হতো সময় ও সুবিধা অনুযায়ী, পড়াশোনা করার প্রচুর অবসর এবং নিকটে লাইব্রেরী থাকলে চিকিৎসাশাস্ত্র এবং দর্শনের ওপর বড় বই লিখতে শুরু করতেন। যখন পরিভ্রমণ করতেন তখন ছোট ছোট গ্রন্থ রচনা করতেন। জেলে বসে কবিতা এবং ধ্যান (রিয়াজত)-এর বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর কবিতাগুলিতে এবং সুফী নিবন্ধগুলিতে যথেষ্ট প্রসাদগুণ আছে। পদ্য-রচনায় তাঁর এমন অধিকার ছিল যে ইচ্ছে করলে বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র অথবা তর্কশাস্ত্রও তিনি পদ্যে লিখেতে পারতেন। পারসী ও আরবী এই দুটি ভাষার ওপরেই তাঁর পূর্ণ অধিকার ছিল।

৩. দার্শনিক বিচার

সীনা একাধারে ছিলেন দার্শনিক এবং চিকিৎসক। রোশদ দর্শনক্ষেত্রে তাঁর কীর্তিচ্ছটাকে কিছুটা ম্লান করে দিয়েছিলেন, তবু চিকিৎসক-আচার্য হিসেবে ইউরোপ বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে।

(১) মিথ্যা-বিশ্বাস বিরোধ —সীনা তাঁর পূর্ববর্তী ইসলামী দার্শনিকগণের থেকে বেশী মাত্রায় ফলিতজ্যোতিষ এবং রসায়নশাস্ত্রের —ঐ সময়কার দুটি প্রচণ্ড মিথ্যা বিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন। তিনি একে মূর্খতা বলে মনে করতেন। যদিও এর মানে এই নয় যে, মানুষ চোখ বুজে অর্থাৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করেই এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অবশ্য, তাঁর বুদ্ধিবাদ বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিবাদ —প্রয়োগসিদ্ধ সিদ্ধান্তই সত্য —তা কখনোই ছিল না দার্শনিকের বুদ্ধিবাদ, যাতে ইন্দ্রিয়কে ভুল পথে চলা থেকে রক্ষা করার জন্য যুক্তি ও তর্করূপ অস্ত্রকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধির জন্য তর্ক অপরিহার্য কিন্তু যিনি দিব্য-প্রেরণা প্রাপ্ত হন তাঁর তর্কের আবশ্যকতা নেই, যেমন নিরক্ষর বদ্দুর নিকট আরবী ব্যাকরণ অপ্রয়োজনীয়।

(২) আত্মা-প্রকৃতি-ঈশ্বরবাদ —ফারাবীর মতো সীনাও প্রকৃতি (মূল ভৌতিক উপাদান) ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন বলে মানতেন না, তাঁর মতে ঈশ্বর এক উচ্চ সত্তা, তাঁকে প্রকৃতি রূপে পরিণত বলে মানার অর্থ দাঁড়ায়, তাঁকে নীচে টেনে নামানো। এইভাবে আত্মাকেও তিনি ঈশ্বর থেকে নীচে কিন্তু প্রকৃতি থেকে উর্ধ্বে অবস্থিত এক পদার্থ বলে মেনেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টির অর্থ হলো কর্তা (=ভগবান) অনাদি (=অকৃত) প্রকৃতিকে সাকার রূপদান করেন।

সীনা এবং অ্যারিস্টটলের মতের পার্থক্য এইটুকুই যে, অ্যারিস্টটল প্রকৃতির অতিরিক্ত আকৃতিকেও অনাদি বলে মেনেছেন এবং মনে করেছেন যে ভগবান প্রকৃতি ও আকৃতিকে মিলিয়ে সাকার-জগৎ এবং বস্তু সৃষ্টি করেন। সীনা প্রকৃতিকেই শুধু অনাদি বলে মেনেছেন আকৃতিকে নয়, এই সিদ্ধান্তের জন্যই সনাতনী মুসলমানগণ তাঁকে কাফের আখ্যা দিয়েছিলেন ও ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বাগদাদের খলিফা মুস্তনজিদ সীনার গ্রন্থগুলি অগ্নিদগ্ধ করেন।

(৩) **ঈশ্বর**—অনাদি প্রকৃতি নিরাকার, ঐ অবস্থায় জগৎ তথা তার সাকার বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। অতএব জগৎকে অস্তিত্বমণ্ডিত করার জন্য একটি সত্তার প্রয়োজন এবং সেই অমোঘ সত্তাই ঈশ্বর। ঈশ্বর-সিদ্ধির জন্য সীনার এই যুক্তি অ্যারিস্টটলের বিপরীত। অ্যারিস্টটল বলেছেন আকৃতি ও প্রকৃতি দুই-ই অনাদি, উভয়ের মিলনেই সাকার জগতের উদ্ভব। এই মিলনের কাজে চাই গতি, যা জগতের চিরন্তনতা বজায় রাখে এবং যাকে চালনা করার জন্য একটি শক্তির প্রয়োজন, ঐ চালকশক্তিই ঈশ্বর।

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁকে অনেক বিশেষণে ভূষিত করা গেলেও মনে রাখা দরকার যে ঈশ্বর অদ্বৈত, এই বিশ্বাস যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

(৪) **আত্মা ও দেহ**—গ্রীক দার্শনিক এবং তাঁদের অনুগামী ইসলামী দার্শনিকগণের ন্যায় সীনাও ঈশ্বর থেকে প্রথমভাব, তা থেকে দ্বিতীয়ভাব প্রভৃতি উৎপত্তির বর্ণনা করেছেন; এ আমি বহুবার আলোচনা করেছি, কাজেই পুনরাবৃত্তির দরকার নেই। সীনা আত্মাকে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, এর সঙ্গে ভারতীয় দর্শন (সেশ্বর সাংখ্য)-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কাবুলে যখন মেহ্‌মুদ হিন্দু শাসন উচ্ছেদ করে নিজ শাসন স্থাপন করেছিলেন সেই সময়ে সেশ্বর সাংখ্যের অনুগামীদের সঙ্গে সীনার পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয় অথবা এই ধরনের কোনো ভারতীয় দর্শনগ্রন্থের আরবী অনুবাদ তার কাছে ছিল যা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে তিনি তাঁর দর্শনে আত্মার ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। এর জন্য তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন-গ্রন্থের নামকরণই করেন 'সফা' যার ভাবার্থ হলো আত্মার চিকিৎসা।

সীনা দেহ এবং আত্মাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি পদার্থ বলে মনে করতেন। সমস্ত পিণ্ডই এমনকি মানবদেহও বস্তু থেকে উদ্ভূত; অবশ্য সেখানে মাত্রার সংমিশ্রণ খুব সযত্নে হয়েছে, এইভাবে মিশ্রণের দ্বারা মানবজাতির সৃষ্টি বা বিনাশ সম্ভব। কিন্তু আত্মা এইভাবে বস্তুর মিশ্রণ দ্বারা সৃষ্ট নয়। আত্মা শরীরের অভিন্ন অংশ নয়, শরীরের সঙ্গে পরে তার সংযোগ ঘটেছে। প্রত্যেকটি শরীরের নিজ-নিজ আত্মা উপর থেকে আসে। প্রথম থেকেই প্রত্যেক আত্মা পৃথক বস্তুরূপে থাকে। শরীরে অবস্থান করে সারা জীবন ধরে আত্মা নিজের ব্যক্তিক বিকাশকে বজায় রাখে।

আত্মার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হলো মনন। পঞ্চ বাহ্যিক এবং পঞ্চ আন্তরিক ইন্দ্রিয় দ্বারা (=অন্তঃকরণ) জগতের জ্ঞানকে ভাবময় আত্মা অবগত হয় এবং তার থেকে চূড়ান্ত জ্ঞানাত্মক সিদ্ধান্ত (=বোধ) করে। (বেদান্তবাদীগণের চতুর্বর্গ—মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকারের ন্যায় সীনাও অন্তঃকরণকে পঞ্চবর্গে ভাগ করেছেন (১) হিস্‌সহ-মুস্তরক (সম্মিলিত অন্তঃকরণ), (২) হিফ্‌জ মুম্বই (জ্ঞানময়) প্রতিবিম্বের সামূহিক স্মৃতি, (৩) ইদ্রাক্‌ লাশউরা (জ্ঞানের আংশিক পরিচয়), (৪) ইদ্রাক্‌ শউরা (জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিচয়), (৫) হিফ্‌জ মআনি (উচ্চ পরিচয়ের স্মৃতি)। বোধশক্তি তথা বুদ্ধি আত্মার ক্ষমতার চরম সীমা। প্রথমে বুদ্ধির মধ্যে চিন্তন ক্ষমতা গুপ্ত থাকে, কিন্তু বাহ্যিক ও আন্তরিক ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রস্তুত জ্ঞান-সামগ্রী তার গুপ্ত ক্ষমতাকে প্রকট করে কার্যক্ষমতায় রূপায়িত করে, অবশ্য এখানে দ্বিতীয়ভাব (Nous) তথা আকৃতিদাতার প্রেরণাও থাকে; সে-ই বুদ্ধিকে বিচার ক্ষমতা প্রদান করে। মানবাত্মার স্মৃতি কখনোই শুদ্ধ নিরাকার নয়, কারণ স্মৃতিযুক্ত হওয়ার জন্য সাকার আধারের প্রয়োজন।

ভাবময় (মানব) আত্মা তার নিম্নে অবস্থিত বস্তুর প্রভু হতে পারে কিন্তু উচ্চ-স্তরের জ্ঞান লাভ তার জগতাত্মা (=দ্বিতীয় Nous) দ্বারাই সম্ভব। এইভাবে উচ্চ ও নিম্ন জ্ঞান দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মানুষ নামের যোগ্য হয়। তবু পদার্থরূপী ঐ মানবাত্মা এক অমিশ্রিত, অবিনশ্বর, অমৃত বস্তু। যতদিন পযন্ত মানবাত্মা শরীরে বর্তমান থাকে ততদিন সে অধিক শিক্ষিত, অধিক বিকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু শরীরের মৃত্যু হলে আত্মাও জগতাত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এই জগতাত্মার সমীপতা—সমানতা নয়—শুভজ্ঞান সম্পন্ন আত্মার পরম সম্পদ। অন্যান্য আত্মাগণ ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, তাদের জীবন অনন্ত দুঃখময়। শারীরিক বিকার যেমন রোগোৎপত্তির কারণ তেমনই আত্মার বিকারও দণ্ডনীয়। স্বর্গলাভও মানবাত্মা সেই পরিমাণে করে যে পরিমাণে আত্মা তার আত্মিক স্বাস্থ্য—বুদ্ধিকে তার শরীরের মধ্যে বিকাশিত করে। বোধের উচ্চতম স্তরে খুব কম মানবাত্মাই পৌঁছায় কারণ, সত্যের শিখরে সকলের জন্য স্থান নেই।

(৫) হই-এর কাহিনী—আমাদের এখানে বেদান্ত এবং আধ্যাত্মিক বিষয়কে বোঝানোর জন্য যেমন 'সঙ্কল্প-সূর্যোদয়'-এর মতো নাটক লেখা হয়েছিল, সীনাও তেমন 'হই ইবনে-একজান' বা 'প্রবুদ্ধ-পুত্র জীবক'-এর কাহিনী লিখে সেই শৈলীকেই অনুসরণ করেছেন। জীবক তাঁর বাহ্যিক ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সহায়তায় পৃথিবী এবং স্বর্গের বৃত্তান্ত জানার চেষ্টায় ইতস্তত পরিভ্রমণ করছিলেন। তরুণগণকে আগ্রহ-উৎসাহে ভরপুর করে তোলেন এমন একজন বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। ঐ বৃদ্ধ আর কেউ নন, একজন জ্ঞানী আচার্য—দার্শনিক; যিনি পথপ্রদর্শকের ন্যায় সঠিক পথ নির্ণয় করে দিতে চাইতেন। বৃদ্ধের নাম হই, তাঁর পিতার নাম জাগৃত বা প্রবুদ্ধ। ভ্রান্তপথের যাত্রীদের সামনে দুটি মার্গ আছে

—(১) পশ্চিমের পথ, যে কি-না সাংসারিক বস্তু এবং পাপের দিকে নিয়ে যায়; (২) দ্বিতীয় পথ মানুষকে উদীয়মান সূর্যের দিকে নিয়ে যায়, এই পথই হলো শুদ্ধ আকৃতি এবং আত্মার পথ। দুই পথিকদের সেই নবোদিত সূর্যের পথে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে দিব্যজ্ঞানের শিখরে উপনীত হওয়া যায়, যেখানে চির-তারুণ্য বিরাজমান, যেখানে সৌন্দর্যের যবনিকা সৌন্দর্যই, জ্যোতির ঘোমটা জ্যোতি, সেখানেই সেই অনন্ত রহস্যের নিবাস।

(৬) উপদেশে অধিকারীভেদ—আত্মা এবং প্রকৃতিকেও ঈশ্বরের ন্যায় সনাতন বলে মানা, কোরাণের অনেক বাণী, সীনা নিজের মনোমতো করে এমন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, তিনি কাফের বলে পরিচিত হয়ে জীবন্ত কবরস্থ হতে পারতেন, এই বিপজ্জনক দিকটা সীনা বুঝতেন। তাই তিনি এই কথার ওপর জোর দিয়েছিলেন যে সর্বপ্রকার জ্ঞান সকলকে নির্বিচারে দান করা অনুচিত। জ্ঞান বিতরণ কালে গুরুকে তাঁর শিষ্যের যোগ্যতার দিকে নজর রেখে যে যে-প্রকার জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার যোগ্য তাকে সেই প্রকার জ্ঞানই দান করতে হবে। পয়গম্বর মুহম্মদ আরবের খানাবদোস বদ্দুদের সভ্য জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন; তিনি দেখেছিলেন বদ্দুদের নিকট আত্মিক আনন্দের ব্যাখ্যা করতে যাওয়া আর 'উলুবনে মুক্তো ছড়ানো' একই ব্যাপার; তাই তিনি তাদের বলেছিলেন: "শেষ বিচারের দিন মৃতও জীবিত হয়ে ওঠে।" বদ্দুরা বুঝল, আমাদের এই প্রিয় শরীর চিরদিনের জন্য নষ্ট হয় না, এমনকি তা আবার ফিরে পেতে পারি এবং সেইজন্য এটা তাদের কাছে ছিল আশা ও আনন্দের কথা। স্বর্গের দুধের পুকুর, আঙুর-বাগিচা, অপ্সরা প্রভৃতি বদ্দুদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু যদি কোনো জ্ঞানী-গুণী, যোগী, দার্শনিকের কাছে স্বর্গের ঐ বর্ণনা দেওয়া হয় তবে তা আকর্ষণ সৃষ্টি না করে ঘৃণাই সৃষ্টি করবে। কারণ, জ্ঞানী দার্শনিকগণ স্বর্গ বা অপ্সরাদের কামনা করে ঈশ্বরোপাসনা করেন না; তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ভগবৎ-প্রেমানন্দ, ব্রহ্মনির্বাণ লাভ।

৪. আলবেরুণী (৯৭৩—১০৪৮ খৃঃ)

মেহমুদ গজনবীর সমসাময়িক পণ্ডিত আবু-রেহান আলবেরুণীর নাম ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে—বিশেষত 'আল-হিন্দ'-এ দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তবুও দর্শনের অতিরিক্ত ভূগোল, জ্যোতিষ, গণিত মানব-শাস্ত্রও ছিল তাঁর বিষয়। আর্যভট্টের অনুগামীগণের মতকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন—

"সূর্যের কিরণে যা প্রকাশিত হয় তা-ই আমাদের কাছে পর্যাপ্ত। তারও পরে যা আছে তা বহুদূর পর্যন্ত সফল হতে পারে, কিন্তু আমাদের নিকট প্রয়োগযোগ্য

নয়। সূর্যরশ্মি যেখানে পৌঁছায় না, সেখানে ইন্দ্রিয়ের কোনো গতি নেই, অতএব সে স্থান সম্বন্ধে কিছু জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

এতেই বোঝা যায় আলবেরুণীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল।

খ. ধর্মবাদী দার্শনিক

§ ৫. গজালী (১০৫৯-১১১১ খৃঃ)

এখন আমরা সেই যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করব, যখন বাগদাদের খলিফার সম্মান শাসক হিসেবে নয়, ধর্মাচার্য হিসেবেই অধিক ছিল। বিশাল ইসলামী রাজ্য তখন ছিন্নভিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুলতানীতে পরিণত হয়েছিল। এশিয়ার এই সুলতানী রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল সলেজুর তুর্কী রাজ্য। এর শাসক তোগ্রল বেগ (১০৩৭-১০৬২ খৃঃ) হিজ্‌রী সন ৪২৯, অর্থাৎ ১০৩৬ খৃষ্টাব্দে সীস্তানের রাজধানী তুসপর অধিকার করেন. এবং ক্রমশ সমগ্র ইরাণ জয় করে ৪৪৭ হিজ্‌রী সনে (১০৫৪ খৃঃ) ইরাকও অধিকার করেন। তোগ্রলের পরে অর্সলন (১০৬২-১০৭২) এবং তাঁর পরে প্রথম মালিক শাহ্‌ (১০৭২-১০৯২) সম্রাট হন। মালিক শাহ্‌-এর শাসন কালে সলেজু-বংশের ভাগ্যরবি ছিল মধ্য গগনে। মালিক শাহের রাজ্যসীমা পূর্বে চীন সীমান্তে কাসগর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে জেরুজালেম থেকে কুস্তুন্তুনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এটা ছিল তুর্কী শাসনের প্রারম্ভিক যুগ এবং তুর্কের তুর্কীশাসন এবং খিলাফতের অগ্রদূত।

এই চিরশাসিত ইসলামিক অঞ্চলে এবার ইসলামিক প্রগতিশীলতা নষ্ট হয়ে গেল। এখন আর তারা দীন-দরিদ্রের পরম বন্ধু তথা ধনী সামন্ত-প্রভু এবং পুরোহিতবর্গের সংহারক নয়, বরং নিজেরাই সামন্ত ও পুরোহিতবর্গ সৃষ্টি করতে লাগল। তারা অত্যন্ত অমিতব্যয়ী তো ছিলই এখন আবার এই নব্য শাসকগণ শৌখিনতা এবং বিলাসব্যসনে যেন কাইজার এমনকি শাহন্‌শাহ্‌-গণেরও কান কেটে নিচ্ছিল। গজালীর সমকালীন সুলতান সনজর সলেজু তরুণী এক দাসীর প্রেমে পাগল হয়ে তাকে জায়গীর এবং সাত লক্ষ মোহর উপহার দিয়েছিলেন। সাধারণ মেহনতী জনতার ওপর এই ঘটনার কি প্রভাব পড়েছিল তা গজালীর এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যা তিনি সুলতান সনজরকে বলেছিলেন —"শ্রমজীবী জনতার ঘাড় যেমন কঠোর পরিশ্রমে যত ঝুঁকে পড়ছে, আপনার অশ্বের ঘাড়ও তেমনভাবেই ঐশ্বর্যের বোঝায় নুয়ে পড়ছে।" মৌলবীদের সম্পর্কে গজালীর উক্তি —"এরা মনুষ্যরূপী শয়তান, এই পথভ্রষ্টগণ অন্যদেরও ভ্রান্তপথে চালনা করে। অবশ্য বিপরীত চরিত্রের ভালো মৌলবী যে নেই তা নয়, তবে সে রকম ব্যক্তি এখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।" (মৌলবী = ধর্মপুরোহিত, অহ্যাউল-উলুম্‌)।

"পণ্ডিত-পুরোহিত (উলমা)-গণও সুলতান এবং আমীরগণের বেতন-ভোগী। টাকা দিয়ে এদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই উলমাগণ প্রজাদের ওপর সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেও মুখ খুলতে সাহস করে না। সুলতান এবং আমীরগণ ঘৃণ্যতর বিলাসী এবং কামুকে পরিণত হচ্ছে।... অথচ উলমাগণ একফোঁটা প্রতিবাদ করতে পারে না।" ('আল-গজালী'—শিবলী নোমানী ; ১৯২৮ খৃঃ, পৃঃ. ১৯৪)

১. জীবনী

মুহম্মদ (ইবনে-মুহম্মদ ইবনে-মুহম্মদ ইবনে-মুহম্মদ) গজালীর জন্ম হয় ৪৫০ হিজ্‌রী সনে (১০৫৯ খৃঃ) তুস (সীস্তান) শহরের একাংশ তেহেরানে। তাঁর বংশ ছিল তন্তুজীবী, আরবীতে যাদের বলা হয় গজল, তাই তিনি নিজের নামের সঙ্গে গজালী পদবী যুক্ত করে নেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন। তাঁর পিতা ছিলেন নিরক্ষর, কিন্তু বিদ্যোৎসাহী, অতএব সন্তানকে শিক্ষিত করে তোলার আগ্রহ হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল—তাই মৃত্যুকালে তিনি তাঁর দুই পুত্র মুহম্মদ এবং আহ্‌মেদকে তাঁর এক বন্ধুর হাতে দিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখাতে অনুরোধ করে যান। গজালীরা ছিলেন দরিদ্র, তাঁদের পিতৃবন্ধুও ধনী ছিলেন না। পৈতৃক সম্পত্তি ফুরিয়ে গেলে দুই ভাই কোনোমতে আধপেটা খেয়েও বিদ্যাচর্চা চালিয়ে যেতে থাকেন। শহরের শিক্ষা সমাপ্তির পর গজালীর বিদ্যাতৃষ্ণা আরও বেড়ে যায়, তাই তিনি জর্জানে গিয়ে আবু-নাসের ইসমাইলী নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালীন বিদ্যাদানের রীতি অনুযায়ী শিক্ষক পাঠ্যবিষয়ের ওপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে যেতেন এবং ছাত্রগণ তা লিখে নিত। আরবরা যখন সমরখন্দ অধিকার করেছিল সৌভাগ্যবশত তখন ইসলামিক দেশসমূহে কাগজের প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল, যদিও তখনও নালন্দার বিদ্যার্থীগণ তাল-পাতা বা কাঠের পটিতেই লিখতেন। গজালী ইসমাইলীর কাছে যা শিখেছিলেন তা কাগজে লিখে নিয়েছিলেন। একদিন গজালী বাড়ি ফেরার পথে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাঁর সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠিত হয়। গজালী শুধু তাঁর কাগজ কয়টি দস্যুসর্দারকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। সর্দার হেসে বলে—"তুমি কি কিছুই পড়নি? ধর, এমন অবস্থা যদি হয় যে একটি কাগজও থাকবে না, তখন কি তুমি অজ্ঞ থাকবে?" অবশ্য সর্দার তাঁর কাগজ ফিরিয়ে দেয়।

গজালী এখন যথেষ্ট বিদ্যার্জন করেছেন, এখন আর ছোটখাট পণ্ডিত তাঁর মন ভরাতে পারে না। ঐ সময় নেশাপোর (ইরাণ) ও বাগদাদ (ইরাক) ছিল খ্যাতনামা বিদ্যাকেন্দ্র। নেশাপোরে ইমাম আবদুল মালিক হর্মৈন এবং বাগদাদে আবু-ইসহাক শীরাজীকে বলা হতো জ্ঞান-রবি। নেশাপোর ছিল গজালীর

দেশেরই প্রান্ত খুরাসানে, তাই গজালী সেখানে গিয়ে হরমৈন-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

৬৪২ খৃষ্টাব্দে আরব যখন ইরাণ অধিকার করে তখন নেশাপোর ছিল একটি প্রসিদ্ধ নগর তথা শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান। তাই সেখানে বেহকিয়া নামে যে মাদ্রাসা খোলা হয়েছিল তা ক্রমশ দ্রুত উন্নত হয়ে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছিল এবং ইসলামের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মাদ্রাসা বাগদাদের 'নিজা-মিয়া'-র সঙ্গে পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। হরমৈন বেহকিয়া ও নিজামিয়ায় (বাগদাদ) শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। আবদুল মালিক হরমৈনে (মক্কা-মদিনা) গিয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন, ফলে হরমৈন তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তিনি সুলতান আল্প্ আর্সেলন সলজুকির প্রধানমন্ত্রী এবং পরে নিজামুল মুল্ক হয়েছিলেন। সুলতান নিজে ছিলেন একজন পণ্ডিত, হাসান বিন-সব্বাহ্ (কিল-আল-মৌত-এর সংস্থাপক) এবং উমর-খৈয়ামের সহপাঠী, পণ্ডিত ব্যক্তিগণের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হরমৈন-এর জ্ঞানের খ্যাতি তিনি শুনেছিলেন তাই নেশাপোরে নিজের নামানুসারে 'নিজামিয়া' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে হরমৈনকে সেখানকার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

হরমৈন-এর অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হলেন গজালী। হরমৈন-এর জীবনকালেই তাঁর সুযোগ্য শিষ্য হিসেবে গজালীর নাম ছড়িয়ে পড়ে। গজালীর শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল হরমৈন-এর নিকট, তবুও তিনি গুরুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হরমৈন-এর মৃত্যু হয় ৪৭৮ হিজ্রী সনে (১০৮৫ বা ১০৮৭ খৃঃ)। গজালীর বয়স তখন মাত্র আঠাশ বছর।

গজালী খুব যশাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, কিন্তু রাজদরবারের অনুগ্রহ ছাড়া এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি কয়েক বছরের জন্য রাজদরবারে প্রবেশ করেন। নিজাম-উল-মুল্ক এবং তিনি, উভয়েই ছিলেন তুস নগরের বাসিন্দা, এবং বিদ্বানগণকে সম্মান ও পরীক্ষা করতেও জানতেন মুল্ক। নিজাম-উল-মুল্ক দরবারে এসে গজালীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সমাবেশে এক তর্কসভার আয়োজন করে গজালীর পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করান। গজালী জয়ী হন এবং মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই ইসলামী দুনিয়ার সর্ববৃহৎ খ্যাতনামা বিদ্যাপীঠ বাগদাদের মাদ্রাসা নিজামিয়ার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৪৮৪ হিজরী সনে (১০৯১ বা ১০৯৩ খৃঃ) যখন উমাদী-আল-আব্বল বাগদাদে পদার্পণ করেন তখন সমস্ত শহর তাঁকে সাড়ম্বরে স্বাগত জানায়। যদিও তখন আসল রাজধানী ছিল নেশাপোর শহর এবং বাগদাদের খলিফা ছিলেন সলজুকির বৃত্তিভোগী, তবু তখনও বাগদাদই ছিল শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র।

৪৮৫ হিজ্রী সনে (১০৯২ খৃঃ) মালিকশাহ্ সলজুকির মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বেগম তুর্ফাণ খাতুন আমীর এবং দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই কথায় রাজী

করান, যে সিংহাসনে তাঁর চার বছর বয়সের পুত্র মামুদ (১০৯২-১০৯৪ খৃঃ) বসবে এবং খলিফার নিকট প্রার্থনা করেন যে খুত্‌বা (=শুক্রবার ব্যতীত অন্যদিনের নমাজে খলিফার নামে পাঠ) যেন তার নামেই পড়া হয়। খলিফা মুক্ত্‌দর ভয়েতেই প্রথম শর্ত মেনে নেন, কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত মেনে নেওয়া খুবই কঠিন ছিল ; অতএব খলিফা গজালীকে তুর্কাণ খাতুনের দরবারে পাঠান। গজালীর ব্যক্তিত্ব এবং বোঝাবার সুন্দর কায়দায় মুগ্ধ হয়ে তুর্কাণ খাতুন দ্বিতীয় শর্তটি ত্যাগ করেন।

১০৯৪ খৃষ্টাব্দে মুক্ত্‌দরের পর খলিফা হন মুস্ত্‌জহর। গজালীকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। ঐ সময়ে বাতনী (=ইসমাইলী) পন্থা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং বাগদাদ ছাড়িয়ে অন্যান্য জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়ে। একাদশ শতাব্দীতে মিশরে যে ফাতমী খলিফার শাসন ছিল তাঁরা সকলেই ছিলেন বাতনী। কাহিরার গণিতজ্ঞ দার্শনিক আবু-আলী মুহম্মদ (ইবনুল হাসান) ইবনুল রহিম (মৃত্যু ১০৩৮ খৃঃ) ছিলেন বাতনী। ইরাণে ইসমাইলী বাতনীগণের নেতা ছিলেন হাসান বিন-সব্‌ক (নিজাম-উল-মুল্‌ক-এর সহপাঠী)। ইনি এক স্বর্গ (কিল-উল-মৌত) প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে তা খুবই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। গজালী বাতনীগণের প্রভাব খর্ব করার জন্য খলিফার নামানুযায়ী 'মুস্তজহরী' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন।

বাগদাদের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তার ধারাবাহিকতাকে এমনভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছিল যে সেখানে স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবাহকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় শতাব্দী থেকেই সেখানে ইহুদী, খৃষ্টান, পারসী, মোতজলী, বাতনী, সুন্নী সকলেই শান্তিপূর্ণ সাধারণ ও বৌদ্ধিক জীবন-যাপন করছিলেন। যক্বয়ক খিলাফতির এই শান্তিপূর্ণ সময়েই যদিও সীনা ও হাসিমের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তবুও বিচার-স্বাতন্ত্র্যের তরঙ্গকে স্তব্ধ করা এত সহজ ছিল না। সনাতনী ইসলামের শক্তিশালী সমর্থক অশ্‌অরীর ন্যায় গজালীও প্রথমে 'মুস্তজহরী' লিখেছিলেন এবং 'মজালিসে গজ্জালিয়া' পুস্তকে বিরোধীদের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন বটে, তবে এই অবস্থা বেশী দিন টিকতে পারেনি। গজালী নিজেই লিখেছেন—"আমি একে একে বাতনী, জাহিরী, দার্শনিক, মুতকল্লিম (=তার্কিক), জিন্দীক (=নাস্তিক) সকলের সঙ্গেই মিশেছি এবং তাঁদের বিচারধারাকে জানতে চেয়েছি। কিন্তু আমার প্রবৃত্তিই হলো পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে সত্যের অনুসন্ধান করা ; এরই প্রভাবে চোখ বুজে পেছনে হাঁটার নীতির প্রতি আমি খুবই অসন্তুষ্ট। ফলে বাল্যকাল থেকেই শুনতে শুনতে যে ধার্মিক বিশ্বাস অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল আজ তার প্রতিও শ্রদ্ধায় ফাটল ধরেছে। আমি ভেবে দেখেছি—এই প্রকার অন্ধ অনুকরণকারী ধর্ম-বিশ্বাসী তো ইহুদী, খৃষ্টান সকল ধর্মেই আছে···অতএব শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুর ওপরেই আর বিশ্বাস থাকল না। বড় জোর মাস দুই পর্যন্ত এ রকম অবস্থা থাকে, খোদার দয়ায় তা

পুনরায় ঠিকও হয়ে যায়, কিন্তু অন্যান্য ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস কিছুতেই দূর হয় না। সেই সময়ে ···চারটি সম্প্রদায় ছিল —মুতকল্লিম, বাতনী, ফিল্‌ফা (=দর্শন) এবং সুফী। আমি প্রতিটি সম্প্রদায় সম্বন্ধেই জানতে শুরু করি এবং শেষ পর্যন্ত সুফী মতবাদই আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করে। জুনেদ, শিবলী, রায়জীদ, বস্তামী প্রভৃতি সুফী আচার্যগণের সমস্ত লেখাই আমি পড়ে ফেলি। ···কিন্তু এই বিদ্যা বস্তুত নিষ্ঠাসহকারে আরাধ্য বিদ্যা, শুধু পড়ে গেলেই ফল লাভ হয় না। অভ্যাসের জন্য তপস্যা এবং সংযম প্রয়োজন। ···সবকিছু বিবেচনা করে মনে হলো যে বাগদাদ ছেড়ে চলে যাই, সবকিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করি। ···কিন্তু মন কিছুতেই এই ঐশ্বর্য ও সম্মানকে জলাঞ্জলি দিতে চায়নি। এই ধরনের চিন্তার ফলে মনের অবস্থা এমন হলো যে বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেল, অধ্যাপনার কাজ বন্ধ, হজমশক্তি হ্রাস পেল এবং শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকও চিকিৎসা করা ছেড়ে দিলেন···।"

প্রাচীন ইসলামিক ধর্মের প্রতি গজালীর যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তা কেবলমাত্র শ্রদ্ধানির্ভর। এটা ছিল শ্রদ্ধাময় ধর্মবাদের প্রাথমিক অবস্থা। পরে এর ওপর বুদ্ধি তথা যুক্তিবাদের আঘাত শুরু হয়। এখন গজালীর সামনে দুটি রাস্তা খোলা থাকল, হয় যুক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে পূর্ব-বিশ্বাসে অটল থাকা, নয়ত যুক্তি নির্দেশিত পথে চলা। গজালী বাগদাদের সুখৈশ্বর্যময় জীবন ছেড়ে দিয়ে কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং ত্যাগের পরিচয় দিলেন। কিন্তু বুদ্ধি তার নিজের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে শর্ত রেখেছিল তা এই ত্যাগ এবং দৈহিক কষ্টের চেয়েও কঠিন। নাস্তিক অপবাদ নিয়ে পণ্ডিত, মূর্খ সকলেরই ঘৃণা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল, তাঁর নামের ওপরে থুথু ফেলা হয়েছিল। সত্য-শক্তিতে অবিশ্বাস জন্মানো থেকে তিনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে এর পর চিরদিনের জন্য বিশ্বের দরবারে তাঁর মুখে কলঙ্ক-লেপন করা হবে। শুধু তাই নয়, নিজামিয়ার প্রধান অধ্যাপক পদ থেকেও তাঁকে চ্যুত করা হবে, এমনকি হয়ত কারান্তরালের নির্মম প্রহারও তাঁকে সইতে হবে। যদি সর্বান্তঃকরণে যুক্তিবাদের পথটি জানার সঙ্কল্প করতেন তবে গজালীকে সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। গজালী পুরোপুরি অন্ধবিশ্বাসীও হতে পারেননি আবার শুধু বুদ্ধিবাদের রাস্তাতেও চলতে পারেননি। তাই তিনি সুফীপন্থাকেই আশ্রয় করেছিলেন যাতে কিছু ত্যাগ দেখানোর প্রয়োজন হলেও তার দ্বারাই মানসিক সন্তোষ, সম্মান, প্রতিপত্তি প্রভৃতি হার্দিক ঐশ্বর্য পাওয়া যেতে পারে। মুশকিল হলো যে বুদ্ধির প্রখর তেজকে রোখার জন্য আত্মসম্মোহনের (self-hypnotisation) প্রয়োজন—যা একজন বুদ্ধিবাদী ব্যক্তির পক্ষে খুবই দরকারী—কিন্তু আত্মসম্মোহনের ফলে মানুষ তো আত্মহত্যাও করে ফেলতে পারে।

শেষ পর্যন্ত চার বছর ধরে বাগদাদে অতিবাহিত জীবনকে শেষ সেলাম জানিয়ে গজালী মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ৪৮৮ হিজরী সনে (১০৯৫ খৃঃ) লোটা কম্বল

সম্বল করে দামাস্কাসে চলে যান। সেখানে দুই বছর বাস করার পর তিনি জেরুজালেম প্রভৃতি জায়গা পরিভ্রমণ করতে করতে মক্কা-মদিনায় হজ করতে যান। সেখানে তিনি অনেকদিন ছিলেন। যাত্রাপথে আলেকজান্দ্রিয়া এবং কাহিরাও দর্শন করেন ৪৯৯ হিজ্‌রী সনে (১১০৬ খৃঃ) পয়গম্বর ইব্রাহিমের জন্মস্থান খলিলায় অবস্থান কালে তিনি তিনটি প্রতিজ্ঞা করেন—

(১) কোনো বাদশাহের দরবারে যাব না।

(২) কোনো রাজাব ঐশ্বর্যকে স্বীকার করব না।

(৩) কারও সঙ্গে তর্কযুদ্ধে (=শাস্ত্রার্থ) অবতীর্ণ হব না।

জেরুজালেমে যীশুর যে জন্মগৃহ, সেই আস্তাবলে একবার ইসমাইলী হাকমী, ইব্রাহিম সব্বাকি, আবুল-হাসান-বস্‌রী প্রভৃতি সুফীগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে গজালীর মুখ থেকে একটি শ্লোক বেরিয়ে আসে—

"ফিদ্দৈতক লৌ লল্‌-হুব্ব কুন্তো ফিদৈত-নী।
ব-লাকিন বেসেহ্‌ রুল-মুকলতীন সব্বৈত-নী॥
অতয়ক্‌ লেমা জাক সদ্রী অনিল-হাবা।
ব লৌ কুন্তো তদ্‌রী কৈফা শৌকী অতৈত-নী॥

—অহ্যাউল-উলুম-এর টীকা

এই শ্লোক শুনে বস্‌রী সমাধিস্থ হয়ে যান এবং অন্যান্যদের ওপরেও এমন প্রভাব পড়ে যে অনেকেই নিজের নিজের বস্ত্রপ্রান্ত ছিঁড়তে শুরু করেন।

এই রকম জীবনেই গজালী তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অহ্যাউল-উলুম লিখেছেন।

"হজ করার পর গৃহের আকর্ষণ গজালীকে আবার তাঁর জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনে" ('মুনক্কজ মিনল্‌-জলাল')। আমার কাছে লেখা আমার এক বন্ধুর জীবন কাহিনীর পত্রের মতো গজালীরও "আবার সেই …চাষাবাদ, সেই সংসারের খুঁটি, সেই বন্ধন-রজ্জু, সেই গরু-বাছুর! দীর্ঘদিন উন্মুক্ত থাকার পর …স্বেচ্ছাকৃত বন্ধন", কিন্তু আমার সেই বন্ধুর মতো গজালীর শ্বাসরোধকারী অবস্থা হয়েছিল বলে মনে হয় না। বেদান্তের অলৌকিকতার মতো সুফীবাদেও শেষ পর্যন্ত যখন ইচ্ছা বন্ধন যেমন স্বীকার করা যায়, তেমনই তা থেকে মুক্ত হওয়াও সম্ভব।

গজালী এখন একজন গৃহস্থ। ৪৯৯ হিজ্‌রী সনের (১১০৬ খৃঃ) একাদশ মাসে তিনি আবার নেশাপোরের নিজামিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন, অবশ্য বেশীদিন সেখানে থাকতে পারেননি। নিজাম-উল-মুল্‌ক-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফখরুল-মুল্‌ক সন্‌জর সলজুকির প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। এ কথা আগেই বলেছি যে ঐ সময় এক বাতনী সম্প্রদায়ের (ইসমাইলীগণ, আগা খাঁ-র পূর্বসূরী হাসান বিন সব্বাহ্‌-র অনুগামীগণ) ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু লেখনীই নয়, এমনকি আইনের বিধানও প্রয়োগ করা হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে বাতনীগণও তাঁদের শক্তিশালী গুপ্ত-সংগঠন (=অসেসিন) গড়ে তোলেন। ৫০০ হিজ্‌রী

সনে (১১০৭ খৃঃ) অবশেষে ফখরুল-মুল্‌ক তাঁদের তরবারীর শিকার হন। শুধু সব্বাহ্‌-এর ‘কিল্‌-উল-মৌত’ নয়, নেশাপোরেও অসেসিনগণের গুপ্ত ঘাঁটি গড়ে ওঠে, অতএব গজালী স্থানত্যাগই শ্রেয় বিবেচনা করেন।

গজালী এখন একান্ত জীবন-যাপন করতে চাইছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতি ঈর্ষাকাতর লোকেরও অভাব ছিল না। তারা গজালীর পুস্তকের অপব্যাখ্যা করে বলতে শুরু করেছিল যে তিনি নাস্তিকতার শিক্ষা দিচ্ছেন। হয়ত সুলতান সন্‌জর স্বয়ং অ-প্রাকৃতিক অপরাধে দোষী ছিলেন, কিন্তু ইসলামকে রক্ষা করার জন্য গজালীর সংবাদ সংগ্রহ করা কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি গজালীকে দরবারে উপস্থিত হতে আদেশ করেন, গজালী মশহদ শহর পর্যন্ত চলে যান এবং সেখান থেকে সুলতানকে এই পত্র লেখেন—

“আপনার পিতা মালিকশাহ্‌-এর আমলে ২০টি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। ইস্পাহান এবং বাগদাদের জৌলুস দেখিয়াছি। কয়েকবার সুলতান ও খলিফার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানে দূতের কর্মও করিয়াছি। ধর্মশাস্ত্রের ওপরে প্রায় সপ্তদশ সংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়াছি …জেরুজালেম, মক্কায় অবস্থান করিয়াছি। আল্লার মিত্র ইব্রাহিমের শহীদ-বেদী স্পর্শপূর্বক শপথ করিয়াছি যে (১) কখনও কোনো সুলতানের সম্মুখীন হইব না, (২) কোনো সুলতান প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিব না, (৩) কাহারও সহিত শাস্ত্রীয় বিতর্ক করিব না। দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছি। সকল সুলতান এবং খলিফাগণ এই অধম ফকিরকে মার্জনা করিয়াছেন। কিন্তু এখন শ্রবণ করিতেছি যে আমাকে সরকারের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ জারি করা হইয়াছে। আদেশ মান্য করিবার নিমিত্ত মশহদ শহর পর্যন্ত আগমন করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্তই আর দরবার পর্যন্ত গমন করিলাম না।”

কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রার্থনাই ব্যর্থ হয়েছিল প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে সন্‌জরের দরবারে যেতে হয়েছিল। জনসাধারণের ওপর তাঁর প্রভাব, জ্ঞান এবং জনহিতকর কার্যগুলি দেখে সন্‌জর তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন। গজালীর পক্ষে দরবারে যাওয়া কোনো নতুন ব্যাপার নয় কিন্তু পরবর্তী লেখকগণ তাঁর নামে এই অপপ্রচার করেন যে, সন্‌জরের দরবারে জাঁকজমক দেখে গজালীর না-কি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেতে থাকে। সন্‌জরের সঙ্গে গজালীর সম্পর্ক এতই হার্দিক হয়ে ওঠে যে অনেক সময় সন্‌জরকে স্পষ্টাস্পষ্টি ন্যায্য কথা শোনাতে গজালী দ্বিধা করতেন না। সুবর্ণের ভারে নুয়ে পড়া অশ্বের উপমা তিনিই দিতে পেরেছিলেন। সন্‌জরের পরিবার হান্‌ফী মতের অনুগামী ছিলেন। গজালী সম্বন্ধে এমন কথাও আরোপ করা হয়েছিল যে তিনি ইমাম হানিফাকে ভালোমন্দ কথা অনেক বলেছিলেন। গজালী আত্মপক্ষ সমর্থনে কৈফিয়ত দিয়েছেন যে “—‘অহ্যাউল-উলুম’ পুস্তকে আমি হানিফাকে ধর্ম-মীমাংসা-শাস্ত্রে (=ফিকা) দুনিয়ায় অদ্বিতীয় বলে উল্লেখ করেছি।” গজালী হয়ত

যৌবনের উদ্দামতায় কারও বিরুদ্ধে কিছু লিখেছেন, কিন্তু পরে তাঁর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারটা মিটে যায়।

গজালী যখন বাগদাদ পরিত্যাগ করে চলে যান তখন তাঁর বিদ্যার খ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে খলিফা ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী আমীরগণ গজালীকে আবার নিজামিয়ার মাদ্রাসায় প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তাই দরবারের সকলেরই দস্তখতসহ একটি পত্র তাঁর কাছে পাঠানো হয়। সন্‌জরের প্রধান মন্ত্রী অত্যন্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গজালী নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (১) আমার দেড়শত ছাত্রের পক্ষে তুস থেকে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। (২) এখন আমি আগের মতো নিঃসন্তান নই, আমার পরিবারের ওখানে কষ্ট হবে। (৩) আমি শাস্ত্রার্থ করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাজেই ওখানে আমার শান্তি বিঘ্নিত হবে বলে আশঙ্কা করছি।

গজালীর শেষ পুস্তকের নাম 'মুস্তফ্‌সী'। পুস্তকটি তিনি তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ৫০৪ হিজ্‌রী সনে (১১১১ খৃঃ) লেখেন। চতুর্দশ জমাদী, দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার ৫০৫ হিজ্‌রী সনে (ডিসেম্বর ১১১১ খৃঃ) তুস নগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

২. কৃতি

৫০০ হিজ্‌রী সনের (১১০৭ খৃঃ) কাছাকাছি সময়েই যে গজালী অন্তত সত্তরটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা সন্‌জরের নিকট লিখিত তাঁর পত্র থেকেই জানা যায়। এরও পরে চার বছর ধরে তাঁর লেখনী থেমে থাকেনি। কুড়ি বছর বয়স থেকে ৫৪-৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত (তাঁর মৃত্যু সময়) দীর্ঘ ৩৫ বছর তাঁর কলম কাজ করে গেছে। আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর 'আল-গজালী' পুস্তকে গজালীর ৭৮টি পুস্তকের সূচী দিয়েছেন, যার মধ্যে কিছু কিছু গ্রন্থাবলী রূপেও আছে। তাঁর গ্রন্থগুলি প্রধানত ফিকা (ধর্ম-মীমাংসা), তর্কশাস্ত্র, দর্শন, গবেষণাগ্রন্থ, সুফীবাদ(= অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ) এবং নীতিশাস্ত্র বিষয়ে রচিত।

গজালীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বইগুলি হলো—

(১) অহ্যাউল-উলুম (সুফী, নীতি)
(২) জবাহরুল-কুরাণ (সুফী, নীতি)
(৩) মকাসিদুল ফালাসিফা [=দর্শনাভিপ্রায়] (দর্শন)
(৪) মইয়ারুল ইল্ম (যুক্তি)
(৫) তোহাফতুল ফালাসিফা [= দর্শন খণ্ডন বা দর্শনের ধ্বংস] (গবেষণা)
(৬) মুস্তফ্‌সী (ফিকা, ধর্ম-মীমাংসা)

অহ্যাউল-উলুম এবং তোহাফাতুল ফালাসিফা গজালীর দুখানি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এর মধ্যে অহ্যাউল-উলুমকে বলা হয় দ্বিতীয় কোরাণ।

(১) **অহ্যাউল-উলুম** (বিদ্যা-সঞ্জীবনী) সম্বন্ধে কিছু প্রশংসাপত্র এখানে দিলাম—

(ক) প্রশংসাপত্র—গজালীর সতীর্থ আবদুল-গাফির ফার্সী বলেছেন "অহ্যাউল-উলুম-এর মতো কোনো পুস্তক আগে রচিত হয়নি।"

'মুস্লিম' (হদিসের) টীকাকার ইমাম নুদীর মন্তব্য —"বইটিকে কোরাণ বলে ভ্রম হয়।"

শেখ আবু-মুহম্মদ কারজদ্‌নী বলেছেন —"যদি এই দুনিয়ার সমস্ত বিদ্যা নষ্ট হয়ে যায় তাহলেও অহ্যাউল-উলুম থেকে তার পুনর্জাগরণ ঘটানো যাবে।"

প্রসিদ্ধ সুফী শেখ-আবদুল্লা ইদারদাসের সমগ্র পুস্তকটি কণ্ঠস্থ ছিল। আবার শেখ-আলী নামে আর একজন সুফী এই বইটি পঁচিশবার পাঠ করেন এবং প্রত্যেক-বার পাঠান্তে, ফকির এবং শিষ্যদের ভোজন করান।

কুতুব শাজলী একজন বুদ্ধিমান সুফী বলে পরিচিত ছিলেন। একদিন তিনি অহ্যাউল-উলুম হাতে নিয়ে বলেন,"জানো,এটি কোন পুস্তক ?"এই বলে মুখের ওপরে কশাঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, "দেখ, এই পুস্তককে আগে আমি অস্বীকার করেছিলাম। আজ রাতে ইমাম গজালী আমায় হজরত মুহম্মদের দরবারে হাজির করেন এবং এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ মুখে চাবুকের আঘাত করেন।"

জগদ্বিখ্যাত সুফী শেখ মুহীউদ্দীন অহ্যাউল-উলুম বইটি কাবার সামনে বসে পাঠ করতেন।

এ সব প্রশংসা তো ঘরণীর অতিরঞ্জিত প্রশংসার ন্যায় সুন্দর ও স্বাভাবিক; কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ 'দর্শন-ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক জর্জ হেনরী লুইস বলেছেন —"যদি দেকার্ত-এর সময়ে (১৫৯৬-১৬৫০ খৃঃ) এই গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হতো তবে লোকে বলত যে দেকার্ত 'অহ্যাউল-উলুম' থেকে চুরি করেছেন।" (G. E. Lewis : *History of Philosophy* ; 4th edition, p.50)

(খ) আধার-গ্রন্থ—অহ্যাউল-উলুম তথা বিদ্যা-সঞ্জীবনীতে যদিও দর্শন নীতি, সুফী, ব্রহ্মবাদ সকল বিষয়ই পাওয়া যায় কিন্তু মুখ্যত তা নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থ। গজালীর যুগে নীতিশাস্ত্রের মধ্যে গ্রীক নীতি-গ্রন্থের অনুবাদ এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহও ছিল, তার মধ্যে দার্শনিক মস্কবিয়ার লেখা 'তহ্‌জীবুল এখ্‌লাক্' গ্রন্থের কথা আমি আগেই বলেছি। সর্বপ্রথম অ্যারিস্টটল এই বিষয়ের ওপর দুখানি বই (নীতিশাস্ত্র) লেখেন, যার টীকাকার ছিলেন পোর্ফিরিয়াস। হনৈন ইবনে ইসহাক আরবী ভাষায় অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক জালীনুসও (গ্যালেন) এই বিষয়ের ওপর 'মানুষ নিজের দোষ কি উপায়ে জানতে

পারে' নামে একখানি বই লেখেন এবং সম্ভবত এই বইটিরও অনুবাদ আরবী ভাষায় হয়েছিল; মস্কবিয়া নিজ গ্রন্থের কয়েক জায়গায় এর থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বিভিন্ন গ্রন্থকার গ্রীক পুস্তকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি লিখেছিলেন—

১. আরাউল মর্দীনতুল-ফাজিলা —ফারাবী (রাজনীতি)
২. তহ্‌জীবুল্ এখ্‌লাক্ —মস্কবিয়া
৩. আকবর বল্‌-ইসমা —বু-আলী সীনা
৪. কূবতুল্-কুলুব —আবুতালিব মক্কী (ধর্মীয় ঢঙে)
৫. জরিয়া ইলা মকারিমু'শ-শরীঅত —রাগিব ইস্পাহানী (ধর্মীয় ঢঙে)

এর মধ্যে তহ্‌জীবুল্ এখ্‌লাক্ এবং কূবতুল কুলুব থেকে তো বহু উক্তি সম্পূর্ণ শব্দগত ভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে; —আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর পুস্তক 'আল গজালী' (উর্দু)-তে এর কিছু উদাহরণও দিয়েছেন এবং লেখার ভাষা সম্পূর্ণ মক্কীর মতোই।

(গ) লেখার প্রয়োজন —সুফীবাদের প্রভাব যখন তাঁর ওপর খুবই প্রবল সেই সময় গজালী অহ্যাউল-উলুম লিখেছিলেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ করে কেন এই পুস্তক লিখেছেন তার কারণ সম্বন্ধে পুস্তকের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন—

"আমি দেখেছি সমগ্র বিশ্ব ব্যাধিতে আক্রান্ত, আত্মিক ও পারলৌকিক সদাচারের পথ রুদ্ধ। জ্ঞানালোক প্রদর্শনকারী বিদ্বানের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। যাঁরা বর্তমান তাঁরা নামে মাত্র পণ্ডিত, নিজ স্বার্থই শুধু বোঝেন। তাঁরা জগতে এই বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে চান যে বিদ্যামাত্র শাস্ত্রীয় বাদ্‌বিতণ্ডা, মৌখিক উপদেশ এবং ফতোয়া (ব্যবস্থা) এই তিনটি বিষয়ের ওপরই নির্ভরশীল। পরলোকচর্চা অচল হয়ে গেছে, মানুষ তাকে ভুলতে বসেছে।" তাই মৃত বিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই গজালী বিদ্যা-সঞ্জীবনী লেখেন।

(ঘ) গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য —শিবলী বিদ্যা-সঞ্জীবনীর বৈশিষ্ট্যকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সংক্ষেপে তা হলো—

(১) গ্রন্থকার, পণ্ডিত এবং সাধারণ পাঠক, উভয়েরই বোধগম্য করার জন্য অত্যন্ত সরল ভাষা (আরবী) ব্যবহার করেছেন, অথচ তাঁর দার্শনিক মাহাত্ম্যকে খর্ব হতে দেননি। মস্কবিয়ার 'অত-তহারত' গ্রন্থটি পড়তে হলে প্রথমে তার ভাষার দুর্বোধ্যতাকে বোধগম্য করতে হবে তারপর অর্থ বোঝার জন্য মাথা খাটাতে হবে —এ বই যেন নারিকেলের কাঠিন্য ভেদ করে মিষ্ট স্বাদ আস্বাদন, কিন্তু গজালীর গ্রন্থ যেন পাতলা খোসার ল্যাংড়া আম!

(২) এতে অধিকারীভেদের —গৃহস্থ এবং গৃহত্যাগী সুফী —প্রত্যেকের প্রতি পূর্ণ এবং সতর্ক দৃষ্টি রেখে যথাযোগ্য নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

(৩) প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের সাধারণ আচার-ব্যবহারের বিষয়ও ব্যাপক দৃষ্টি দিয়ে লেখা হয়েছে।

(৪) ক্রোধ-লোভাদি রিপুর প্রশ্রয়ে মানুষের শক্তি খর্ব হয়ে যে হতাশা, অকর্মণ্যতা বর্ধিত হয়, তাকে দূর করার জন্য যথেষ্ট উপদেশবাণী তিনি দিয়েছেন। এখানে আমি দুটি বাণীর নমুনা দিচ্ছি—

১. **সাধারণ সদাচার** —টেবিলের ওপর খাদ্য রেখে খাওয়া, আটা ছেনে রুটি করা, আস্নান (এক রকম ঘাস, যা সাবানের কাজ করে) দিয়ে হাত ধোয়া এবং পেট ভরে খাওয়া —এই চারটি ব্যবস্থাকে প্রাচীনপন্থী মুসলমান পণ্ডিতেরা নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেন যে এগুলি পয়গম্বরের পরবর্তীকালে উদ্ভূত খারাপ আচরণ। গজালী লিখেছেন—

"চাদরের ওপর খাদ্য রেখে খাওয়া ভালো, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে টুলের ওপর রেখে খাওয়া খারাপ। কেননা এ রকম কোনো আদেশ ধর্মপুস্তকে নেই।··· টুল থেকে খাদ্য গ্রহণ সুবিধাজনক···। আস্নানে হাত ধোয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রেখেই ধর্মপুস্তকে খাওয়ার পর হাত ধোয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আস্নান ব্যবহার তো আরও ভালো। পয়গম্বরের যুগে এর উপযোগিতা কেউ বোঝেনি, কারণ তখন হয় ঐ ঘাস পাওয়া যেত না, নয়ত তার প্রচলনই শুরু হয়নি। হয়ত তাঁরা হাত না ধুয়ে লুঙ্গিতে মুছে ফেলতেন, কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে হাত ধোয়া অনুচিত।"

খাওয়ার বিষয়ে কিছু কথা তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে গ্রহণ করে লিখেছেন—

"খাদ্য কোনো উঁচু জায়গায় রেখে খাওয়াই উচিত। খাদ্যবস্তু পর পর আসা উচিত। ঝোল জাতীয় খাদ্য প্রথমে গ্রহণ করা দরকার। শেষ পাতে মিষ্টি খাওয়া প্রয়োজন। ঠিক সময়ে খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। বাড়িতে যদি অনেক অতিথি এসে পড়ে আর মাত্র দুই-একজন বাকী থাকে তাহলে যথা সময়েই খাওয়া শুরু করে দেওয়া উচিত।" একটি অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে লিখেছেন—

"অনেকের মধ্যে এই রীতি ছিল যে সব খাদ্যের নাম পর পর লিখে একটা খাদ্য তালিকা অতিথির সামনে দেওয়া হতো।"

২. **উদ্যোগপরায়ণতা এবং কর্মক্ষমতার ওপর জোর** —শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষায় শায়ের (কবিতা), ব্যায়াম এবং খেলাধুলাকে অন্তর্ভুক্ত করা গজালী প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। সঙ্গীতকে মনোমুগ্ধকর বলে তিনি এর ঔচিত্য প্রচার করেছেন এবং বলেছেন যে —"স্বয়ং পয়গম্বর হাবসীদের খেলা দেখেছিলেন। আমি আরও বলতে চাই যে খেলাধুলা, যাতে চিত্তবিনোদন হয় তাতে মানসিক ক্লান্তি দূর হয়। মনের স্বভাবই এমন যে যখন কোনো বিষয়ে তা শঙ্কিত হয় তখন অক্ষম হয়ে পড়ে। অতএব মানসিক শান্তির ব্যবস্থা করা দরকার যাতে তা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে সর্বদা শুধু পড়াশোনা করে তারও বিশ্রামের

প্রয়োজন। তাই কাজের মাঝে মাঝে বিরতি, কিছু খেলাধূলা আবার আগেকার কাজে উৎসাহ-উদ্যম জাগিয়ে তোলে।"

এইভাবে শরীরকে কর্মঠ রাখতে মানসিক শক্তিকে ব্যবহার করার জন্য তিনি বলেছেন —"শুধু ক্রোধকে দমন করাই নীতি-শিক্ষা নয়। আত্মসম্মানবোধ এবং যথার্থ শৌর্য জাগ্রত করাই নীতি-শিক্ষা, সেখানে যেমন ভীরুতাকে দূর করতে হবে তেমনই অতি সাহস বা অন্যের ওপর অত্যাচারকেও প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। …ক্রোধকে সম্পূর্ণ দমন করা কি করে সম্ভব ? স্বয়ং পয়গম্বর পর্যন্ত অন্যের প্রতি ক্রোধ থেকে মুক্ত ছিলেন না। পরমপূজনীয় মুহম্মদ নিজেই বলেছেন—'আমিও মানুষ, আর পাঁচজনের মতো রাগ অভিমান আমারও আছে।' কোনো অন্যায় কথা শুনলে হজরত মুহম্মদের মুখ লাল হয়ে যেত, তবে প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও তাঁর মুখ দিয়ে কখনও খারাপ কথা বেরুত না।"

"সন্তুষ্টিই পরম সুখ" এই কথার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে গজালী বলেছেন—

"জানা দরকার জ্ঞান একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যা থেকে কার্য উদ্ধার হয়। সন্তুষ্টির এমন অর্থও অনেকে করে থাকেন, জীবিকা উপার্জনের জন্য পরিশ্রম না করা অথবা তার কোনো উপায়ও চিন্তা না করা। যেন মানুষ নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবে ঠিক যেন নাকের সামনে মাংসের টোপ নিয়ে ওৎ-পাতা চিতাবাঘের মতো। কিন্তু এটা মূর্খের বিচার কারণ এ রকম করা শরিয়তে (ধর্ম আজ্ঞাতে) হারাম। …যদি তুমি মনে করে থাকো যে খোদা তোমাকে বিনা-খাদ্যেই পরিতৃপ্ত করবেন, কিংবা খাদ্যকেই এমন ক্ষমতা দেবেন যে সে নিজেই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে অথবা কোনো ফরিস্তাকে পাঠিয়ে দেবেন যিনি রুটি চিবিয়ে তোমার পেটে চালান করে দেবেন, তবে বুঝব যে তুমি খোদার চরিত্র সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ।"

মঠের সন্তুষ্ট সাধু-ফকীরদের সম্পর্কে গজালী বলেছেন—

"মঠে বাস করলেই সন্তোষ আসে না, কারণ সেখানে একটা নির্দিষ্ট আয়ে চলতে হয়। অবশ্য যদি ভিক্ষা না করে মানুষ যে পূজা-দক্ষিণা দেয় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা যায় তবেই সন্তুষ্টির মহিমা বোঝা যাবে। কিন্তু যখন (মঠের) প্রসিদ্ধি ঘটে তখন তার অবস্থা দাঁড়ায় বাজারের মতো, সেখানে বাস করা আর হাটের মাঝে বাস করা একই কথা। কাজেই এই বাজারে যার আনাগোনা তাকে কখনই সন্তুষ্ট বলা চলে না।"

দেখা যাচ্ছে সুফী হয়েও গজালী ঐ পন্থার অকর্মন্যতাকে সমর্থন করেননি।

(ঙ) নীতি-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা —অহ্যাউল-উলুম-এ নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গজালী বলেছেন যে মানুষ শরীর এবং আত্মার সংমিশ্রণ। শরীরের মতো আত্মারও একটা বিশেষ আকৃতি আছে, মানবরূপের মতোই তা সুদর্শন অথবা কুদর্শন, অর্থাৎ সদাচারী অথবা দুরাচারী। গজালী নীতিকে শুধু দৈহিক ক্রিয়ার

মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তার জন্য মানুষের স্থায়ী ক্ষমতার শর্তও প্রয়োগ করেছেন। গজালী নৈতিকতার চারটি প্রধান স্তম্ভের কথা বলেছেন। জ্ঞান, ক্রোধ, রিরংসা এবং সংযম। এই চারটি স্তম্ভকেই যদি সংযতভাবে, অন্তরে পোষণ করা যায় তবেই মানুষ সম্পূর্ণ সদাচারী হতে পারে। একটি বা দুটিকে পালন করলে অপূর্ণতা থেকে যায়।

গ্যালেন (=জালীনুস) মানুষের সদাচারী অথবা দুরাচারী হওয়ার ব্যাপারে মনে করেছেন যে কিছু মানুষ স্বভাবত সদাচারী, কেউ বা দুরাচারী আবার কিছু মানুষ মধ্যম-স্বভাবের। এই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষদের সংশোধন করা সম্ভব। মস্কবিয়াও গ্যালেনের এই মতকে সমর্থন করেছেন এ কথা আমি আগেই বলেছি। অ্যারিস্টটলের মত এর বিপরীত—স্বভাবত মানুষ সদাচারী বা দুরাচারী হয় না, শিক্ষা ও পরিবেশই এর জন্য দায়ী, অবশ্য তা সবার ক্ষেত্রে সমান নয়। অ্যারিস্টটলের এই মতকে গজালী সমর্থন করেছেন। তাই শিশুশিক্ষার ওপর গজালী সবচেয়ে জোর দিয়েছেন, যেমন—

(১) **শিশুর উন্নয়ন**—"শিশুর বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। শিশুর প্রথম স্পৃহা হলো ভোজন। তাই খাদ্য দিয়েই তার শিক্ষা শুরু করা দরকার। তাদের শেখাতে হবে খাদ্যগ্রহণের পূর্বে ভগবানের নাম (বিসমিল্লাহ্) করা উচিত। খাওয়ার টেবিলে সামনে যে খাদ্য আছে তা হাত বাড়িয়ে নাও কিন্তু তোমার সঙ্গে একত্রে যারা খাবে তাদের আগে নেওয়ার চেষ্টা কর না। পরিবেষক যেমন দেবেন তেমন খাবে। তাড়াতাড়ি না করে ভালো করে খাবে। হাত বা পোশাকে যেন খাদ্য না লাগে। বেশী খাওয়া ভালো নয়, অল্প ও সাধারণ খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকবে। অন্যকে খাদ্যের ভাগদানের সদিচ্ছা শিশুর মনে জাগিয়ে তোলা উচিত।

"শুভ্র পোশাকের প্রতি শিশুকে আকৃষ্ট করে তুলতে হবে, বোঝাতে হবে যে রঙীন, রেশমী এবং জরীর পোশাক পরা নারী ও নপুংসকদের কাজ। এই রকম পোশাক-পরা বালকের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। দুষ্ট ও কুটিলবুদ্ধি, আরামপ্রিয়তা ও বিলাস-ব্যসনের প্রতি শিশুর ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে।

"শিশুর ভালো কাজের জন্য তাকে প্রশংসা ও পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা দরকার, আবার যখন খারাপ-কথা বলতে দেখা যাবে তখন শিশুকে সচেতন করে দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আর না করে। ···অবশ্য বারবার সদুপদেশ না দেওয়াই ভালো···কারণ তাতে এর প্রভাব কম হয়ে যায়।

"শিশুকে শেখানো দরকার, দিবানিদ্রা ক্ষতিকর। কঠোর শাস্তি বা অতিরিক্ত প্রশ্রয় কোনোটাই ভালো নয়। ···প্রতিদিন কিছুটা হাঁটা দরকার ও ব্যায়াম করানো প্রয়োজন, যাতে আলস্যের ভাব না আসে। ধন-দৌলত, খাদ্য, পোশাক প্রভৃতির প্রতি শিশুকে যথাসম্ভব নিরাসক্ত করা উচিত।···

"সভার মধ্যে থুথু্ না ফেলা, পায়ের ওপর পা না তুলে, অন্যের দিকে পেছন না ফিরে, গালে হাত না দিয়ে বসা প্রভৃতি শিষ্টাচার শিশুকে শেখাতে হবে।

"দিব্যি-গেলে কথা বলার —সত্যি বললেও —অভ্যেস বন্ধ করতে হবে। নিজে কোনো কথা শুরু করবে না, অবশ্য অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেবে। পাঠশালা ছুটির পর শিশুকে খেলাধূলার সুযোগ দিতে হবে এতে ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর তাজা হবে।"

এই শিক্ষাই মস্কবিয়া তাঁর 'তহ্জীবুল্ এখ্‌লাক্'-এ গ্রীক গ্রন্থ থেকে নিয়ে উদ্ধৃত করেছেন।

(২) খ্যাতির জন্য দান-ধ্যান ভুল —সম্মান ও যশাকাঙ্ক্ষায় যে আমীর-গণ দান-ধ্যান করেন, তাঁদের সম্বন্ধে গজালী বলেছেন—

"এঁদের মধ্যে অনেকেই অসৎপন্থায় উপার্জিত অর্থ দ্বারা মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে মনে করেন খুব পুণ্যার্জন হলো। যদি সৎপথে উপার্জিত অর্থও হয় তবুও তাঁদের মূল অভিপ্রায় কিন্তু পুণ্যার্জন নয়,যশার্জন। অথচ এমনও দেখা যায় যেখানে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মিত হচ্ছে সেখানে এমন অনেক দুর্গত ব্যক্তি আছে যাদের সেবা করলেই অনেক বেশী পুণ্যার্জন হয়; তবু তাদের উপেক্ষা করে যে ইমারত নির্মাণই ধনী ব্যক্তির নিকট শ্রেয় মনে হয়, তাতেই প্রমাণিত হয় যে ইমারত নির্মাণে যে স্থায়ী খ্যাতি সঞ্চিত হয় দরিদ্রের সেবায় তা হয় না।"

৩. তোহাফতুল্ ফালাসিফা

(দর্শন-খণ্ডন বা দর্শনের ধ্বংস)

(ক) রচনার প্রয়োজন —কিছু মুসলমান এই পুস্তকটির নাম এবং গজালীর জনপ্রিয়তা দেখে এই ভুল করেছিলেন যে গজালী সত্যই এবার দর্শনকে ধ্বংস (খণ্ডন) করে দিলেন। তাঁর নিজস্ব বিচার, দর্শন ছাড়া আর কি ? বদ্দুগণের সাদাসিধা ইসলামী বিশ্বাসকে তিনি ফিরিয়ে আনবার ধ্বনি তোলেননি, যদিও কবিলাশাহী, ভ্রাতৃভাব, সাম্য প্রভৃতি কিছু সামাজিক ব্যাপারকে তিনি অনুকরণীয় করে তুলতে চেয়েছেন। সেই যুগে শিক্ষিত, কৃষ্টিসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষ গ্রীকদর্শনে প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। খাঁটি ইসলামধর্মের মধ্যেই 'পবিত্র-সঙ্ঘ,' 'বাতনী' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল যাঁরা তাঁদের সূক্ষ্ম জ্ঞানবিচারে রসূলের চেয়ে প্লেটো অ্যারিস্টটলকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। এই কারণে ইসলামের পক্ষের জবরদস্ত উকিল গজালীর এই রকম গ্রন্থরচনা প্রয়োজন হয়েছিল। এ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং ভূমিকাতে লিখেছেন—

"আমার কালে এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা নিজদের সর্বদাই সাধারণ মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে গৌরব বোধ করেন। তাঁরা ধর্মীয় উপদেশ ও নিয়মাবলীকে

ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁদের ধারণা অ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ ধর্মকে মিথ্যা মনে করতেন। হয়ত এই আচার্যগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবর্তক, বুদ্ধি ও প্রতিভায় অদ্বিতীয়; অতএব তাঁদের ধর্ম না-মানার প্রবণতা প্রমাণ করে যে ধর্ম বস্তুত মিথ্যা; এর সিদ্ধান্ত ও নিয়ম মনগড়া, সংস্কারজাত, যার শুধুমাত্র বাইরের খোলসটাই মন কাড়ে। এ সব দেখেশুনে আমি ঠিক করেছি যে গ্রীক আচার্যরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন তার ভুল আমি দেখাব এবং প্রমাণ করব যে তাঁদের সিদ্ধান্ত একান্তই শিশুসুলভ।

(খ) সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বই ত্যাজ্য নয় —গজালী দর্শনের সত্যতাকে মানতেন বলেই দর্শনের সব তত্ত্বকেই ভুল বলে মানা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কুমারভট্টের মতো তাঁর কাজই ছিল দর্শনকে খণ্ডন করেও তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা। গজালী তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য বলেছেন—

"দর্শনের মাধ্যমে তিন প্রকার সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়—

(১) এক প্রকার সিদ্ধান্ত কেবল শব্দ এবং পরিভাষা-নির্ভর হয়েই ইসলামী সিদ্ধান্ত থেকে স্বতন্ত্র। যেমন ঈশ্বরকে তাঁরা দ্রব্য বলেছেন, কিন্তু দ্রব্য বলতে তাঁরা অনিত্য (বস্তু) নয়, বরং এমন এক বস্তু বোঝাতে চেয়েছেন যা অন্য কিছুর আশ্রয় ছাড়াই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। এই ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বরকে বস্তু বলা ঠিকই, অবশ্য ইসলামী ধর্মগ্রন্থে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়নি।

"(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর সিদ্ধান্ত ইসলামের বিরোধী নয়। যেমন চন্দ্রগ্রহণের কারণ হিসেবে বলা হয় সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যখন পৃথিবী আসে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করা আমার কাজ নয়। যাঁরা এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেন ও মিথ্যাচারের অঙ্গ মনে করেন তাঁরা বস্তুত ইসলামের প্রতি অবিচার করেন। কারণ, গণিতের বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপরেই এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি গড়ে উঠেছে, প্রাণ গেলেও একে অস্বীকার করা যাবে না। এখন কেউ যদি বলেন যে এই সিদ্ধান্ত ইসলাম-বিরোধী তবে জ্ঞানী ব্যক্তির মনে ইসলামের প্রতি সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

"(৩) তৃতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত ইসলামের নিশ্চিত সিদ্ধান্তের বিরোধী, যেমন জগতের অনাদিত্ব, প্রলয়কে অস্বীকার করা ইত্যাদি। এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা প্রমাণিত করাই আমার এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।" এর ওপরেই আল্লামা শিবলী মন্তব্য করেছেন ('আল গজালী' পৃঃ. ১০১) —"এই ভূমিকার পরে ইমাম সাহেব (গজালী) দর্শনের ২০টি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর এই মেহনত সার্থক হয়নি। কারণ যে সিদ্ধান্ত সমূহকে তিনি ইসলামের বিরোধী মনে করেছেন সেগুলির মধ্যে সপ্তদশতম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাঁর পুস্তকের শেষে বলেছেন যে এই সিদ্ধান্তের যুক্তি দ্বারা কাউকে কাফের বা নাস্তিক প্রমাণ করা যায় না।"

(গ) ২০টি দর্শন-সিদ্ধান্ত ভুল—'দর্শন খণ্ডন'-এ গজালী কতটা সফল হয়েছিলেন তা শিবলীর উক্তি থেকেই অনুমেয়। এখানে আমি ঐ ২০টি গ্রীক সিদ্ধান্ত তুলে ধরছি (বলার প্রয়োজন নেই যে এতে হিন্দু দর্শনের কথাও প্রচুর পাওয়া যাবে)।

	গ্রীক দর্শন	গজালী
১.	জগৎ অনাদি	ভুল
২.	জগৎ নিত্য (=অনন্ত)	ভুল
৩.	ঈশ্বর জগতের কর্তা এই ধারণা ভ্রম মাত্র	ভুল
৪.	ঈশ্বরের অস্তিত্ব	সিদ্ধ করা অসম্ভব
৫.	ঈশ্বর অদ্বিতীয়	সিদ্ধ করা অসম্ভব
৬.	ঈশ্বর নির্গুণ	ভুল
৭.	ঈশ্বরে সামান্য-বিশেষ নেই	ভুল
৮.	ঈশ্বর লক্ষণ-রহিত, সর্বব্যাপী	সিদ্ধ করা অসম্ভব
৯.	ঈশ্বর কায়াহীন	সিদ্ধ করা অসম্ভব
১০.	দার্শনিক	এদের নাস্তিক হতে হয়
১১.	ঈশ্বর নিজেকে ছাড়া জীবকেও জানেন	প্রমাণ করা যায় না
১২.	ঈশ্বর নিজেকে জানেন	প্রমাণ করা যায় না
১৩.	ঈশ্বর ব্যক্তিকে জানেন না	ভুল
১৪.	ফরিস্তারা ও প্রাণী ইচ্ছামতো চলতে পারে	ভুল
১৫.	ফরিস্তাদের গতির জন্য প্রদত্ত কারণ	ভুল
১৬.	ফরিস্তারা সমগ্র অবয়বী (জগৎ) সম্বন্ধে জ্ঞানী	ভুল
১৭.	অপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে না	ভুল
১৮.	আত্মা এমন এক দ্রব্য যার না আছে গুণ না আছে কায়া	প্রমাণ করা যায় না
১৯.	আত্মা নিত্য	প্রমাণ করা যায় না
২০.	প্রলয় এবং মৃত্যুকে রদ করা যায় না	ভুল

৪. দার্শনিক বিচার

ওপরে যা বলা হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে গজালী সব দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন না। এখন তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত এখানে উদ্ধৃত করলাম—

(১) জগৎ অনাদি নয়—গ্রীক দার্শনিকগণের জগৎ নিত্যতাবাদ ইসলামের পক্ষে বিপজ্জনক, এ শুধু ইসলামের একেশ্বরবাদের ওপর আক্রমণই নয় এমনকি নিরীশ্বরবাদের দিকে আকর্ষণ করার এক শক্তিশালী হাতিয়ার; যেমন, গজালী

এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর লিখতে গিয়ে ব্যক্ত করেছেন, "দার্শনিককে নাস্তিক হতে হবে।" দার্শনিকগণ বলেন জগৎ এক সান্ত, গোলক (সীমাবিশিষ্ট গোলক) কিন্তু অনন্তকাল ধরে বিরাজিত আছে। এটি সর্বদাই ঈশ্বর থেকে নির্গত হয়ে আসছে যেমন কারণ (মাটি) থেকে কার্য (ঘট) সৃষ্টি হয়।

গজালীর বক্তব্য যিনি কালের সান্ততা মানেন তাঁকে দেশের সান্ততাও মানতে হবে, কারণ দেশ-বাহ্যিক এবং কাল অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়, অতএব যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাকে তো মানতেই হবে। আবার যেমন বিষয়ের সঙ্গে দেশের এক সম্বন্ধ আছে তেমনি কালের সম্বন্ধও নির্ণয় হয় বিষয়ের গতি দ্বারাই। দেশ কাল উভয়ই বস্তুর আশ্রয়ী সম্বন্ধ মাত্র। দেশ বস্তুর সেই স্থিতিকে প্রকট করে যা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কাল বস্তুর সেই স্থিতিকে নির্ধারণ করে যা তার সঙ্গে একত্রিত না থেকে আগে বা পরে হয়। উভয়েই জাগতিক বস্তুসমূহের ভিতর এবং একসঙ্গে জাত অথবা বলা যায় যে, দেশ-কাল আমাদের মানস প্রতিবিম্বের (মনের ভিতর যে রূপে বস্তু জ্ঞাত হয় বা তার সম্বন্ধে ধারণা জন্মে, তার) পারস্পরিক সম্বন্ধ, যার স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর। সুতরাং দেশ ও কালের একটির সান্ততা স্বীকার করা এবং অন্যটির ক্ষেত্রে তা অস্বীকার করা ভুল। বস্তুত উভয়েই কৃত (সৃষ্ট) এবং উভয়েরই আদি (আরম্ভ) আছে। আবার, সাদি (যার আদি বা আরম্ভ আছে এমন) দেশকালে অবস্থিত জগৎও সাদি হবে। অতএব ঈশ্বরের সৃজনে (জগৎ-উৎপাদনে) কোনো জগতের আদিত্ব-অনাদিত্বের প্রশ্ন নেই, তিনি নির্মাণকর্মে সর্বত্র-স্বতন্ত্র।

(২) কার্য-কারণবাদ এবং ঈশ্বর —জগৎ অন্তর্বিশিষ্ট বা অনাদি হওয়া সম্পর্কে গজালীর মত আমরা জেনেছি, কিন্তু তর্ক এখানেই শেষ হয়ে যায় না। ঈশ্বর সর্বত্র-স্বতন্ত্র বা কারণ ব্যতীত কার্য করেন বলে মানলে কার্য-কারণের প্রশ্নও তো ওঠে না। কেন না ঈশ্বর নিজে অবিরত এইভাবে সৃষ্টি করছেন তাহলে তো ইমাম অশ্‌অরীর কার্য-কারণ রহিত পরমাণুবাদকে ঠিক বলে মেনে নিতে হবে। গজালীর সামনে দুটি বিষম সঙ্কট, একদিকে কার্য-কারণবাদ মানলে গ্রীক দার্শনিকগণের ন্যায় জগৎকে অনাদি বলে মানতে হয়, না মানলে অশ্‌অরীর পরমাণুবাদের ফাঁদে পড়তে হয়। 'তোহাফতুল-ফালাসিফা' থেকে তাঁর ভাষ্য কিছুটা দেখা যাক—

"(গ্রীক) দার্শনিকগণের ধারণা, কার্য ও কারণের যে সম্বন্ধ দেখা যায় তা এক নিত্য (=সমবায়) সম্বন্ধ, যে জন্য কারণ (মাটি) ব্যতীত কার্য (ঘট) হয় না। সমস্ত সায়েন্স (=প্রয়োগ-সিদ্ধ জ্ঞান)-এর ভিত্তি এই কার্য-কারণবাদ। কিন্তু আমি কেন এই সিদ্ধান্তের বিরোধী তার উত্তর হলো এই যে, একে মানলে পয়গম্বরের অলৌকিক ক্ষমতা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, কারণ বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে নিত্যসম্বন্ধকে স্বীকার করলে তো অপ্রাকৃত ঘটনা অসম্ভব সাব্যস্ত হবে। অথচ ধর্মের ভিত্তি অপ্রাকৃতিক ঘটনার ওপরেই নির্ভরশীল। ...অতএব আমার মতে অগ্নি ও উত্তাপ

সূর্যোদয় ও কিরণের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, সমস্ত কার্য-কারণই প্রতিক্ষণে ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত।"

দার্শনিকগণ এটা কেন মানেন ? এই জন্য যে —"অগ্নি স্বেচ্ছায় প্রজ্বলিত হয় না, এই ব্যাপারে সে স্বভাবত অক্ষম ; অতএব এটা কেমন করে সম্ভব যে, অগ্নি বস্ত্রকে দগ্ধ করবে কিন্তু কোনো সিদ্ধ-পুরুষের আজ্ঞা পালন করে নিজের স্বভাবকে সংযত করে কোনো মসজিদকে দগ্ধ করবে না।…"

এখন অগ্নির স্বভাব ও তাব অক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞান কিভাবে হয় সেই প্রশ্ন উঠতে পারে—

"স্পষ্টতই এই প্রশ্নের উত্তর এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, আমরা দেখি অগ্নি বস্ত্র দগ্ধ করে, কিন্তু এতে কি করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে অগ্নিই বস্ত্র দগ্ধ হওয়ার কারণ ? উদাহরণ স্বরূপ —সকলেই জানেন বিবাহই বংশ-বৃদ্ধির কারণ, কিন্তু এতে কি প্রমাণিত হয় যে শিশুর জন্মের একমাত্র কারণ শুধু বিবাহ ?"

এই ধরনের নানা তর্কবিতর্ক দ্বারা গজালী কার্য-কারণবাদ-রূপ প্রাসাদগাত্রে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র করতে চেয়েছেন ; যাতে সৃষ্টিকে আদি-বিশিষ্ট ঈশ্বরকে সর্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র তথা পয়গম্বরের অপ্রাকৃত দিব্য-ক্ষমতাকে সত্য বলে প্রমাণ করা যায়।

গজালী এখানে অশ্‌অরীর পরমাণুবাদের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন, কিন্তু সহসা আত্মসচেতনতা ফিরে পেয়ে তিনি নিজের ভুল বুঝলেন এবং বললেন—

"কারণেরও কারণ ঈশ্বর তাঁর কৌশল প্রদর্শনের জন্য কার্যকে কারণের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। কারণের পরে কার্য অবশ্যই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হবে যদি কারণের সমস্ত শর্ত পূর্ণ হয়। এও এক প্রকার কারণ, যার দ্বারা কার্যের অস্তিত্ব আবদ্ধ করা হয়েছে —তা কখনই অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এটাও ঈশ্বরেরই প্রভুত্ব এবং ইচ্ছা।…আকাশ ও ভূমিতে অবস্থিত সকল বস্তুই আবশ্যক ক্রমানুসারে এবং অনিবার্য নিয়মেই সৃষ্ট হয়। সৃষ্টির ক্রমানুসারের বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না। বস্তুসৃষ্টির পরম্পরা ঐ শর্তানুযায়ীই হয়ে থাকে। বিশ্বের সকল বস্তু যতটা পূর্ণ তা থেকে পূর্ণতর হতে পারে না। যদি তা হতোও তবে ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করে তাঁর অনুগ্রহকে প্রকট করতেন না, কারণ তা কৃপা না হয়ে হতো কৃপণতা, উল্টো অবিচার। যদি এ রকম করা সম্ভব হলেও তা করতে ঈশ্বর অসমর্থ হন তবে তাঁর অক্ষমতাই প্রমাণিত হয় এবং তা ঈশ্বরতত্ত্বের বিরোধী।"

(৩) **ঈশ্বরবাদ** —অন্যান্য দার্শনিকগণের সঙ্গে গজালীর যে কুড়িটি বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মধ্যে তিনটি প্রধান, প্রথমত জগতের অনাদিত্ব ; যে বিষয়ে আগেই আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ। দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা বলেছেন যে তিনি জ্ঞানময়। যা তাঁর জ্ঞানের অন্তর্গত তাই তাঁর মধ্যে থেকে নির্গত হয়ে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি কিছুই ইচ্ছা করেন না, কারণ, ইচ্ছা তখনই হয়

যখনই কোনো অপূর্ণতা থাকে। ইচ্ছা ভৌতিক পদার্থের অভ্যন্তরীণ গতি—পূর্ণসত্য আত্মা (=ব্রহ্ম) কোনো ইচ্ছা করতে পারে না। অতএব ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে ধারণা ও ধ্যানের দ্বারা প্রাপ্ত হন, ইচ্ছার সেখানে কোনো স্থান নেই।

কিন্তু গজালী ঈশ্বরকে ইচ্ছারহিত বলে মানতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে ঈশ্বরের ইচ্ছা সব সময় তাঁর সঙ্গের সাথী। সেই ইচ্ছা দ্বারাই তিনি কোনোরকম নিয়ম প্রকৃতি ও আত্মার পূর্ব-উপস্থিতি ব্যতীতই এই সৃষ্টি করেন। দার্শনিকের মতে ঈশ্বরের জ্ঞানই সৃষ্টির কারণ, গজালীর মতে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করেন, অতএব তাঁর বস্তুর সামান্য ও বিশেষ উভয় প্রকার জ্ঞানই আছে, এইভাবে গজালী ভাগ্যবাদের ফাঁদেও পড়েছেন, এবং কর্ম-স্বাতন্ত্র্য না থাকায় মানুষের উদ্যোগপরায়ণ হওয়ার শিক্ষাও বৃথা হয়।

(৪) কর্মফল—ঈশ্বরের সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ করার জন্য ইসলামের উকিল গজালীকে মানতে হয়েছে যে জগতের আদি আছে এবং জগৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন; এখন "ঈশ্বরেচ্ছা-বলীয়সী" এই তত্ত্ব মেনে নিলে ভাগ্যবাদকে অস্বীকার করার উপায় থাকে না। প্রথমত জীব মাত্র একবারই জন্মে গজালীর এই সিদ্ধান্ত তাঁকে আরও সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। খোদা মানুষের দৈহিক এবং মানসিক যোগ্যতায় প্রভেদ রাখেন কেন?—এর উত্তর তিনি দিতে পারেননি, কারণ নৈতিকতার জন্য তাঁকে পিথাগোরাস এবং হিন্দুদের ন্যায় পুনর্জন্ম স্বীকার করতে হয়েছে, ফলে পুনরায় সেই জগৎ-জীব-অনাদিত্বের প্রশ্ন অনিবার্যভাবে এসে গেছে। কিন্তু কর্মফল অনুযায়ী মানুষ শাস্তি-পুরস্কার (স্বর্গ-নরক) প্রাপ্ত হয়, এই ইসলামী তত্ত্ব থেকেও ঈশ্বরের প্রতি ক্ষোভ জাগে। দণ্ড দুটি কারণে দেওয়া যায়—প্রথমত, প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত; অথচ এমন কাজ ঈশ্বরের পক্ষে অশোভন। দ্বিতীয়ত, সংশোধনের জন্য; অথচ তাও অনুচিত, কারণ যে সংশোধিত হয়েছে তার কার্যক্ষেত্রে আবার অবতীর্ণ হওয়ার (জগতে আবার জন্মাবার) সুযোগ কোথায়? যদি মনে করা যায় যে ঈশ্বর কোনো স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন কাজ করেন তবে তাঁর ঈশ্বরত্বের ওপরেই আঘাত হানা হয়। এই আশঙ্কার উত্তর গজালী তাঁর 'মজমূন বে আলা-গৈর-অহলে-হী' পুস্তকে দিয়েছেন। যার ভাবার্থ হলো স্থূল জগতে দৃষ্ট কার্য-কারণের ক্রমকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ব্যবহারেই বোঝা যায় যে, বিষ ঘাতক, গোলাপ সুগন্ধদায়ক। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিষপানে আত্মবিসর্জন দেয় তবে তার জন্য ভগবানকে দায়ী করা যাবে না। কর্মফল অবশ্যই প্রাপ্য। আত্মিক জগতের ভাবও এইরূপ। ভালো-মন্দ কর্মের ভালো-মন্দ প্রভাব সব সময় আত্মার ওপর পড়ছে। মানুষ যখন কোনো খারাপ কাজ করে তখন তার আত্মার ওপর সরাসরি যে প্রভাব পড়ে তাকেই দণ্ড বলা যায়। তস্কর তার দুষ্কৃতির জন্য ধরা না পড়লেও অন্তরে সর্বদা ভীত থাকে। বিষপান করে মৃত্যুবরণ করলে যেমন ঈশ্বরকে দোষারোপ করা চলে না তেমনই মন্দকর্মের জন্য দণ্ডিত

ব্যক্তির আক্ষেপও অবান্তর। গজালীর নিজের কথায় : "ভগবানের বিধি অনুযায়ী না চলবার ফলে যে ফল হয় তা ক্রোধ বা প্রতিশোধ নেওয়া নয়। যেমন —যে ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস না করে তার সন্তান হয় না, অভুক্ত থাকলে ঈশ্বর তাকে ক্ষুৎযন্ত্রণা দেন। পাপাত্মা-পুণ্যাত্মার কেয়ামতের (ঈশ্বরের বিচারের দিনের) দুঃখ-সুখ এই নিয়মেই নির্ধারিত হয়। পাপীকে কেন যন্ত্রণা দেওয়া হয় —এটা এবং কেন প্রাণী বিষ খেলে মরে বা বিষ কেন মৃত্যুর কারণ একই রকম প্রশ্ন।"

ঈশ্বর কেন তাঁর ধর্মীয় বিধিনিষেধে মানুষকে আবদ্ধ করেছেন, এর উত্তরে গজালী বলেছেন —"দৈহিক ব্যাধি নিরাময়ের মতো আত্মিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্যও চিকিৎসাশাস্ত্র আছে এবং তার চিকিৎসক হলেন নমস্য পয়গম্বরগণ। চিকিৎসকের নির্দেশের বিরোধিতা করলে ব্যাধি নিরাময় হয় না, তাই তাঁর আজ্ঞা পালন করা কর্তব্য। অবশ্য তাতে যে সর্বদা সুস্থ থাকা যাবে এমন নয়; আসল কথা হলো চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী না চললে ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশী থাকে।"

(৫) আত্মা —মানুষ পয়গম্বর মুহম্মদকেও আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ছাড়েনি। এর উত্তরদানের জন্য আল্লা তাঁর পয়গম্বরকে বলেছেন —"বলো, আত্মা আমার নির্দেশানুযায়ী সৃষ্ট হয়েছে।" এর থেকে বেশী কিছু বলার ক্ষমতা কোরাণ বা পয়গম্বরেরই যখন হয়নি, তখন গজালীর পক্ষে বেশী কিছু বলা তো বিপজ্জনক হতেই পারে, তাই বেচারী তাঁর 'অহ্যাউল-উলুম'-এ বলেছেন যে এ এমনই একটা রহস্যে আবৃত যাকে প্রকট করা উচিত নয়। অবশ্য 'মজনুন-সাগীর' পুস্তকে তিনি ঐ গোপনীয়তাকে উদ্‌ঘাটিত করবার প্রয়োজন অনুভব করেছেন —শেষ পর্যন্ত, 'নির্দেশানুযায়ী' আত্মার উদ্ভব, এই সমাধানে বদ্দুদের সন্তোষসাধন ভালোভাবেই সম্ভব হলেও ফারাবী এবং সীনার শিষ্যগণের মুখ বন্ধ করে রাখা সম্ভব হয়নি। তাই গজালী দর্শনের ভাষায় বলেছেন —"আত্মা শরীর নয় দ্রব্য। এর সম্বন্ধ-বাক্যের সঙ্গে কিন্তু এই সম্বন্ধ এমন যে তার শরীরের সঙ্গে সংযোগও নেই বিয়োগও নেই, তা বাহ্যও নয় অন্তরও নয়, না আধার, না আধেয়।"

আত্মা দ্রব্য —কারণ সে বস্তুকে চেনে। চেনা এবং চিনিয়ে দেওয়া গুণ। গুণ ব্যতীত দ্রব্য হয় না, অতএব আত্মা অবশ্যই দ্রব্য, অন্যথায় তার গুণ থাকে না।

আত্মা শরীর নয়, হলে তার আকার থাকত, অংশ এবং প্রতি অংশের পৃথক রূপ থাকত, যেমন বৃক্ষের কোথাও সবুজ কোথাও বা খয়েরী। আবার এমনও হওয়া সম্ভব যে, কোনো ব্যক্তির (রামের) একাংশে তার জ্ঞান এবং অন্য অংশে সেই ব্যক্তির (রামের) ব্যক্তিক অজ্ঞতা। এই অবস্থায় আত্মা একই সময়ে কোনো বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত থাকতে পারে। কিন্তু এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

যুক্ত নয় বিযুক্তও নয়, অভ্যন্তরীণ নয়, বাহ্যিকও নয়, এমন অবস্থা শরীরেরই হয়। আত্মা যখন শরীর নয়, তখন তার এমন অবস্থা কি করে সম্ভব?

কোরাণ ও মহাপুরুষগণ (পয়গম্বর) আত্মা কি তা বলতে অস্বীকার করেছেন, গজালী এর উত্তর দিয়েছেন —জগতে সাধারণ এবং অসাধারণ দুই ধরনের মানুষ আছেন। সাধারণগণ আত্মা সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে অক্ষম, তাই হম্বলিয়া এবং করামিয়া ঈশ্বরকে সাকার বলে মানেন, কেন না, তাঁদের মতে যা সাকার নয় তা অস্তিত্বহীন। যাঁদের বিচার-ক্ষমতা সাধারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক তাঁরা শরীরধারী ঈশ্বরকে না মেনে তাঁকে দিশাবান মনে করেন। অশ্অরী এবং মোতজলী সম্প্রদায় এই ধরনের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন যাতে শরীর নেই, দিশাও নেই। যদিও তাকে স্রেফ ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব তথা গুণের সঙ্গেই মেনেছেন। আত্মার অস্তিত্বও যদি এমন হয়ে থাকে তবে তাঁদের বিচারে ঈশ্বর এবং আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বস্তুত আত্মা কি তা সাধারণ এবং অসাধারণ উভয় শ্রেণীরই বুদ্ধি সীমার বাইরে, তাই একে ব্যাখ্যা করতে গেলে যথেষ্ট দ্বিধার মধ্যে পড়তে হয়।

গজালী আত্মার যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলেছেন তা গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নয়।

"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"-এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গজালী বলেছেন—

"ওয় লৈস'ল্-বদ্ণী মিন্ কওয়ামে জাতেকা
ফ ইন্হদাম'ল্ বদ্নে লা যঅ্দমো-কা।"

(শরীব তোমার স্বরূপে নেই, অতএব শরীরটা নষ্ট হলেই তোমার বিনাশ হয় না।)

(৬) অন্তিম বিচারের দিনে পুনরুজ্জীবন (কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন) —মরণশীল ব্যক্তি তার অন্তিম ন্যায়ের দিন ফরিস্তা ইস্রাফিলের ইঙ্গিতে উঠে দাঁড়াবে। দেখা যাচ্ছে ইসলামেও ইহুদী এবং খৃষ্টানগণের ন্যায় পুনরুজ্জীবনকে মানা হয়েছে। বদ্দুগণের মধ্যেও কিছু বস্তুবাদী ছিলেন, যাঁরা এই তত্ত্ব মনে করতেন ত্রুটিপূর্ণ, বদ্দু কবি আলহাদের নিজের স্ত্রীর নিকট উক্তি—

"অমোতো সুম্ম বঅস সুম্ম নস্রা।
হদীসে খুরাফাত যা' উম্-অমরূ"

(মৃত্যু, পুনর্জীবন, আবার সেই জীবিকা নির্বাহ। অমরুর মা! এ তো সেই অপমানজনক উক্তি।) —থেকেই তা বোঝা যায়। গজালী এই উক্তিকে তাঁর ও দার্শনিকদের মধ্যের তিনটি বড় মতভেদের মাধ্যমে মেনেছেন। দার্শনিকগণ আত্মাকে অমর মনে করেন, শরীরকে নশ্বর। কেয়ামতে মৃতের পুনরুজ্জীবন নিয়ে ইসলামে দুই ধরনের মত আছে —(১) প্রথম মত হলো আব্দুল্লা বিন্-আব্বাসের মতো লোকের, যাঁরা কেয়ামতের পর মিলনেচ্ছু সমস্ত বস্তুকে বর্তমান দুনিয়ার বস্তুর সঙ্গে স্রেফ নামমাত্র সমানতা বলে মানতেন —মদ্য পান করা হবে কিন্তু নেশা হবে না, আহার করবে, কিন্তু প্রাকৃতিক কৃত্য হবে না, এইভাবে শরীর প্রাপ্ত হবে কিন্তু তা এই শরীর নয়। (২) দ্বিতীয় মত অশ্অরীগণের, যাঁরা মনে করতেন কেয়ামতে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত দেহ, এমনকি সমস্ত বস্তুই ইহজগতের মতোই অপরিবর্তনীয় রূপে

থাকে। এঁরা ছাড়া তৃতীয় মতাবলম্বী বাহ্যিক বিচার ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত সুফীগণ বলেন—

"হূর্-ও খুল্দ্-ও কৌশর এ বাঅজ অগর খুশকর্দ ই।
বজ্‌মে মা-হ্‌ম শাহিদ্-ও নক্ল্-ও শরাবে বেশ নেস্ত্।"

(ধর্মবক্তা! অপ্সরা, বাগিচা, নদী আমাদের খুশী করার জন্য যদি থাকেও তবু নিশ্চয়তা আমাদের অমোদ-পমোদ এবং মদ্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়।) গজালী তৃতীয় পথের পথিক হয়েও প্রথম দুটি মতকে নিজের সঙ্গে রাখতে চেয়েছেন —"ঐ প্রিয়তমের সৌন্দর্য-জগতের বাইরে স্বীয় অন্তরে সৌন্দর্য এবং সুগন্ধিভাব প্রেমিক হৃদয়কে উৎফুল্ল রাখে।"

ভালো! এ তো স্বর্গের কথা! প্রশ্ন ওঠে যে কেয়ামতে পুনর্জীবন প্রাপ্তির পর সেই পুরনো দেহই প্রাপ্তি হয়, না, অন্য কোনো শরীর? অ্‌শঅরীর মতে সেই পুরনো আকৃতি। আবারও প্রশ্ন ওঠে যার বিনাশ হয়েছে তার পুনরাকৃতি পাওয়া অসম্ভব নয় কি? ধরা যাক এক ব্যক্তি আর একজনকে হত্যা করে ভক্ষণ করল। অতঃপর নিহতের শরীর-পরমাণু হত্যাকারীর শরীরে মিশে এক হয়ে গেল। এখন হত্যাকারী কেয়ামতে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হলে যদি তার আকৃতি আগের মতোই থাকল তবে নিহত ব্যক্তির আকৃতি নিশ্চয়ই তার মতো হতে পারে না। গজালীর মতে মৃত পুনর্জীবন পেলেও পুনরাকৃতি যে পাবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

(৭) সুফীবাদ —গজালীর অক্ষম পদযুগল সুফীবাদে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং তাঁর সমকালীন কতিপয় মহা-পণ্ডিতের মন্তব্য জানতে চান তো আবুল-বলীদ তর্তূশীর বচন শুনুন: "আমি গজালীকে দেখেছি। তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রতিভাবান, পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে অধ্যয়ন অধ্যাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সব ত্যাগ করে সুফীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং দার্শনিকগণের বিচারসমূহ তথা মনসুর-হল্লাজের (সুফী) রহস্যময় বচনকে ধর্মের সঙ্গে একত্রিত করে দিলেন। ইসলামিক মীমাংসক এবং যুক্তি-শাস্ত্রজ্ঞগণকে তিনি মন্দ বলতে শুরু করেন, এবং ধর্মের সীমা অতিক্রমই করেন বলা চলে। তিনি অহ্যাউল-উলুম লিখেছেন …তবুও পূর্ণভাবে তা জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁর একমাত্র জোর ছিল বাক্‌শক্তির, তাই তাঁর সমগ্র পুস্তকটি দুর্বল প্রমাণহীন বচনে ঠাসা, পয়গম্বর বচনের (পরম্পরা) উদ্ধৃতিই তিনি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন।"

বেচারা তর্তূশী ছিলেন একজন ভুক্তভোগী ও সমব্যথী প্রচারক। তিনি দেখেছেন যে গজালী কিভাবে তাঁরই সমকক্ষ ইসলামী মীমাংসক এবং তার্কিকগণের প্রতি আক্রমণ চালিয়েছিলেন, তাই তিনি গজালীর দূরদর্শিতা এবং গম্ভীর বিচারধারাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন।

সুফীবাদের প্রতি গজালী যে কতটা আস্থাশীল ছিলেন তা তাঁর এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়: "যিনি সুফীবাদের অপার আনন্দের আস্বাদ পাননি, তিনি

পয়গম্বরী নামটি জানলেও তার স্বরূপকে জানতে অক্ষম। ...স্থফীগণের জীবন যাপনের অভ্যাস থেকেই পয়গম্বরীর আসল স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আমি জেনেছি।"

গজালীর আগে থেকেই ইসলামের ভেতর স্থফীবাদ যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে এবং তারই স্থব্যবস্থিত শাস্ত্রসম্মত রূপটি দান করেন গজালী। গজালীর পূর্বেও স্থফীবাদের ওপর তুটি পুস্তক রচিত হয়েছিল—

(১) কুবতু'ল কুলুব — আবুতালীব মক্কী

(২) রিসালা কেসরিয়া — ইমাম কেসরী

কয়েকজন প্রথমে কর্মযোগের ওপর জোর দিয়েছিলেন, এবং কয়েকজন সমাধি-যোগের ওপর। গজালী উভয়বাদকেই একত্র করেন। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ইবনে-খলতুন বলেছেন: "গজালী উভয়বাদকেই তাঁর অহাউল-উলুমে একত্রিত করেন ...পরিণামে স্থফীবাদও এমন এক শাস্ত্রে পরিণত হয় যা প্রথমে ছিল কেবলমাত্র উপাসনা।"

স্থফীগণের 'অহংব্রহ্মবাদ' শঙ্করের ব্রহ্মবাদেরই প্রতিধ্বনি। স্থফীগণ তর্কশাস্ত্রের ওপর জোর দিতে চাননি, তাঁরা জানতেন যে দর্শনের দ্বারা যুক্তিকে খণ্ডিত করা যায় না, তাই তাঁরা রহস্যবাদের শরণ নিয়েছিলেন।

"খোদার কসম! যতক্ষণ না পান করা যায় ততক্ষণ এই পেয়ালার আস্বাদ অজ্ঞাতই থাকে।"

(৮) পয়গম্বরবাদ —দার্শনিকগণ ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন যে এতে এই মনভোলানো বাক্যে বিশ্বাস করা হয়েছে যে—খোদা তাঁর দূত হিসেবে পয়গম্বরগণকে পাঠিয়ে তাঁদের মাধ্যমে নিজের শিক্ষা-পুস্তক প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। গজালী পয়গম্বরগণের সপক্ষে বলেছেন: "মানুষ অজ্ঞ হয়েই জন্মগ্রহণ করে। নবজাত শিশু ...জাগতিক বস্তুর সঙ্গে পরিচিত থাকে না। সর্বপ্রথমে স্পর্শজ্ঞানের দ্বারা বস্তুর পরিচয় —শীতল-উষ্ণাদি প্রাপ্ত হয়...। এরপর দৃষ্টিশক্তি ...শ্রবণ ...খাদ্যের আস্বাদানুভূতি। ...এইভাবেই ইন্দ্রিয় সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়...। শুরু হয় নতুন যুগ। এখন সে বিবেকপ্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বস্তুসমূহকেও অনুভব করে। বিবেচনার সঙ্গে আসে বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা সম্ভবাসম্ভব উচিতানুচিত জ্ঞান। বুদ্ধি-সীমারও পরে আছে আর এক জ্ঞানের জগৎ। যেভাবে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাত বিষয়কে জানা যায় কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা যায় না, সেইভাবেই ঐ জ্ঞানের জগতে বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়ের মতোই নিষ্কর্মা হয়ে থাকে। এরই নাম পয়গম্বরী।"

পয়গম্বরের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রেরিত বাণী সম্পর্কে গজালী বলেছেন: "কিছু ব্যক্তি এত জড়বুদ্ধি যে বোঝালেও বোঝে না, কেউ বা এত তীক্ষ্ণধী যে ইঙ্গিতমাত্রই অনুধাবন করতে পারে, আবার প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়েও আন্তরানুভূতি দ্বারা সমস্ত জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেন ...নমস্য পয়গম্বরগণের এটাই

একমাত্র উপমা। কারণ কোনো শিক্ষা ব্যতীতই সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ তাঁদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। এরই নাম অলহাম্ (ঈশ্বরের নির্দেশ পাওয়া)। আঁহজরত (মুহম্মদ) বলেছেন সেই পবিত্রাত্মাই আমার অন্তরে এই চিন্তা জাগিয়েছেন, এ তাঁরই অভিপ্রায়।"

পয়গম্বরীর ক্ষেত্রে অলৌকিকত্ব মানা হয় এবং একে সঠিক বলে সিদ্ধ করার জন্য গজালীর দলিলের কথা কার্য-কারণবাদ প্রকরণেই আলোচিত হয়েছে।

(৯) কোরাণের লাক্ষণিক ব্যাখ্যা—মোতজলা এবং পবিত্র-সংঘের বর্ণনায় কোরাণের কিছু বাণীর শব্দার্থ ত্যাগ করে ভাবার্থ দ্বারা স্বীয় মতকে পুষ্ট করতে দেখা গেছে। ইমাম আহমদ বিন্-হামবল ছিলেন লাক্ষণিক অর্থের শক্তিশালী বিরোধী। তিনি মনে করতেন যদি এইভাবে লাক্ষণিক অর্থ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে আরবী ইসলামকে শুধু কোরাণের তলানিই চাটতে হবে। অথচ তাঁকেই পয়গম্বরী বাক্যের মুখ্যার্থের স্থলে লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করতে হয়েছিল—

"কাবার কৃষ্ণ-পাষাণ (সংঘ-অস্‌বদ) স্বয়ং খুদার হস্ত; মুসলমানের হৃদয় তাঁর অঙ্গুলিহেলনের দাস।" "মৃত্যুর সময়ে খুদার সুগন্ধ আসে।"

সুফীগণের তো লাক্ষণিক অর্থ ব্যতীত কাজই চলে না এবং গজালী যে কিভাবে স্বর্গের বর্ণনা করেছেন তা আগেই বলা হয়েছে।

(১০) ধর্মে অধিকারীভেদ—প্রতিটি সুফীরই মোল্লাগণের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাইরে থেকে ইসলামীধর্মের নিয়ম মানা প্রয়োজন ছিল, সেই সঙ্গে সুফীবাদের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রেখে তাঁদের বহু ধর্মীয় সংযম এবং বিচারের মধ্যে বিরোধিতা করতে হয়েছিল। এই ভিতরে একরকম বাইরে অন্যরকম আচরণের ফলে মানুষের মনে সন্দেহ হতে পারে, অতএব অধিকারীভেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। এই অধিকারীভেদ-সিদ্ধান্তের পুষ্টি সাধনে পয়গম্বরের জামাতা তথা চতুর্থ খলিফা আলীর কিছু বচন উদ্ধৃত করা হলো: "যে বাণী মানুষের বোধগম্য তাকে গ্রহণ করো, যা বুদ্ধিসীমার বাইরে তাকে ছেড়ে দাও।"

গজালী, বাতনী শীয়াগণের বিরুদ্ধে কিছু পুস্তক রচনা করেছিলেন, কিন্তু আলীর ঐ বচনের সঙ্গে সর্বদাই সহমত পোষণ করতেন। এখানে বিরোধীগণকে নস্যাৎ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "কোনো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই বিদ্যার গুপ্ত এবং ব্যক্ত এই দুই ভেদকে অস্বীকার করতে পারেন না। যারা ছেলেবেলা থেকে কিছু কথা শিখে তাই আঁকড়ে ধরে থাকে তারাই কেবল একে অস্বীকার করে।"

স্বীয় অভিসন্ধিকে আরও স্পষ্ট করতে গজালী বলেছেন: "খোদা (কোরাণে) বলেছেন, ভগবানের পথে এবং যুক্তি ও সুন্দর উপদেশের দ্বারা আরও সঠিকভাবে কথা বলো।" জানা দরকার কিছু মানুষ যুক্তির ব্যবহার পছন্দ করেন এবং একদল উপদেশ দ্বারা মানুষকে বোঝাতে চান। যিনি উপদেশের দ্বারা চালিত

হওয়ার যোগ্য (অধিকারী) তাঁর ক্ষেত্রে যদি যুক্তি বা দর্শন ব্যবহার করা হয় তবে তা তাঁর পক্ষে হবে ক্ষতিকারক —দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মাংস খাওয়ানোর তুল্য। আবার যুক্তিবাদীর নিকট উপদেশের ব্যবহার ঘৃণার উদ্রেক করে —যেমন স্বনির্ভর বলিষ্ঠ পুরুষের নিকট মাতৃদুগ্ধ। আবার উপদেশ যদি মনোরম ভঙ্গিতে পরিবেষণ না করা যায় তবে তা হবে খেজুর খেতে অভ্যস্ত বদ্দুদের কাছে ঘাসের রুটির মতো।...”

(১১) যুক্তি (=দর্শন) এবং ধর্মের সমন্বয়—গজালীর জীবনী আলোচনা করে আমরা দেখেছি যে বাগদাদে আসবার পর তাঁর মনে কিভাবে ধর্ম ও যুক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল এবং তর্তূশীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ‘ধর্মত্যাগী হয়েছিলেন।’ কিন্তু তিনি মনন দ্বারা যুক্তি ও ধর্মের সমন্বয় সাধনে সফল হয়েছিলেন। তাঁর সুফীবাদ, লাক্ষণিক ব্যাখ্যা, অধিকারীভেদ-বাদ প্রভৃতির মধ্যে এই প্রযত্নেরই চিহ্ন দেখা যায়। গজালীর জীবৎকালেই তাঁর কীর্তি ইসলামী জগতে বহুদূর বিস্তার লাভ করেছিল। কিভাবে তাঁর শিষ্য মুহম্মদ তোমরত স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে ‘গজালী সম্প্রদায়’-এর প্রতিষ্ঠা তথা এক নব্য মহান্‌ রাজবংশ স্থাপনায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা পরে বলব। কিন্তু তোমরতের সাফল্যের আগে গজালীর জীবনেই ৫০০ হিজ্‌রী সনে (১১০৭ খৃঃ) এ রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যখন কি-না স্পেনের খলিফা আলী (ইবনে-ইউসুফ) বিন্‌-বাসকীনকার আদেশে মারিয়ায় গজালীর পুস্তকসমূহ —বিশেষত অহ্যাউল-উলুম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিরোধিতা দেখতে দেখতে গজালী অনুভব করেন যে যুক্তি ও ধর্মের দ্বন্দ্বকে স্থিতিশীল রাখা দরকার —“কিছু ব্যক্তির ধারণা বৌদ্ধিক জ্ঞান ও ধর্মজ্ঞানের মধ্যে (অনড) বিরোধ আছে, এবং এই দুই-এর মধ্যে মিলন অসম্ভব। কিন্তু এই ধারণা অনুভূতির সংকীর্ণতার ফল।

“যারা বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অনুকরণ এবং অনুসরণ করতে মানুষকে উৎসাহ দেয় তারা মূর্খ, আবার যারা শুধু বুদ্ধিতে আস্থাশীল হয়ে কোরাণ ও পয়গম্বর-বাণীকে (হদীস) অগ্রাহ্য করে তারা অহংকারী। সাবধান! কখনও একপক্ষ অবলম্বন কর না। তোমার মধ্যে উভয়েরই সমন্বয়-সাধন দরকার। বৌদ্ধিক বিদ্যা আহার এবং ধর্মশিক্ষা ঔষধের তুল্য।”

গজালীর এই বিচারপদ্ধতিই তাঁকে লিখতে বাধ্য করিয়েছে যে দর্শনের চরম শত্রুই ইসলামের পরম মিত্র।

“অনেকেই ইসলাম সমর্থনের এই অর্থ করেন যে, দর্শনের সমস্ত সিদ্ধান্ত ধর্মের বিরুদ্ধে বলে প্রমাণ করা যায়। অথচ দর্শনের বহু সিদ্ধান্তই দৃঢ় প্রমাণ সিদ্ধ, অতএব প্রমাণে অভিজ্ঞজন বোঝেন যে এই সিদ্ধান্ত সঠিক। যখন তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ইসলামবিরোধী বলে মনে হয় তখনও ঐ সিদ্ধান্তে সন্দেহ জাগার পরিবর্তে

ইসলামের প্রতিই সন্দেহ জাগে। এই কারণে ইসলামের অন্ধস্তাবকদের দ্বারাই তার চরম ক্ষতি সাধিত হয়।"

গজালীর এই বিচার যে সনাতনপন্থী মুসলমানগণ এবং তাঁদের সর্বদা ভীতি-প্রদর্শনকারী মোল্লাদের তাঁর বিরোধী করে তুলেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সত্ত্বেও গজালীর প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। তাঁর বিরোধী ইবনে-তৈমিয়ার কথা হলো: "মুসলমান এবং মোল্লাগণ তার্কিক ভঙ্গি বুঝতে পেরেছিল। এই তর্কের প্রচলন গজালীর সময় থেকেই শুরু হয়। তিনি গ্রীক যুক্তিবাদের মন্তব্যকে তাঁর পুস্তক —মুস্তস্ফী-তে একত্রিত করে নিয়েছেন।"

৫. সামাজিক বিচার

গজালীর ন্যায় উর্বরমস্তিষ্ক ব্যক্তি যে শুধু ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেই নিজের বিচার বিশ্লেষণ সীমিত রাখবেন তা হতে পারে না। তাই এখানে তাঁর সামাজিক সিদ্ধান্তেরও কিছু পরিচয় দিলাম।

(১) রাজতন্ত্র সম্বন্ধে —গজালী ইসলামী সাহিত্যে কবীলাদের মধ্যে সারল্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতির প্রচুর উদাহরণ পাঠ করেছিলেন। যখন তিনি এগুলিকে সমকালীন রাজন্যবর্গের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করলেন তখন তাঁর অন্তরে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল। ফলে তিনি রাজতন্ত্রের ওপর আঘাত হানা শুরু করলেন। যেমন—

"আমার সমকালীন সুলতানগণের অধিকাংশ আয়ই হয় কুপথে, আর হবে না-ই বা কেন? সমস্ত আমদানীই তো জাকাত (ঐচ্ছিক কর) এবং যুদ্ধের লুঠ (মালেগনীমত) থেকে আসে। বর্তমানে সেগুলির অস্তিত্ব নেই। এখন রয়ে গেছে শুধু জজিয়া (বাধ্যতামূলক কর)। এটা এমন জবরদস্তি করে আদায় করা হয় যা অনুচিত এবং ধর্মসম্মত নয়।"

গজালী সুলতানের দরবারে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেও তাঁকে একবার সনজরের দরবারে হাজির হতে বাধ্য করা হয়েছিল, তবুও তিনি সুলতানের সঙ্গে অসহযোগিতা করার শিক্ষাই দিয়েছেন—

"সুলতানের দরবারে গেলে মানুষকে পাপের ভাগী হতেই হয়। প্রথমেই দেখা যায় রাজপ্রাসাদ যা অন্যের ওপর জুলুম করে আদায় করা অর্থে নির্মিত, সেখানে পাদস্পর্শও পাপ। দরবারে প্রবিষ্ট হয়ে মস্তক অবনত, হস্তচুম্বন এবং সুলতানকে অহেতুক সম্মান প্রদর্শন করা পাপ। দরবারে জরী-চুমকির পর্দা, রেশমী ঝালর, স্বর্ণনির্মিত তৈজসপত্র সকলই জঘন্য এবং এগুলি দেখে প্রতিবাদ না করা পাপ, এবং বাদশাহের ধন-দৌলত বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা মহাপাপ।"

গজালী তাই পরামর্শ দিয়েছেন: "এমনভাবে সুলতানকে এড়িয়ে চলতে হবে যেন কোনোভাবেই তাঁর সম্মুখীন হতে না হয়। এতেই মঙ্গল হবে। সুলতানের

অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্তরে সর্বদা বিদ্বেষ পোষণ করা দরকার। কখনও তার স্তাবক এবং কৃপাপ্রার্থী হতে নেই। সুলতানের জীবন-যাপনে কৌতূহল প্রকাশ ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনো দরকার নেই।"

এক জায়গায় গজালীর নিষ্ক্রিয় অসহযোগ সামান্য কিছু শর্তের সঙ্গে কিছু সক্রিয়তার রূপও নিতে চেয়েছে: "সুলতানের বিরোধিতা করার ফলে যদি দেশে অরাজকতার আশঙ্কা থাকে তবে তা না করাই উচিত। কিন্তু যদি মাত্র নিজের ধন-প্রাণের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তবে তা করা তো উচিতই এমনকি প্রশংসার্হ। প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ আকছার নিজের বিপদকে তুচ্ছ করে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতেন এবং সুলতান ও আমীরগণকে বিদ্রূপ করতে দ্বিধা করতেন না। জীবন বিপন্ন হলেও তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন কারণ এতে পাওয়া যেত শহীদের মর্যাদা।"

শুধু তাই নয় তাঁর হৃদয়ে এমন কল্পনাও কাজ করেছে যাতে এই রাজ্যের পতন ঘটিয়ে এমন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, যার শাসকের মধ্যে একাধারে থাকবে বদ্দু-সর্দারের সারল্য ও সৌভ্রাত্রগুণ, আর প্লেটোনিক প্রজাতন্ত্রের নেতা, দার্শনিক, অথবা স্বয়ং গজালীর ন্যায় সুফী-গুণ। যদিও এই কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে গজালী সক্ষম হননি, তবে তাঁর শিষ্য তোমরত হয়েছিলেন।

(২) কবীলাশাহী আদর্শ—গজালী না ছিলেন ব্যবহার-কুশল বিচারক, না ছিল তাঁর সাহস ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার প্রবৃত্তি। সুলতান আমীরগণের নিকট তিনি সঙ্কুচিত থাকতেন, একদিকে সলজুকিকে সেলাম করা অন্যদিকে পয়গম্বর মুহম্মদের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে বসে থাকা গজালীর চিন্তাশক্তিকে অক্ষম করে দিয়েছিল। গজালী স্বয়ং যদি আমীর বাদশাহ্ হতেন তাহলে তাঁর ব্যাখ্যাও হতো অন্যরকম। কিন্তু তাঁর স্মৃতিতে বাল্যকাল বড় স্পষ্ট ছিল। ভর্তৃহরির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়—

> "ভ্রান্তম্ দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
> ত্যক্তবা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃত্য নিষ্ফলা।
> ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহে সাশংকয়া কাকবৎ॥" —(বৈরাগ্য শতক)

(বহু দুর্গম দেশ ভ্রমণ করে, অনেক প্রবঞ্চিত হয়ে জাত্যভিমান ত্যাগ করে দাস্য বৃত্তি করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। পরান্নপালিত কাকের মতোই শুধু দুয়ারে দুয়ারে তাড়া খেয়ে ফিরেছে।) অনাথ গজালী কতদিন অভুক্ত থেকেছেন, কত শীতের রাত তাঁর কেটেছে বস্ত্রহীন অবস্থায়। মানুষের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে তিনি তাঁর তিরস্কার ও বেদনাদগ্ধ জীবনকে অনুভব করেছেন। যদিও ৩৪ বছর বয়সের পর তাঁর নিকট সকল বস্তুই এত সহজলভ্য হয়েছিল যে, ইচ্ছে করলে তিনি আমীর বাদশাহের মতো বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতে পারতেন, কিন্তু সামর্থ্য থাকলেও তাঁর মানসিক প্রস্তুতি ছিল না, তাঁর মানসিক বোঝাপড়া ছিল কেবল ধর্ম ও যুক্তি-

বাদের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে। পয়গম্বর ও তাঁর সঙ্গীগণের শান্তি, সৌভ্রাত্র, সাম্য ভাবকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর কি জানা ছিল লক্ষ বর্ষ ধরে বিকাশিত হওয়ার পর প্রকৃতি মানবজাতিকে কবীলারূপে পরিণত হওয়ার অবকাশ দিয়েছে। নিজের বর্ধিত প্রয়োজন সংখ্যা, বুদ্ধি এবং জীবন সাধনা, একত্রিত হয়ে তাকে পরবর্তী ধাপ সামন্তবাদের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য করেছিল। কবীলাশাহী প্রভুত্বকে দূর করে সামন্তশাহী প্রভুত্ব স্থাপন করতে হাজার বছর ধরে যে নর-সংহার হয়ে চলেছিল, তারই কিছু অংশ হলো মাবিয়া-আলীর দ্বন্দ্ব, কারবালা প্রাঙ্গণের পরিণতি। অবশ্য এগুলি তো ক্ষুদ্র, নগণ্য। এতগুলি সংঘর্ষের পরেও অগ্রসরমান ইতিহাসকে অতীতের অন্ধকারে নিক্ষেপ করা প্রকৃতির পক্ষে যে অসাধ্য গজালী কিন্তু তা বোঝেননি। তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করার ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করতেন। তাঁর গ্রন্থে বদ্‌হ্-সমাজের কিছু ঘটনার উদ্ধৃতি থেকেই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়: (১) "একবার আমার মাবিয়া মানুষকে বৃত্তি দান বন্ধ করেন। এতে আবু-মুসলিম খৌলানী সভার মধ্যে উঠে বলেন 'এই মাবিয়া! এই আমদানির পয়সা তোর বা তোর বাপের আয় নয়'।"

(২) "আবু-মুসার রীতিই ছিল উপদেশ কালে খলিফা উমরের নামে দুয়া (প্রার্থনা) করা। ...ঠিক ঐ সময়েই জব্বা প্রশ্ন করলেন—'তুমি কেন আবু বকরের নাম নাও না? তার চেয়ে উমর কি মহান্?' এই কথা উমরের কানে গেলে তিনি জব্বাকে মদিনায় ডেকে পাঠান। জব্বা উমরকে প্রশ্ন করেন—'আমাকে ডেকে পাঠানোর কি অধিকার তোমার আছে?' ...জব্বা মুসার প্রশংসকও ছিলেন। এরপর তিনি উমরের সকল প্রশ্নের জবাব দেন। শুনে উমর ক্রন্দন করে বলেন— 'তোমার অধিষ্ঠান সত্যের ওপর। আমার অপরাধ ক্ষমা কর'।"

(৩) "হারূণ ও সোফিয়ান ছিলেন বাল্যবন্ধু। হারূণ বাগদাদের খলিফা হলে সকলেই তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে আসেন, আসেননি শুধু সোফিয়ান। হারূণ এক পত্রে সোফিয়ানকে লেখেন—'ভাই সোফিয়ান ...তুমি তো জানো আল্লা সকল মুসলমানকেই ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ করেছেন। তোমার ও আমার মধ্যে পূর্বের বন্ধুত্ব অম্লান। আমার খলিফা পদ লাভে সকলেই আনন্দিত হয়ে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, আমিও তাঁদের বহুমূল্য পুরস্কারে ধন্য করেছি। শুধু তুমি না আসায় বড় দুঃখ পেলাম। আমি নিজেই তোমার কাছে যেতে পারতাম, কিন্তু খলিফার কাজে ব্যস্ত থাকায় তা সম্ভব হলো না। যাই হোক, এখন অবশ্যই আমার আমন্ত্রণ রক্ষা কর'।"

সোফিয়ান পত্রটি না পড়েই ফেলে দিয়ে বলেন—"এটাতে প্রতারকের (রাজার) হাতের স্পর্শ আছে, আমি একে স্পর্শ করতে চাইনে।" অতঃপর ঐ পত্রেরই উল্টোদিকে অন্য একজন দ্বারা উত্তর লিখিয়ে তা পাঠিয়ে দেন—

"দুর্বল দাস সোফিয়ানের নিকট থেকে ধনকুবের হারূণের উদ্দেশে! আমি তো

প্রথমেই তোকে সজাগ করে দিয়েছি যে তোর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। তুই নিজের পত্রেই স্বীকার করেছিস যে মুসলমানের কোষাগার হতে অর্থ নিয়ে তুই বিনা প্রয়োজনে অন্যায়ভাবে ব্যয় করেছিস। এতেও তুই সন্তুষ্ট হসনি। এখনও চাইছিস যে আমার অন্তিম কালে আমি তোর স্তুতি করব! হারুণ! আগামী দিনে আল্লার নিকট তোকে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আজ তুই সিংহাসনে বসে সভা আলোকিত করছিস, মূল্যবান পোশাক পরিধান করছিস; তোর দরজায় সশস্ত্র প্রহরা। তুই এখন তোর আমলাদের সঙ্গে মদ্যপান করিস, আর অন্যকে মদ্যপানের জন্য শাস্তি দিস। নিজেরা ব্যভিচারিতায় ডুবে থেকেও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব দেখাস। নিজে চুরি করিস অথচ অন্য চোরের হস্তচ্ছেদ করিস। এই অপরাধ সমূহের জন্য আগে তোর ও তোর কর্মচারীদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন ···আর কখনও আমাকে পত্র লিখবি না।"

"এই লিপি যখন হারুণের হস্তগত হয়, তখন আত্মগ্লানিতে ভেঙে পড়ে তিনি বহুক্ষণ ক্রন্দন করেন।"

গজালী একদিকে দার্শনিকগণের কল্পনার স্বচ্ছন্দবিচরণের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, অন্যদিকে চেয়েছিলেন কবীলাশাহীর সারল্য এবং সাম্য —কোথায় কবীলাশাহী আর কোথায় কল্পনার স্বাধীনতা!

(৩) ইসলামিক পন্থাসমূহের সমন্বয়—ইসলামের সম্প্রদায় সমূহের অভ্যান্তরীণ দ্বন্দ্বের সমাধান করা ছিল গজালীর মূল উদ্দেশ্য। দর্শনে তাঁর সর্বাধিক শক্তিশালী বিরোধী রোশদ বলেছেন –

"গজালী তাঁর পুস্তকে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করেননি, এমনকি অশ্‌অরীদের সঙ্গে অশ্‌অরী, সুফীদের সঙ্গে সুফী দার্শনিকের মতোই ব্যবহার করতেন।"

গজালীর সময়ে সিন্ধু থেকে কাসগর ও মরক্কো থেকে স্পেন পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম এত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে ঐ বিস্তৃত ভূখণ্ডে অন্য কোনো ধর্মই স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম ছিল না। ইসলামের কুড়িটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাবও হয় এই সময়েই, যার মধ্যে অশ্‌অরী, হামবলি এবং বাতনী (শীয়া) এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়,শাসনক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্পেনের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল হামবলির হাতে। বাতনীগণ মিশরের ওপর অধিকার বিস্তার করেছিল। এবং খুরাসান বা পূর্ব-ইরাণ থেকে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের ওপর প্রাধান্য ছিল অশ্‌অরী সম্প্রদায়ের। বাতনীগণ শীয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অতএব তাদের বিরুদ্ধে যদি আলী মুবিয়ার সময় থেকে অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলে থাকে তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আশ্চর্য এটাই যে অশ্‌অরী-হামবলি উভয়েই সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তের নেশায় মেতে উঠেছিল। শরীফ আবুল-কাসেম

ছিলেন বিখ্যাত উপদেশক (৪৭৫ হিজ্‌রী বা ১০৮২ খৃঃ)। মহামন্ত্রী নিজামুলমুল্‌ক তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বাগদাদের নিজামিয়ার ধর্মোপদেষ্টার পদে নিয়োগ করেন। তিনি মসজিদের ধর্মাসন থেকে স্পষ্ট ভাষায় হামবলিদের কাফের বলে ঘোষণা করেও সন্তুষ্ট হননি, এমনকি প্রধান বিচাপতির নিকট এমন কথা বলেন যাতে প্রচণ্ড অরাজকতার সৃষ্টি হয়। আর্সেলন সলজুকির শাসনকালে মুদ্দতিন মসজিদের ধর্মাসন থেকে অশ্‌অরী এবং শীয়াদের প্রতি ধিক্কার জ্ঞাপন করা হয়। মহামন্ত্রীপদ লাভের পর নিজামুলমুল্‌ক এই ধিক্কার রোধ করেন, কিন্তু শীয়াগণের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। আবু-ইসহাক্‌ সিরাজী ছিলেন বাগদাদের বিদ্বন্মণ্ডলীর অন্যতম, তিনিও হামবলিদের সমালোচনা করাকে নিজের অধিকার মনে করতেন। এরই ফলে একবার বাগদাদে মার-দাঙ্গা ঘটে।

সেই সময়ে যখনই যে সম্প্রদায় ক্ষমতাশালী হয়ে উঠত তখনই সে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে দ্বিধা করত না। মোতজলী সম্প্রদায়ের নেতা এবং মহাপণ্ডিত ইবনে-আসীর (মৃত্যু ৪৭৮ হিজরী তথা ১০৮৫ খৃঃ) বিরোধীদের আতঙ্কে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ঘরের বাইরে যেতে পারেননি। এই দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, হত্যা ও অরাজকতার নিন্দা করে গজালী লিখেছেন—

"ধার্মিক ও বিদ্বানগণও হঠকারিতার আশ্রয় নিচ্ছেন। তাঁরা বিরোধী সম্প্রদায়গুলিকে ঘৃণা ও অসম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখেন। অথচ এঁরা যদি নম্র হয়ে ভদ্রভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকৃত হিতৈষীর মতো আলোচনার দ্বারা পরস্পরকে বোঝার ও বোঝাবার চেষ্টা করতেন তাহলেই বেশী সফল হতেন। কিন্তু নিজেদের প্রাধান্য ও ক্ষমতাকে দীর্ঘায়ু করতে যেমন দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন, তেমনি আবার তার জন্য ধর্ম-প্রেম দেখানো তথা বিরোধীদের গালি দেওয়াও প্রয়োজন। এজন্য বিদ্বান ব্যক্তিরাও হঠকারিতাকেই অস্ত্র বলে গ্রহণ করেছেন। অথচ এরই নাম দেওয়া হয়েছে ধর্ম-প্রেম তথা ইসলাম-বিরোধকে পরিহার করা। আসলে এই ধরনের ধর্ম-প্রেমই সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে।" (অহ্যাউল-উলুম)

পয়গম্বর মুহম্মদের মুখ থেকে একদা এই বাণী নির্গত হয়েছিল : "আমার ধর্মের মধ্যেই ৭৩টি সম্প্রদায় গড়ে উঠবে, যাদের একটি হবে 'স্বর্গগামী' বাকি সব 'নরকগামী'। এই হদীস (পয়গম্বর-বাণী)-কে উপজীব্য করে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেকে স্বর্গগামী ও অন্যদের নরকযাত্রী বলে প্রচার করে তিক্ততা সৃষ্টি করেছে। গজালী এই ভয়াবহ ইসলাম অন্তর্কলহকে বন্ধ করার জন্য 'তফ্রকা বৈনু'ল্‌ ইসলাম ব'জ্‌ন্দকা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে ইসলাম ও নাস্তিকের ভেদাভেদ সম্পর্ক লেখেন : "হদীস ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ৭২টি সম্প্রদায়ই নাস্তিক ও নরকবাসের যোগ্য। এর আসল অর্থ তারা নরকে …নিজ পাপের মাত্রা অনুযায়ী …থাকবে।"

গজালী তাঁর এই পুস্তকে নাস্তিকতার সকল লক্ষণকেই অস্বীকার করে বলেছেন

যে, যারা মুসলমান নয় তারাই কাফের এবং "যারা কল্‌মা পড়ে তারা সকলেই মুসলমান, এবং তারা সকলেই ভ্রাতৃসম। এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও মতভেদ আছে, কিন্তু তার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্বন্ধ নেই, তা নিতান্তই গৌণ ও বাহ্যিক।" গজালী তাঁর এই উপদেশাবলী শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাই লিখেছেন : "আমি এমন কথাও বলছি যে আমাদের সমকালীন বহু তুর্কী, খৃষ্টান, রোমানও ভগবানের কৃপাপাত্র হবেন।" এই প্রযত্নের সুফল গজালী স্বচক্ষে দেখে গেছেন। অশ্‌অরী ও হামবলিদের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বহু পরিমাণে কমে গিয়েছিল। বাগদাদের শীয়া ও সুন্নীদের মধ্যে ৫০২ হিজরী সনে (১১০৯ খৃঃ) শর্তসাপেক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটে।

৬. গজালীর উত্তরাধিকারী

গজালীর গ্রন্থ সংখ্যার মতো তাঁর শিষ্য সংখ্যাও ছিল প্রচুর, যাঁদের অনেকেই ইসলামের ধর্ম-ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। গজালীর শিক্ষার মাহাত্ম্য এখানেই উপলব্ধি হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে একটা সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ আজও তাঁকেই গুরু বলে মনে করেন। তাঁরই শিষ্য তোমরত তাঁর গুরুর ধর্মমিশ্রিত রাজনৈতিক স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে কিছুটা সফল হয়েছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

স্পেনের ইসলামী দার্শনিক

§ ১. স্পেনের ধার্মিক ও সামাজিক অবস্থা

১—উমৈয়্যা শাসক

ইসলামিক আরব প্রাচ্যে তার বিজয়যাত্রার প্রারম্ভকালেই পশ্চিমে—বিশেষত প্রতিবেশী দেশ মিশরের প্রতি নজর দিয়েছিল। মিশরের পর আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে টিউনিস ও মরক্কো (মরাকৃশ)-তে উপনীত হয়। পয়গম্বরের দেহান্তের পর শতবর্ষও যখন অতিক্রান্ত হয়নি, সেই ৯২ হিজরা সনে (৭০৬ খৃঃ) তারিক (ইবনে-জিয়াদ) লেসী বারো হাজার বর্বর সেনা (মরাকৃশ নিবাসী) নিয়ে স্পেন আক্রমণ করেন। সেই সময়ে স্পেনে এক রাজবংশ দুই হাজার বছর ধরে রাজত্ব চালিয়ে আসছিল—অর্থাৎ তারা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রগতিশীল হতে পারেনি। কৃষকের অবস্থা হয়ে উঠেছিল অসহনীয়, জমিদারের উৎপীড়ন ছিল সীমাহীন। দাস প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে তাদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল আরও ভয়াবহ; কৃষক ও দাসের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তাকে জমিদার ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীগণ দখল করত। জনগণ যখন এই রকম জুলুমের ফলে ত্রাহি-ত্রাহি রব করছিল সেই সময় তারিকের সেনাবাহিনী আফ্রিকার তটভূমি থেকে এগিয়ে সমুদ্রের অপর তটভূমিতে একটি পাহাড়ের ধারে উপনীত হয়, যার নাম পরে জব্রুল-তারিক-এ (তারিকের পাহাড়) পরিবর্তিত হয় এবং আরও পরে বিকৃত হয়ে জিব্রাল্টার নাম গ্রহণ করে। রাজা রোড্রিক প্রথমেই তারিকের সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন যে, আত্মগ্লানিতে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করেন। পরের বছর আফ্রিকার মুসলমান রাজা মুসাবিন নাসির স্বয়ং সশস্ত্র এক বাহিনী নিয়ে স্পেন আক্রমণ করেন, সেখানে তখন তাঁর গতিরোধ করার ক্ষমতা কারও ছিল না। অবশ্য ধর্ম ও জাতির নামে কিছু বিক্ষোভ কয়েকদিন ছিল, তবে তিন-চার বছর পরে স্পেন সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের কুক্ষিগত হয়। —"ভূসম্পত্তি মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ঘোষিত হয়। অন্যান্য জাতিদের তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী জাতীয় সমস্যা সমাধানের আজ্ঞা দেওয়া হয়।" মুসার পুত্র আব্দুল আজীজ স্পেনের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন।

এরই কিছুদিন বাদে বনী-উমৈয়্যার শাসনের ওপর আঘাত আসে। আব্দুল আব্বাস, উমৈয়্যা বংশের রাজকুমারগণকে একে একে হত্যা করে সুলতান হন। সেই সময়ে আনুমানিক ৭৫০ খৃষ্টাব্দে একজন উমৈয়্যা রাজকুমার আবদুর রহমান দাখিল স্পেনে পালিয়ে যান এবং স্পেনকে নিজ বংশের হস্তচ্যুত হওয়া রোধ করেন। আবদুর রহমান দামাস্কাসের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে তাঁর শাসনকালে স্পেন শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল এবং পাশ্চাত্যের ইসলামীক পণ্ডিতগণ প্রাচ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে তৎপর হন।

যতদিন ইসলামের আধিপত্য মরক্কোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন আরবের সাযুজ্য ছিল সেখানকার বর্বর জাতিদের সঙ্গে, যারা বদ্দুদের চেয়ে কোনোদিক দিয়েই উন্নত ছিল না। কিন্তু বাগদাদে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল স্পেনেও সেইরকম ঘটেছিল। দুটি জায়গাই এক প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সভ্য জাতির সংস্পর্শে এসেছিল। বাগদাদের আরবীরা ইরাণী মেয়েদের বিবাহ করার ফলে যেমন ইরাণী সভ্যতার সঙ্গে তাঁদের মেল-বন্ধন ঘটেছিল তেমনি স্প্যানিশ মেয়েদের বিবাহ করবার সূত্রে মেল-বন্ধন ঘটেছিল রোমান-সভ্যতার সঙ্গে। এর পরিণাম বিচারের আগে ঐতিহাসিক ভিত্তিকে আরও বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন।

স্পেনে উমৈয়্যা বংশের শাসন বজায় ছিল আড়াইশো বছরের কিছু বেশী সময়। তাঁদের সমৃদ্ধি তুঙ্গে পৌঁছেছিল তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়ে (৯১২—৯৬১ খৃঃ) এঁরা পূর্বেই খলিফা পদবী ধারণ করেছিলেন। আবদুর রহমানের পুত্র দ্বিতীয় হাকিমও (৯৬১—৯৭৬ খৃঃ) পিতার গৌরব বজায় রেখেছিলেন। ধন এবং বিদ্যায় প্রাচ্য যেমন সমৃদ্ধ হয়েছিল হারুণ মামুনের শাসনকালে (৭৮৬—৮৩৩ খৃঃ) তেমনি হয়েছিল পশ্চিমী দুনিয়া আবদুর রহমান ও হাকিমের শাসনকালে। অবশ্য, স্পেনের মুসলিম সমাজে তার পূর্বগামী আব্বাসীয় সমাজের সর্বদা বিদ্যাচর্চারত পণ্ডিতের চেয়ে কর্মরত লোকের সংখ্যাই বেশী ছিল। আবদুর রহমানের প্রজাদের মধ্যে খৃষ্টান ছাড়া বহু সংখ্যক ইহুদীও ছিল। কাইজার হাদ্রিয়ান আইন জারি করে পাঁচ লক্ষ ইহুদীকে বাইজান্টিয়াম থেকে স্পেনে স্থানান্তরিত করেন। খৃষ্টীয় শাসনকালে তাঁদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হলেও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পর তাঁদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাঁরাও দেশের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। স্পেনের ইহুদীদেরও ধর্মকেন্দ্র ছিল বাগদাদে, যেখানকার রাজদরবারে ইহুদী হাকিম ও বিদ্বানেরা বহু সম্মান-ভাজন ছিলেন। প্রথম থেকেই স্পেনে রোমান ক্যাথলিকদের মতো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার জন্য কুখ্যাতি ছিল। এদের ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আরবী এবং অর্ধআরবীগণ এত অধিকসংখ্যায় এসে স্পেনে বসবাস শুরু করেন যে সেখানে শহর ও গ্রামাঞ্চলে আরবী ভাষাই ক্রমে প্রধান ভাষায় পরিণত হয়। এখানকার আরবীগণ প্রাচ্যের সাম্প্রদায়িক মতভেদে অভিজ্ঞ ছিলেন, ফলে তাঁরা

চাইতেন না যে স্পেনে নতুন কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হোক। এঁদের সমর্থন-পুষ্ট হামবলি সম্প্রদায়ই প্রথম কোরাণকে এত সহজবোধ্য করেন যে একজন অশিক্ষিত বদ্দুর পক্ষেও তার রসগ্রহণে কোনো অসুবিধা হয়নি। খৃষ্টান ও আরবীগণের এই পাকা দেওয়ালে যদি কোনো ছিদ্র থেকে থাকে তবে তা ছিল ঐ ইহুদীরা, যাঁদের সম্পর্ক ছিল কেবলমাত্র বাগদাদের মতো বিচার-স্বতন্ত্র কেন্দ্রের সঙ্গে। সকলের অজান্তে দর্শন-পুস্তক পাঠ করে এঁরা প্রচার করতেন। এ ছাড়া আরও কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি 'নিষিদ্ধ ফল' ভক্ষণের লোভ না সামলাতে পেরে এঁদেরই অনুসরণ করেন। এ রকমই একজন ছিলেন আবদুর রহমান বিন্‌-ইসমাইল। ইনি প্রাচ্যে গিয়ে ইরাণের প্রায় সকল পণ্ডিতের নিকট দর্শন শিক্ষা করেন এবং পবিত্র-সংঘের গ্রন্থাবলী স্পেনে প্রচার করেন। ৪৫৮ হিজরী সনে (১০৬৫ খৃঃ) তাঁর দেহান্ত হয়।

২ —দর্শনের প্রথম প্রবেশ

দ্বিতীয় হাকিম ছিলেন স্পেনের হারূণ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং দার্শনিকগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁর নির্দেশে কর্মচারীগণ দামাস্কাস, বাগদাদ, কাহিরা, বুখারেষ্ট পর্যন্ত পুস্তকের অন্বেষণে ছুটে গেছে, এতই ছিল তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের ঝোঁক। তাঁর গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ। এখানকার গ্রন্থাগারিক লিখেছেন এখানে গ্রন্থসূচী ছিল ৪৪টি খাতায় এবং প্রতিটি খাতায় ছিল ২০টি করে পৃষ্ঠা। হাকিম বই পড়তে এত ভালোবাসতেন যে, সেখানে এমন কোনো গ্রন্থ ছিল না যা তিনি পড়েননি অথবা স্বহস্তে তাতে লেখকের নাম, জন্ম-মৃত্যুকাল লেখেননি। তাঁর সংগৃহীত পুস্তকের মধ্যে দর্শন-গ্রন্থই ছিল সর্বাধিক।

হাকিমের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ১২ বছরের দ্বিতীয় হাস্‌সাম সিংহাসনে বসেন, এবং তাঁর অভিভাবকত্ব করতে থাকেন কাজী মনসুর ইবনে-আবীআমর। আমর হাস্‌সামের মাকে বশীভূত করে দু'বছরের পুরনো কর্মচারীদের বরখাস্ত করে সেখানে নিজের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের বসিয়ে দেন। হাস্‌সামকে নামমাত্র বাদশাহ্ রেখে নিজের নাম প্রচারেই তিনি ব্যস্ত হন, এমনকি শুক্রবারে মসজিদে খুতবা (উপদেশ) পাঠও নিজের নামে করানোর ব্যবস্থা করেন। বিদেশী ও দেশের অধিবাসী-গণ তাঁকেই খলিফা বলে ভুল করতে থাকে। আমর অস্ত্রের জোরে নয় স্রেফ চালাকি দ্বারাই এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তিনি এত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন যে নিজেকে ইসলামী ধর্ম সম্প্রদায়ের ভক্ত বলে প্রচার করেন। "এর জন্য পণ্ডিত ও মীমাংসকদের একটি সভা আহ্বান করে একটি ছোট্ট ভাষণের মাধ্যমে তিনি তাঁদের প্রশ্ন করেন যে, দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের কোন কোন পুস্তক দেশের সরলচিত্ত মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত করছে বলে মীমাংসকগণ মনে করেন। স্পেনের মুসলমানগণ

তাদের ধর্মীয় হঠকারিতায় পটু ছিল এবং দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা প্রায়ই তাদের বিব্রত করা হতো। তাই সভার মীমাংসকগণ দ্রুত একটি নিষিদ্ধ পুস্তকের দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করে আমরের সামনে রাখেন। আমর তাঁদের বিদায় দিয়ে দর্শনের পুস্তকসমূহ পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ দেন।"

হাকিমের বহুমূল্য পুস্তকালয়ও ভস্মস্তূপে পরিণত হয়; যেগুলি রক্ষা পায় সেগুলিও পরে বর্বরদের গৃহযুদ্ধে দগ্ধ হয় (১০১৩ খৃঃ)। হাকিমের শাসনকালে যে সমস্ত খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সমাবেশ হয়েছিল, আমর তাঁদের দুধের মাছির মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলেন। কিন্তু আমর ইহুদীদের সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারেননি এবং তাঁরা যতদিন স্পেনের মাটিতে বাস করেছিলেন ততদিন দর্শনচর্চার উচ্ছেদও করতে পারেননি।

৩—স্প্যানিশ ইহুদী এবং দর্শন

দশম শতাব্দীতে স্পেনের রাজধানী কার্দোবা (কার্তবা)-র জনসংখ্যা ছিল দশলক্ষাধিক এবং প্রাচ্যে বাগদাদের যে স্থান ছিল প্রতীচ্যে এর স্থান ছিল সেই রকম। বাগদাদের মতো এখানেও কেবলমাত্র স্পেন ও মরক্কো থেকে নয় ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে অ-মুসলিম (গৈর-মুসলিম) শিক্ষার্থিগণ বিদ্যার্জন করতে আসতেন। প্রাচ্যের অর্ধাংশের—ভারত, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদির ভাষা ছিল যেমন সংস্কৃত, তেমনই সভ্য দুনিয়ার পশ্চিমার্ধের (পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের) সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল আরবী। ইহুদী ভাষা ইব্রাণীর সঙ্গে আরবীর খুব সাদৃশ্য থাকায় ইহুদীগণেরও খুব সুবিধা হয়েছিল। প্রথম থেকেই তো দর্শনক্ষেত্রে ইহুদীগণ সক্রিয় ছিল। দ্বিতীয় হাকিম যখন প্রসিদ্ধ দার্শনিক হাকিম হস্‌দা বিন-ইস্‌হাককে নিজের অনুগ্রহ-ভাজন করেন তখন থেকে দর্শনের অগ্রগতির জন্যও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ইবনে-ইস্‌হাক প্রথমে অ্যারিস্টটল-এর দর্শনের প্রচার শুরু করে দিলে ইহুদী ধর্মাচার্যগণ তাঁকে বাধা দিতে চান কিন্তু ব্যর্থ হন। একাদশ শতাব্দীর শুরুতেই অ্যারিস্টটল স্পেনের ইহুদীগণের নিকট স্বদেশী দার্শনিকের তুল্যই মর্যাদা পেতে থাকেন।

(১) ইবনে-জিব্রোল (১০২১-১০৭০ খৃঃ)—মাল্‌তার এক ইহুদী পরিবারে জিব্রোলের জন্ম হয়। স্পেনের এই সর্বাপেক্ষা বিদগ্ধ দার্শনিকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'যম্বু্‌উ'ল্‌-হয়াৎ'। তাঁর দার্শনিক বিচার হলো: জগতে দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি আছে; মূল প্রকৃতি এবং আত্মা বা 'আকার'। কিন্তু বস্তুত উভয়েই এক পরমাত্মার মধ্যে বিলীয়মান, যাকে জিব্রোল বলেছেন সামান্য প্রকৃতি। এই বিচারকে রোশদ আরও বিশদ করেছেন।

(২) দ্বিতীয় ইহুদী দার্শনিক—জিব্রোলের পরবর্তী মহান্‌ প্রতিভাবান

ইহুদী দার্শনিকের নাম হলো মুসা বিন্-মামুন। তাঁর জন্ম হয় ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে কার্দোবায়। আবদুল মোমিন যখন স্পেন অধিকার করে ইহুদীদের দেশত্যাগে বাধ্য করেন তখনই মুসা মিশরে চলে যান, এবং সুলতান সলাহুদ্দীনের গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত হন। অবশ্য সেই বছরেই (৬০৫ হিজ্‌রী, তথা ১২১২ খৃঃ) তাঁর মৃত্যু হয়। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে মুসা রোশদের শিষ্য।

মুসার পরে তাঁর শিষ্য ও জামাতা ইউসুফ বিন-যহ্যা কালে একজন বিদগ্ধ দার্শনিক হয়েছিলেন।

স্প্যানিশ ইহুদী দর্শন-প্রেমিকের সংখ্যা কমবার বদলে বাড়তে থাকলেও দার্শনিক রোশদের আবির্ভাবে তাঁরা যেন সূর্যের উদয়ে তারকার মতোই নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলেন।

৪—মোহিদীন শাসক

একাদশ শতকে উমৈয়্যা শাসক বংশের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে দেশের শক্তিকে টিকিয়ে রাখা তাঁদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে রাজ্যের ছোট ছোট সামন্তরা স্বাধীন হতে আরম্ভ করে। সেই সময়েই প্রতিবেশী খৃস্টান শাসক স্পেনের সুলতানী বিনষ্ট করেন এবং সমুদ্রের অপর তীরের (আফ্রিকার) বর্বর জাতিরা ১০১৩ খৃষ্টাব্দে স্পেন আক্রমণ করে কার্দোবা নগরে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর তারা মরক্কোতে তাসকীন (মুলসমান) নামে এক সুলতানী রাজ্য স্থাপন করে। তাসকীন বংশের শেষ বাদশাহ্ ছিলেন আলী (বিন-ইউসুফ)। এরপর মহিদীন নামে আর একটি রাজবংশ এই স্থান অধিকার করে।

(১) মুহম্মদ বিন-তোমরত (মৃত্যু —১১৪৭ খৃঃ) —মরক্কোর মোহিদীন শাসনের সংস্থাপক মুহম্মদ (ইবন-আবদুল্লাহ্) বিন-তোমরত বর্বর কবীলা মস্‌মুদী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে আলীর বংশ বলে দাবি করতেন। নিজের দেশে শিক্ষা শেষ করে তিনি প্রাচ্যে গিয়ে যে সকল বিদ্বান ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসেন তাঁদের মধ্যে গজালীর দ্বারাই সর্বাধিক প্রভাবিত হন। গজালীর নিকট কয়েক বছর বাসকালে ইসলামী রাজ্যের —বিশেষত স্পেনের —দুরবস্থা সম্বন্ধে গুরুশিষ্য প্রায়ই আলোচনা করতেন। উভয়েই এক ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন। ইবনে-খলদুন বলেছেন : "সাধারণ মানুষের ধারণা, তোমরত গজালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর পরিকল্পনার ব্যাপারে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলে গজালী তা সমর্থন করেন। কারণ সেই সময়ে দুর্বল ইসলামকে সুসংবদ্ধ করার মতো কোনো শক্তিশালী সুলতানের আবির্ভাব হয়নি। গজালী তোমরতের সঙ্গে বাক্যালাপ করেই তাঁর মধ্যে এই ক্ষমতার সন্ধান পান, যাতে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।"

গজালীর আশীর্বাদে উৎসাহিত তোমরত দেশে ফিরে মিশরে চলে যান।

কাহিরায় তাঁর বক্তৃতা এত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে যে রাজাজ্ঞাবলে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়ায় ১৪ দিন বাস করে তিনি টিউনিস হয়ে মরক্কো পৌছান। তোমরত ছিলেন ধর্মান্ধ। ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কথা উঠলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করতেন। মরক্কোর বর্বর কবীলাদের মধ্যে যথেষ্ট বদ্দুদের মতো মানুষ ছিল, তাদের নিকট তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মোল্লা। অল্পদিনের মধ্যেই একজন মহান্ মৌলবী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বাদশাহ্, আমীর, মোল্লা সকলকেই উপযুক্ত কারণে শাসন করতেন। তাসকীন বংশে একটা অদ্ভুত রীতি প্রচলিত ছিল, তাঁদের রমণীগণের বদলে পুরুষগণই বোরখা ব্যবহার করত। ব্যভিচার ছিল ব্যাপক, সেনাবাহিনীর হাতে বনেদী পরিবারের মহিলাগণের ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হতো। ব্যভিচার, মদের ব্যবসা শহরে খোলাখুলিভাবে চলত। ক্রমবর্ধমান এই সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য সুলতান আলী বিন-তাসকীন তোমরতের সঙ্গে পণ্ডিতগণের এক বিতর্কসভার আয়োজন করেন। তোমরত জয়ী হলে বাদশাহ্ তাঁকে শ্রেষ্ঠ বিচারক বলে স্বীকৃতি দেন। ফলে দরবারের অন্যান্য সভাগণ তোমরতের শত্রুতে পরিণত হন এবং তোমরত এখান থেকে পলায়ন করে অম্‌সমদা নামক বর্বর কবীলার শরণাপন্ন হন। এখানে তিনি তাঁর মতপ্রচার এবং সৈনিক রীতিতে অনুগামীদের সংগঠিত করতে শুরু করেন (১১২১ খৃঃ)। সমস্ত জীবনই এই কাজে তিনি ব্যয় করেন। যদিও কবীলাদের সংগঠিত করার কাজে তিনি খুব বেশী সাফল্য অর্জন করেননি, কিন্তু তাঁর শিষ্য আবদুল-মোমিন গুরুর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে ৫৪২ হিজ্‌রী সনে (১১৪৭ খৃঃ) মরক্কো অধিকার করে মুল্‌সমীনের সুলতানী ধ্বংস করে দেন।

(২) আবদুল-মোমিন (১১৪৭-১১৬৩ খৃঃ)—তোমরত নিজেকে মোহিদ অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী বলতেন, তাই তাঁর সংস্থাপিত শাসন-ব্যবস্থা মোহিদীন শাসন ব্যবস্থা নামে পরিচিত। আবদুল-মোমিন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম শাসক। কুম্ভকার বংশের সন্তান হয়েও শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা এবং যোগ্যতার দ্বারা তিনি তোমরতের আদর্শকে সফল করতে সমর্থ হন। মরক্কোয় রাজ্য স্থাপনের পর তিনি তোমরতের শিক্ষানুযায়ী রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। এই খবর অপরপারে স্পেনে পৌছেছিল। সেই সময়ে স্পেনের সুলতানী সাম্রাজ্য টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এবং ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুলতানের বিলাসিতা ও অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আবদুল-মোমিনের সুশাসনের কথা শুনে তারা এক প্রতিনিধিদল তাঁর নিকট প্রেরণ করে। মোমিন তাদের আপ্যায়ন করেন এবং সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেন। এর কিছুদিন পরেই মোমিন স্পেন আক্রমণ করে তাকে মরক্কোর অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

তোমরত নিজেকে অশ্‌অরী বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেইজন্য আবদুল মোমিনও নিজেকে একই মতাবলম্বী বলে প্রচার করেন। যেহেতু অশ্‌অরীগণ গজালীর

শিক্ষায় প্রভাবিত ছিলেন সেইজন্য তাঁদের এবং মোমিনকে দর্শনের অন্ধ-বিদ্বেষী বলা চলে না, যুক্তির উপযুক্ত মর্যাদা তিনি দিতে জানতেন। যদিও তাঁর শাসনের শুরুতেই দেশের শান্তি বজায় রাখার জন্য কিছু ইহুদী দার্শনিককে বিতাড়িত করার প্রয়োজন হয়েছিল। অবশ্য পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়। মোমিন ছিলেন বিদ্যা-প্রেমিক। তৎকালীন স্পেনের প্রসিদ্ধ দার্শনিক আবুমর্দা বিন-জুহ্‌র এবং ইবনে-তুফৈল-কে অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করেন। দ্বিতীয় হাকিমের পর তিনিই দর্শনের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার শুরু করেন। ছাত্রগণ তখন মসজিদে গিয়ে অধ্যয়ন করত। মোমিন মাদ্রাসার জন্য ভিন্ন প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। তিনি জানতেন যে ইসলামের ভেতর যে কুসংস্কার শেকড় গেড়ে আছে তাকে উৎপাটিত করার একমাত্র উপায় হলো শিক্ষার বিস্তার।

মোমিনের পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ মাত্র ৪৮ দিন রাজত্ব করতে সমর্থ হন। কারণ, নির্লজ্জ অক্ষম বলে তাঁকে গদীচ্যুত করে তাঁর ভাই ইয়াকুব মনসুরকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। (১১৬৩-১১৮৪ খৃঃ)। পিতার বহু গুণই এঁর মধ্যে ছিল। পরে এঁর বিষয়ে আলোচনা করব।

§২. স্পেনের দার্শনিক

১—ইবনে বাজা (Avempace, মৃত্যু—১১৩৮ খৃঃ)

(১) জীবনী—একাদশ শতাব্দীর শেষে বা তার কাছাকাছি সময়ে স্পেনের সরগোসা নগরে আবু-বক মুহম্মদ ইবনে-বাজার জন্ম হয়। তখন স্প্যানিশ সুলতানী সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। উত্তরাংশ ছিল অর্ধসভ্য, যুদ্ধপ্রিয়, ক্ষিপ্ত মেজাজী খৃস্টানদের দখলে। তারিকের সময় পর্যন্ত দেশের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে বাজার মতো দার্শনিক যে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়বেন, এতে আর আশ্চর্য কি? দর্শন, তর্কশাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত সরগোসার শাসকই বাজার প্রতিভা উপলব্ধি করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং তাঁকে মন্ত্রীপদ দান করেন। ফলে মোল্লা ও সৈনিকগণ বিরক্ত হয়ে ওঠেন, অতএব বেশীদিন শাসকপদে অধিষ্ঠিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সরগোসার পরাজয়ের পর বাজা শেবিলীতে বসবাস কালে (১১১৮ খৃঃ) কয়েক-খানি গ্রন্থ রচনা করেন। নিজমত প্রচারের জন্য তাঁকে একবার কারাবাসও করতে হয়। রোশদের পিতা তাঁকে মুক্তি দিলে তিনি ফেজ রাজদরবারে আশ্রয় পান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কথিত আছে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকজন হাকিম তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। নিজের স্বল্পায়ু জীবনে বাজা এত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে সর্বদা মৃত্যু কামনা করতেন। আর্থিক অনটনের চেয়েও দুঃখের

বিষয় ছিল, তাঁর জীবনে সহৃদয় বন্ধুর অভাব ও দার্শনিক জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথ। এই রকম প্রতিকূল পরিবেশে বাজার শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয় এবং তিনিও ফারাবীর মতো নির্জন জীবনই বেশী পছন্দ করতে শুরু করেন।

(২) কৃতি —বাজা খুব কম বই লিখেছেন এবং যা-ও বা লিখেছেন সেগুলি সুশৃঙ্খলভাবে লেখেননি। তাঁর ছোট ছোট বইগুলি অ্যারিস্টটল এবং বিভিন্ন দার্শনিকের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ব্যাখা। তাঁর বইগুলির মধ্যে 'তদ্‌বীরু-ল্‌-মুতবহ্‌দ' এবং 'হয়াতু'ল্‌-মোতজিল' বেশী মর্মস্পর্শী, কারণ এখানে বাজা একটি, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করেছেন যার সম্বন্ধে রোশদ বলেছেন : "বাজা তাঁর 'হয়াতু'ল্‌-মোতজলী'-তে যে দৃষ্টিকোণ পেশ করেছেন, তার সঙ্গে সেই সমস্ত মানুষই সম্পর্কিত যারা নিবিড় শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে চায়।"

বাজার মতে নৈতিকতার ওপরেই রাজ্যের ভিত্তি গড়ে ওঠা দরকার। স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে চিকিৎসক ও বিচারকদের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। মানুষ সদাচারে অভ্যস্ত হলেই বিলাস-ব্যসন, পান-ভোজনে মিতব্যয়িতার পরিচয় দেবে ফলে তাদের স্বাস্থ্যও উন্নত হবে এবং আর চিকিৎসকের প্রয়োজন হবে না। একইভাবে বিচারকগণও কর্মহীন হবেন, কারণ এ রকম সমাজে ব্যভিচার দুরাচার থাকতে পারে না। অতএব মামলা হবে কি নিয়ে, বিচারকই বা কার বিচার করবেন?

(৩) দার্শনিক মত —জিব্রোল বাজার এক শতাব্দী পূর্বে জাত। গজালী বাজার আবির্ভাবের ২৭ বছর আগে মারা যান। প্রাচ্যের অন্যান্য দার্শনিক, বিশেষত ফারাবীর প্রভাবই ছিল তাঁর ওপর সবচেয়ে বেশী। বাজার মতে দিব্য প্রকাশ দ্বারাই সত্যের সাক্ষাৎ, সুখ ও আনন্দপ্রাপ্তি সম্ভব। এই তত্ত্বে কিন্তু গজালী পৌছাতে পারেননি। অবশ্য এরূপ আনন্দের আকর্ষণকে অতিক্রম করা দার্শনিকের কর্তব্য, কারণ ধর্মীয় রহস্যবাদ হৃদয়ের অন্তস্তলে যে প্রতিবিম্বকে প্রকট করে তা সত্যকে প্রকাশ না করে বরং আড়ালই করে। আকাঙ্ক্ষামুক্ত, অকম্পিত শুদ্ধ চিন্তনই মহান্ ব্রহ্মকে দর্শন করায়।

(ক) প্রকৃতি-আত্মা-ঈশ্বর —বাজার মতে জাগতিক উপাদান দুই প্রকার —(১) গতিযুক্ত এবং (২) গতিহীন। গতিযুক্ত উপাদান হলো পিণ্ড (জড়) এবং সীমিত। সীমিত হওয়ার কারণ সে নিজে তার অভ্যন্তরীণ গতির কারণ হয় না; তার অনন্ত গতির কারণ হলো এক অনন্ত শক্তি বা নিত্যসার যাকে ব্রহ্ম (= Nous) বলা চলে। পিণ্ড (= শরীর) যা হলো প্রাকৃতিক (= জড়) উপাদান তা গতিযুক্ত কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম (= Nous) নিজে অচল থেকে পিণ্ডকে (জড় উপাদানকে) গতিদান করেন। (৩) আত্মার অবস্থিতি জড় ও ব্রহ্ম এই দুইয়ের মধ্যবর্তী—এর গতি স্বতঃস্ফূর্ত। পিণ্ড এবং আত্মার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় প্রশ্নকে বাজা

গুরুত্ব দেননি ; "মানুষের মধ্যে আত্মা ও ব্রহ্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ কেমন ?" —এই ছিল তাঁর কাছে প্রধান সমস্যা।

(a) **আকৃতি** —প্লেটোর মতো বাজাও স্বীকার করেছেন যে জড় উপাদান ছাড়া 'আকৃতি' থাকতে পারে না কিন্তু আকৃতি-রহিত জড়বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। এটা মেনে না নিলে বিশ্বের পরিবর্তনের কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না—বস্তুত পরিবর্তন আকৃতির রূপান্তরের ওপর নির্ভরশীল। যেমন —একটা কলসী গড়ে ওঠে একটা আকৃতির ধারণা এবং জড় উপাদান (=মৃত্তিকা)-এর সংমিশ্রণে। মাটিকে আকৃতি দান না করা পর্যন্ত তা মাটি ছাড়া কিছু নয়, আকৃতির পরিকল্পনার মিলনেই তা কলসী-রূপ পায়। আকৃতি যদি এখন মাটি ছেড়ে যায় তবে কলসীটিও ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে। পিথাগোরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল সকলেই এই আকৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন যে আকৃতি পিণ্ড (জড় উপাদান) থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি পদার্থ, এবং তা-ই জাগতিক পরিবর্তনের মূল কারণ।

(b) **মানবের আত্মিক বিকাশ** —এই আকৃতির কয়েকটি পর্যায় আছে। সর্বনিম্ন পর্যায়ে সক্রিয় প্রকৃতি রূপে প্রাপ্ত আকৃতির অবস্থান, এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে শুদ্ধ আত্মিক আকৃতির। মানুষের কাজ হলো আত্মিক আকৃতি সমূহের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে বোধ বা চেতনার উন্মেষ ঘটানো। (১) প্রথমে সমস্ত বস্তুপদার্থের বুদ্ধিগম্য আকৃতির বোধ। (২) আবার বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা উপস্থাপিত বস্তু থেকে আত্মার যে স্বরূপ প্রতীত হয় তার বোধ। (৩) আবার তার ওপরের বোধ মানবাত্মা এবং তার ওপরে (৪) কর্তাভাব বা সৃজনশীল মননের বোধ, এবং সর্বশেষে (৫) ব্রহ্মাণ্ড বা শুদ্ধ ভাবসমূহের বোধ। অর্থাৎ ব্যক্তিক তথা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভৌতিক উপাদান —যাকে বলা যায় ভাবের আধার —তার থেকে ক্রমশ উর্ধ্বগামী হয়েই মানুষ অতিমানবিক দিব্যতত্ত্বে উপনীত হতে পারে।

(খ) জ্ঞান বুদ্ধিগম্য —গজালী জ্ঞানের পরেই আত্মানুভূতি বা দিব্য-দর্শনকে মুক্তির সাধনা বলে প্রচার করেছেন, কিন্তু বাজা বলেছেন জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি সম্ভব নয়। তাই দিব্যদর্শনের বা তত্ত্বের সন্ধান দেয় দর্শন, সুফীবাদ নয়। দর্শন সামান্য সম্পর্কিত ধারণা সৃষ্টি করে, বিশেষ জ্ঞানের চিন্তন দ্বারা সামান্য জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তবে তার সঙ্গে অনুভূতির সাহায্য প্রয়োজন। এই সামান্য বা অনন্তের মধ্যেই প্রত্যক্ষ বিষয় বিলীন হয়ে আছে —এর সঙ্গে জ্ঞানের তুলনা করলে দেখা যায় যে বাহ্যবস্তুর সমস্ত মানস-প্রতীতি এবং চিন্তনই ভ্রমাত্মক। বাস্তবিক জ্ঞান তাকেই বলা যায় যা অনন্ত এবং বুদ্ধিগম্য। ধর্মাচরণ, ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা মানবাত্মা কখনই মুক্তি বা পূর্ণতা পায় না, একমাত্র বুদ্ধিগম্য জ্ঞানের পথেই এই প্রাপ্তি সম্ভব। চিন্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ, একে লাভ করতে হলে বুদ্ধিগম্য সমস্ত বস্তুকেই জানা দরকার। বুদ্ধিগম্য জ্ঞানই সামান্য বস্তুসৎ, ইন্দ্রিয়গম্য ব্যক্তি বস্তুসৎ নয়, অতএব জীবনের পরে ব্যক্তিক পটভূমিতে মানবাত্মার অস্তিত্ব বজায় থাকা অসম্ভব। মানবাত্মা—

যা ব্যক্তিক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় এবং ইচ্ছানুসারে তার অস্তিত্বকে প্রকট করে—মৃত্যুর পরেও ব্যক্তিক অস্তিত্বকে জিইয়ে রেখে কর্মফল প্রাপ্ত করাবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু ভাব বা মনন যেহেতু ইন্দ্রিয়গম্য নয়—বৌদ্ধিক, সেহেতু সর্বদা একই রকম থাকে। এটি হলো সম্পূর্ণ মানবতার ভাব—অর্থাৎ তা এক বুদ্ধি, মানবতার অভ্যন্তরীণ ভাব এবং এই-ই হলো একমাত্র নিত্য-সনাতন তত্ত্ব এবং সেই কর্তা মননের সঙ্গে একত্রিত।

বাজার সিদ্ধান্ত সমূহ ফারাবীর মধ্যেও অস্পষ্টরূপে ছিল। বাজার সুযোগ্য শিষ্য রোশদ একে এত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে মধ্যযুগীয় ইউরোপের দার্শনিক বিচারধারায় একে রোশদের সিদ্ধান্ত বলেই মনে করা হয়েছে।

(গ) মুক্তি—আত্মার (= Nous) ঐ চরম বিকাশ—সামান্য-চেতনার সমাগমকে খুব সামান্য সংখ্যক মানুষই প্রাপ্ত হন। অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞতার অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ান। এটা ঠিকই যে কিছু ব্যক্তি, জ্যোতি ও বস্তুর রঙীন জগৎকে দেখেন, তবে সারসত্যকে উপলব্ধি করেন মুষ্টিমেয় মাত্র। যে নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি একে উপলব্ধি করেন তাঁরাই অনন্তজীবন প্রাপ্ত হয়ে স্বয়ংজ্যোতিতে পরিণত হন।

বাজার মতে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া এবং স্বীয় বৌদ্ধিক শক্তির বিকাশ সমূহই জ্যোতির্ময় হওয়া এবং মুক্তজীবন লাভের একমাত্র উপায়। বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়ার পিছনে কাজ করে কোনো একটা উদ্দেশ্য তথা প্রয়োজন-পূর্তির ইচ্ছা। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি হোঁচট খেয়ে পথের বাধা ঐ পাথরটিকে স্রেফ ক্রোধের বশে, ভাঙতে শুরু করেন তবে ঐ আচরণ হবে শিশুসুলভ, উদ্দেশ্যহীন; কিন্তু তিনি যদি মনে করেন এটা ভেঙে ফেললে অন্য লোক বিপন্মুক্ত হবে তবে তাঁর কাজটিকে বলা যাবে মানবোচিত, বুদ্ধিপূর্বক।

(ঘ) একান্ততার উপায়—বাজার একটি পুস্তকের নাম "তদ্‌বীরু-ল্‌-মুতবহ্‌দ" বা নির্জনতার উপায়। আত্মার চরম উন্নতির জন্য নির্জনে চিন্তনের ওপরই বাজা সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। ফারাবী এই বিচারকে তাঁর মাতৃভূমির (মধ্য-এশিয়া) বৌদ্ধ বিচারের ধ্বংসাবশেষ থেকে নিয়েছেন, আবার তাঁর থেকে নিয়েছেন বাজা—অতএব এই লেনদেনের মধ্যে যদি বৌদ্ধ হতাশাবাদ চলে আসে তবে আর আশ্চর্য কি? একান্ত-জীবন সমাজে ব্যক্তিক প্রাধান্যের প্রভাব স্পষ্ট করে, তাই বাজা এমন এক সমাজের কল্পনা করেছেন যেখানে চিকিৎসক ও বিচারকের প্রয়োজন নেই, মানুষ, যেখানে পরস্পরের ক্ষতি না করেও তাদের সম্পর্ককে স্বচ্ছন্দেই আন্তরিক ও সুন্দর করে তুলতে পারে। "তারা মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করে, তাদের বাগানে মালীর নিপুণ হস্তকৌশলের আবশ্যকতা নেই, তারা অজ্ঞ মানুষের নিকৃষ্ট ভোগবিলাস এবং ভাবুকতা থেকে দূরে থেকে সংসারী সমাজের চালচলনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এ সত্ত্বেও তারা পরস্পরের মিত্র হওয়ায় তাদের জীবন হয় পরিপূর্ণ প্রেমাশ্রিত। অবশেষে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের প্রেমাশ্রয়ে ঐ অতি-

মানবগণ দিব্যজ্ঞানের একতায় বিশ্রাম লাভ করে।" (*The History of Philosophy in Islam* : Dr. T. J. De Boer ; pp. 180-181.)

২ —ইবনে-তুফেল (মৃত্যু—১১৮৫ খৃঃ)

আবদুল মোমিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইউসুফ (১১৬৩-১১৮৪ খৃঃ) এবং ইয়াকুবের (১১৮৪-১১৯৮ খৃঃ) শাসনকালে মোহিদীন বংশ চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এঁদের যুগে সমাজে কায়িক শ্রম-মুক্ত মানুষের সংখ্যা বর্ধিত হওয়ায় স্পেনে দর্শনের চর্চা ও মর্যাদাও বর্ধিত হয়। অর্থাৎ দারিদ্র্য ও দাসত্বকে লাঘব করে জনতাকে মুগ্ধ করার জন্য ধর্ম ও পরলোকবাদের কড়া আফিম বিতরণই ছিল এর উদ্দেশ্য। ঐ সময়ে ভারতে জয়চাঁদ এবং 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' (=শূন্যবাদী বেদান্ত) রচয়িতা কবি শ্রীহর্ষ প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন।

(১) জীবনী —আবু-বকর মুহম্মদ (ইবনে-আবদুল মালিক) ইবনে-তুফেল (আল্‌-কৈসী)-এর জন্ম হয় গ্রানাডার গাউডিক্স (Gaudix) নামক স্থানে। তাঁর জন্মকাল অজ্ঞাত। তিনি মাতৃভূমিতেই দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। বাজার মৃত্যুর পর তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলি তুফেলের গুরুর কাজ করেছে। শিক্ষা সমাপ্তির পর তুফেলকে গ্রানাডার (Granada) আমীর তাঁর লেখক পদ দেন। কিন্তু তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা বেশীদিন গ্রানাডায় আবদ্ধ থাকেনি। ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইউসুফ তাঁকে মরক্কোয় আহ্বান করে উজীর ও প্রধান চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করেন। কাজ কর্মের মধ্যে উদ্‌বৃত্ত সময়টুকু তিনি গ্রন্থপাঠেই ব্যয় করতেন। কিন্তু তিনি শুধু অধ্যয়নেই তৃপ্ত ছিলেন, জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে অর্থাৎ যশাকাঙ্ক্ষী হতে চাননি। ফলে গ্রন্থ রচনায় তাঁর তেমন উৎসাহ ছিল না।

ইউসুফের পর তাঁর পুত্র ইয়াকুবও সুলতান হয়ে তুফেলের মর্যাদা রক্ষা করেন। এঁর শাসনকালেই মরক্কোয় তুফেলের দেহান্ত হয়।

(২) কীর্তিসমূহ —তুফেল কয়েকটি কবিতা তথা হই-এর কাহিনী রচনা করেন। দেড়শত বৎসর পূর্বে বু-আলী সীনা রচিত পুস্তক 'হই ইবনে-একজান'-এর নামানুসারে তুফেল তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করলেও রচনা পদ্ধতি এবং বিচারধারা তাঁর মৌলিক চিন্তারই ফল।

(৩) দার্শনিক বিচার —(ক) বুদ্ধি এবং আত্মানুভূতি —বুদ্ধিপূর্বক জ্ঞানকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে তুফেল বাজার সঙ্গে সহমত ছিলেন, অবশ্য অতটা সাফল্য তিনি পাননি, বরং গজালীর ন্যায় দ্বিধাগ্রস্ততা তাঁর মধ্যে দেখা গেছে, "আত্মানুভূতির (গূঢ়চেতনা intuition) দ্বারা প্রত্যক্ষ বস্তুকে শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। কেন না দিব্যদর্শন দ্বারা জ্ঞাত তত্ত্ব গৌরবপূর্ণ ও মহান্‌ অর্থবাহী, শব্দের চাকচিক্যের মধ্যে পড়ে তা সাধারণ জাগতিক পদার্থের মতোই মনে হয়, যাকে

কি-না সত্য (স্বরূপ) আত্মার বিচারে দেখলে শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জন্য কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি নিজের ভাব প্রকাশে অক্ষম হন, আবার অধিকাংশ লোকই এই পথে ঠোক্কর খান।" (রিসালা 'হই-বিন-একজান', পৃঃ ১৩৬)।

(খ) হই-এর কাহিনী —দুটি দ্বীপ, যার একটিতে আছে মানবসমাজ তার সমস্ত রূঢ়তাসহ; অন্যটিতে একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি প্রকৃতির কোলে আত্মবিকাশ করছে। সমাজবদ্ধ দ্বীপের মানুষগণ নিম্নপ্রবৃত্তির শাসন-ব্যবস্থায় জীবন-যাপন করে, যেটুকু বাধা আছে তাও স্থূল জ্ঞানদাতা ধর্মের বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ। অথচ এই পরিস্থিতিতেই পালিত দুই ব্যক্তি সলামান এবং অসাল তাদের বৌদ্ধিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিজয়ী হয়। ব্যবহার-কুশল সলামান প্রচলিত ধর্মদ্বারা আবদ্ধ মানুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অসাল ছিল মননশীল ও সাধু প্রকৃতির, পর্যটন করতে করতে সে ঐ নির্জন দ্বীপে চলে যায় এবং ধ্যানে নিমগ্ন হয়। সেখানে যে নিঃসঙ্গ ব্যক্তি বাস করতেন তাঁর নাম হই একজান —প্রবুদ্ধের পুত্র হই (জীবক)- ইনি একজন দার্শনিক। শৈশবেই তাঁকে এই দ্বীপে পরিত্যাগ করে যাওয়া হয় কিংবা স্বয়ম্ভূত প্রাণীদের মতো তিনি নিজেই সৃষ্ট হন। যাই হোক এই শিশুটিকে হরিণীরা স্তন্যদুগ্ধ দিয়ে জীবিত রাখে। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি বুদ্ধির জোরেই আত্মরক্ষা ও শারীরিক প্রয়োজন মেটাতেন আবার মনন ও নিরীক্ষণ দ্বারা প্রকৃতি, আকাশ, ঈশ্বর এবং স্বীয় সত্তার জ্ঞান আহরণ করতেন। এইভাবে ৪৯ বছরে তিনি সেই উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হন যাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার বা সমাধি বলে। অসাল যখন এই দ্বীপে আসেন হই তখন সমাধিস্থ ছিলেন। মানুষের ভাষা হই-এর অজ্ঞাত থাকায় প্রথম প্রথম পরস্পরের ভাব বিনিময়ে খুবই অসুবিধা হতো। ভাষাগত বাধা অপসারিত হলে তারা পরস্পরের বিচারধারা জ্ঞাত হলেন এবং বুঝলেন যে উভয়েরই দর্শন ও ধর্ম একই সত্যের দুই রূপ। পার্থক্য শুধু এই যে হই ছিলেন অসালের অপেক্ষা অনভিজ্ঞ।

হই (জীবক) যখন শুনলেন যে সম্মুখস্থ দ্বীপের সমাজবদ্ধ মানুষদের জীবন অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন তিনি সেখানে গিয়ে তাদের সত্যদর্শন করানোর সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলেন যে এই মনুষ্যগণ সত্যদর্শনেই অসমর্থ। তিনি বুঝলেন যে পয়গম্বর মুহম্মদ মানুষকে পূর্ণজ্যোতি প্রদান না করে স্থূল রূপ দিয়ে ঠিকই করেছিলেন। পরাজয় স্বীকার করে তিনি অসালকে নিয়ে পুনরায় সেই নির্জন দ্বীপে ফিরে যান এবং শুদ্ধ দার্শনিক চিন্তনের মাধ্যমেই জীবনের অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের উপাসনায় অতিবাহিত করেন।

সীনা এবং তুফৈলের হই-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে উভয়ের হই-ই প্রবুদ্ধ-পুত্র এবং দার্শনিক হলেও সীনার হই দার্শনিক জ্ঞানের আলোয় অন্যকে পথ দেখাতে সমর্থ হয়েছেন, কিন্তু তুফৈলের হই পরাজয় স্বীকার করে ফিরে গেছেন। তবুও এক জায়গায় চরম সাদৃশ্য এই যে উভয়েই জ্ঞান-মার্গকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন।

(গ) জ্ঞান-চর্যা—হই-এর চর্যানুযায়ী তুফৈল জ্ঞানী ও দার্শনিকগণের পালনীয় দিনচর্যা বর্ণনা করেছেন। সকল কাজের মধ্যে সেই অদ্বৈতের অনুসন্ধান করার জন্যই হই কর্ম থেকে বিরত হননি। তাই তিনি সেই বিদ্যমান পরম-এর সঙ্গে মিলিত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তায় উপনীত হওয়ার জন্য সমস্ত প্রকৃতিকে প্রযত্নশীল হতে দেখেছেন তিনি। কোরাণের ব্যাখ্যা —পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই মানুষের জন্য তা হই মানতে পারেননি। পশু এবং বনস্পতিও নিজের এবং ভগবানের জন্য বাঁচে একে অস্বীকার করা অনুচিত। বেঁচে থাকার জন্য হই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বস্তুই গ্রহণ করেন তার বেশী নয়। ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য ফলটি ভক্ষণ করে তার বীজটি তিনি বপন করে দেন যাতে বৃক্ষরাজি না নির্মূল হয়। উপায়ান্তর না থাকলে যদিও তিনি পশুমাংস ভক্ষণ করেন, তবু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ থাকেন যাতে পশুকুল না ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর আহারগ্রহণের নিয়ম হলো: —"বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ, কিন্তু বিলাসিতার জন্য নয়।"

পৃথিবীর সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তার নিদর্শন হলো হই-এর এই শরীরচর্যা। তাঁর জীবনচর্যা ফরিস্তাদের মতো। ফরিস্তাদের মতোই তিনি নিজেকে প্রতিবেশীদের যোগ্য করে তুলতে তথা জীবনকে শুদ্ধ পবিত্র রাখতে চেয়েছেন। এই ভাবাদর্শকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর দ্বীপটিকে স্বর্গীয় করে তোলার জন্য প্রতিবেশী বৃক্ষদের পালন এবং পশুদের রক্ষা করে চলেছেন, নিজের দেহ এবং পরিধান শুদ্ধ রাখতে সজাগ হয়েছেন এবং আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মতোই নিজগতিকে সকলের অনুকূলে রাখতে চেষ্টা করেছেন।

এই ভাবে হই তাঁর আত্মাকে পৃথিবী এবং আকাশের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে শুদ্ধ আত্মায় উপনীত হতে সমর্থ হয়েছেন। এটাই তাঁর সমাধি তথা আত্মবিস্মৃতির অবস্থা, যা কেউ-ই কল্পনা, শব্দ, বা মানসপ্রতিবিম্ব দ্বারা জ্ঞাত হতে বা প্রকাশ করতে পারেননি।

৩—ইবনে-রোশদ (১১২৬-১১৯৮ খৃঃ)

[ইউরোপে আভারস Averroes নামে পরিচিত]

বু-আলীর দ্বারা যেমন প্রাচ্যদর্শন উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছিল, পাশ্চাত্ত্যেও তেমন ইসলামিক দর্শনের চরম বিকাশ ঘটেছিল ইবনে-রোশদের দ্বারা। রোশদ ইউরোপীয় দর্শনে গতি দান করে আধুনিক দর্শনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখার সাধনাও করেন। ফলে তাঁর মহত্ত্ব আরও বর্ধিত হয়।

(১) জীবনী—আবু-বলীদ মুহম্মদ ইবনে-রোশদের জন্ম হয় ১১২৬ খৃষ্টাব্দে (৫২০ হিজ্‌রী) স্পেনের প্রসিদ্ধ শহর কার্দোবার এক শিক্ষিত পরিবারে। দশলক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত কার্দোবার খ্যাতি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও ছড়িয়ে পড়ে। রোশদের

পরিবারের লোকেরা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। রোশদের পিতামহ মুহম্মদ ছিলেন ইসলামী মীমাংসার (ফিকা) বিখ্যাত পণ্ডিত, কার্দোবার প্রধান বিচারক এবং জামা মসজিদের ইমাম। রোশদের পিতা আহমদও কার্দোবার কাজী এবং জামা মসজিদের ইমাম হন (১০৯৪-১১৬৮ খৃঃ)। রোশদের গৃহই ছিল একটি শিক্ষানিকেতন, সেখানে বহুসংখ্যক প্রবাসী ছাত্রগণ তাঁর পিতৃ-পিতামহের নিকট বিদ্যার্জন করতে আসতেন। অতএব নিজেদের সন্তান রোশদের জন্য তাঁর পিতা-মাতা শিক্ষাব্যাপারে কতটা যত্নশীল ছিলেন তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। রোশদ প্রাথমিকভাবে পিতার নিকট থেকে কোরাণ এবং মোতা নামে ইমাম মালিক লিখিত ফিকার একটি পুস্তক কণ্ঠস্থ করেন। তারপর আরবী ব্যাকরণ এবং সাহিত্য। বাল্যকাল থেকেই কাব্যের প্রতি প্রবল অনুরাগে কিছু কবিতাও তিনি রচনা করেন। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে ঐ অনুরাগ চলে যায় এবং কার্ল মার্কস-এর মতোই কাব্যকে তিনি বাস্তবের অগ্নিতে বিসর্জন দেন।

শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন দর্শনানুরাগী। ঐ সময় (১১৩৮ খৃঃ) বাজা জীবিত ছিলেন। রোশদ ঐ তরুণ দার্শনিকের নিকট দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন, কিন্তু বাজার মৃত্যুর পর তাঁকে অন্য গুরুর আশ্রয় নিতে হয় যাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক আবু-বক্র বিন-জজিয়োল এবং আবু-জাফর বিন-হারুণ রজালি।

বাজার শিষ্য তথা স্বয়ং দার্শনিক হওয়ায় তুফৈল-এর নজর অবধারিতভাবে রোশদের ওপর পড়েছিল। যখন রোশদের খ্যাতি তেমন ছড়িয়ে পড়েনি তখনই তুফৈল লিখেছেন : "বাজার উত্তরকালে যে সমস্ত দার্শনিক আমাদের সমকালীন, তাঁরা এখনও পূর্ণতায় পৌছাননি কাজেই তাঁদের জ্ঞান ও যোগ্যতার আন্দাজ করা এখন সম্ভব নয়।"

রোশদ সাহিত্য, ফিকা (ইসলামীক মীমাংসা) হদিস (পয়গম্বর বচন) প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞানার্জন করেন। কিন্তু দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর বিচার ও নৈপুণ্য দ্রুত স্বীকৃতি পায়। শিক্ষা সমাপ্তির পর রোশদ কার্দোবায় চিকিৎসা ও অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন।

তুফৈল ছিলেন রোশদের বন্ধু। সুযোগ মতো তিনি সুলতান ইউসুফের নিকট রোশদের প্রশংসা করেন। ইউসুফের সঙ্গে রোশদের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা রোশদের একজন শিষ্যের নিকট থেকে শুনে তা আব্দুল্লাহিদ মরাকুশী এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "যখন আমি দরবারে উপস্থিত হই তখন সেখানে তুফৈলও ছিলেন। তিনি ইউসুফের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার সময় আমার শিক্ষা, পরিবার সম্বন্ধে এত উচ্চ প্রশংসা করেন বাস্তবিকই আমার যোগ্যতা অতটা বেশী ছিল না। এই প্রশংসার ফলেই আমি সুলতানের স্নেহভাজন হই। ইউসুফ প্রাথমিক আলাপের পর দার্শনিক ও দেবতা সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন। অর্থাৎ

ঐগুলি নিত্য না অনিত্য। এই প্রশ্নে আমি আতঙ্কিত হয়ে উত্তর খুঁজতে থাকি। অবশেষে বলি যে দর্শনের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। আমার দ্বিধাগ্রস্ততা অনুভব করে ইউসুফ তুফেলের সঙ্গে অ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণের লিখিত সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এমনকি ইসলামী মীমাংসকদের মতামতও আলোচনা করতে থাকেন। নিজের ভাষণ সমাপ্ত করে ইউসুফ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকেন। এতক্ষণে আমারও আতঙ্ক দূর হয় এবং নির্ভয় চিত্তে আমি আমার সিদ্ধান্ত সমূহ বর্ণনা করি। যখন আমি দরবার ত্যাগ করি সুলতান আমাকে মুদ্রা, পোশাক, ঘোড়া এবং বহুমূল্য ঘড়ি উপহার দেন।"
—'ইবনে-রোশদ' (রেঁনার ফরাসী গ্রন্থ পৃঃ. ১০-১১)।

প্রথম সাক্ষাৎকারেই ইউসুফ রোশদের প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রোশদকে শেভিলের (Seville) কাজীর পদ দেন। ঐ বৎসরেই রোশদ অ্যারিস্টটলের প্রাণীশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন : "সরকারী কাজে আমায় এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শান্তচিত্তে লেখার অবসর পাই না। ···আমার অবস্থা অনেকটা তাদের মতো যারা ঘরে আগুন লাগলে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান দ্রব্যাদিই কোনোমতে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। কর্তব্যপালনের জন্য আজ হয়ত মরক্কোয় আছি, কাল কার্দোবায়, পরশু আফ্রিকায়। এইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছুটোছুটি করতে করতেই আমাকে লেখার কাজ চালাতে হয়। অতএব মানসিক অস্থিরতার মধ্যে লেখা ত্রুটি-মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।"

রাজকর্মচারী হওয়ায় তাঁকে এ রকম অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। তবু দর্শনের প্রতি তাঁর প্রীতি সীনার মতোই দৃঢ় ছিল, যার ফলস্বরূপ বহু পুস্তক তিনি রচনা করেছিলেন।

১১৮৪ খৃষ্টাব্দে ইউসুফের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ইয়াকুব মনসুর সুলতান হন। তোমরত এবং আবদুল মোমিন শিক্ষাক্ষেত্রে এমন একটা যুগ রচনা করেন যাতে বাদশাহগণও বিদ্যার্জনে অধ্যবসায়ী হয়ে পড়েন। ইয়াকুব তাঁর পূর্বপুরুষগণের চেয়েও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন সুনিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষ। অতএব উদীয়মান দুই প্রতিবেশী খৃষ্টীয় শক্তিকে কয়েকবার পরাজিত করেন।

ইয়াকুব রোশদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। প্রায়ই দু'জনে দর্শনচর্চা করতেন। গভীর হৃদ্যতার ফলে তাঁরা পরস্পরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করতেন। শেষ বয়সে রোশদ রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে কার্দোবায় পুস্তক রচনা ও অধ্যয়নেই আত্ম-নিয়োগ করেন।

১১৯৫ খৃষ্টাব্দে ইয়াকুব মনসুর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আলফাঁসো-র আক্রমণের প্রতিশোধ (শোধ)নের জন্য কার্দোবায় এসে বাস করেন। ঐ সময়েই তিনি রোশদের মর্যাদাকে অধিবনীমায় পৌঁছে দেন। রোশদের সমকালীন এক কাজীর বর্ণনানুযায়ী—

"আলফাঁসো আক্রমণে উদ্যত হওয়ার সময়েই মনসুর রোশদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। মনসুরের দরবারে তাঁর জামাতা এবং আফ্রিকার শাসক আবদুল বাহিদের তৃতীয় স্থান এবং প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। কিন্তু তাঁকে ছাড়িয়ে মনসুর যখন রোশদকে সেদিন নিজের পাশে বসান তখন আবদুল্লাহিদ যুগপৎ অপমানিত এবং ঈর্ষান্বিত হন। মনসুর রোশদের সঙ্গে যখন শাস্ত্রালাপ করছিলেন তখন তাঁর শত্রুরা রটিয়ে দেয় যে মনসুর রোশদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন। রোশদের অনুরাগীগণ এতে অত্যন্ত দুঃখিত হন। রোশদ দরবারের বাইরে এসে এই সংবাদ শোনেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আসল কথা জানতে পেরে আনন্দিত না হয়ে আফসোস করে বলেন: "এতে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই, কেন না সাফল্য ও সুখের সমাপ্তি হয় শেষ পর্যন্ত চোখেরই জলে।"

রোশদের বাক্য তার সত্যতা প্রমাণ করেছিল। জীবনের শেষ চারটি বৎসর তাঁর দুঃখ এবং শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

(ক) সত্যের জন্য যন্ত্রণা—১১৯৫ থেকে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়াকুব মনসুর যুদ্ধে ব্যাপৃত থেকে শত্রুদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার পর শেবিলীতে কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রোশদের খ্যাতি প্রতিপত্তিতে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হন, এদিকে রোশদও স্বীয় মতামত প্রকাশে কোনো সাবধানতা অবলম্বন করেননি, এই অসতর্কতাই ঐ ব্যক্তিদের সুযোগ দেয় রোশদের ক্ষতি করার। তারা রোশদেরই কয়েকজন শিষ্যকে তাঁর বিচারসমূহ সংগ্রহ করার কাজে লাগান। উদ্দেশ্য, রোশদের খোলাখুলি বাক্য দ্বারাই তাঁর নাস্তিকতাকে নির্বিঘ্নে প্রমাণ করা। এবং হয়েছিলও ঠিক তাই। রোশদ তাঁর শিষ্যগণের নিকট সেইরকম কথাই বলেছিলেন যা সেই মোল্লাশাসিত ধর্মান্ধ যুগে বলা উচিত ছিল না। শত্রুদের আর কি চাইবার থাকতে পারে। তারা রোশদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সমূহকে নুন-ঝাল সহযোগে সুলতানের কাছে পৌঁছে দিলেন। এমনকি একশত সাক্ষীও যোগাড় হয়। ইউসুফ যতবড় দর্শনানুরাগীই হোন না কেন, সমকালীন জয়চন্দ্রের প্রজার মতো প্রজ্ঞা তো তাঁর ছিল না, যাদের সামনে শ্রীহর্ষ ন্যায়ের ঋষি গৌতমকে 'গোতম' অর্থাৎ ষণ্ড বলে সম্বোধন করেও নির্বিঘ্নে শুধু চলাফেরাই করেননি, এমনকি রাজদরবারে আসনও প্রাপ্ত হয়েছিলেন! মনসুর রোশদের পক্ষ অবলম্বন করলে পরোক্ষে তাঁর সৈন্যগণকেই শত্রুতে পরিণত করতেন।

সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয়। রোশদের স্বহস্ত লিখিত রচনা পেশ করে দেখানো হয় যে তিনি এক জায়গায় সুলতানকে বর্বর জাতির সর্দার (মলিকু'ল্-বর্বর) এই মামুলি নামে উল্লেখ করেছেন। এক জায়গায় আবার গ্রীক দার্শনিকদের ন্যায় শুক্রগ্রহকে দেবী বলে সম্মানিত করেছেন। প্রথম অভিযোগের জন্য আবদুল্লা উসুলী রোশদের পক্ষাবলম্বন করে তর্ক করেন, ফলে তাঁকেও অভিযুক্ত করা হয়। সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে রোশদের নাস্তিকতা প্রমাণিত হয়। ইউসুফের কিছুই

করার ছিল না। তিনি রোশদকে সশিষ্য একটি সর্বজনীন সভায় জামা মসজিদের সামনে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন। বাদশাহ্‌ তাঁর অনুচরসহ এখানে উপস্থিত হন। এই সভার বর্ণনা আন্সারী এইভাবে করেছেন : "মনস্থরের দরবারে টীকা ও ব্যাখ্যাসহ রোশদের দর্শন পেশ করা হয়। কিছু ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি তাতে আরও চড়া স্থর সংযোগ করেন। —সমস্তই নাস্তিকতায় পূর্ণ, এ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা কর্তব্য। জামা মসজিদের সামনে বিশাল জনসভায় খলিফা ইউস্থফ রোশদকে পথভ্রষ্ট ও ধিক্কারের পাত্র বলে ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে কাজী আবদুল্লা উস্থলীকেও অপরাধী বলে গণ্য করা হয়। ...তাঁদের কথোপকথনেও নাস্তিকতাই প্রকাশ পায়। জামা মসজিদের অভ্যন্তরে দু'জনকে উপস্থিত করা হয়। ...আবু-আলী হাজ্জাজ দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করেন যে ইবনে-রোশদ একজন ঘোরতর নাস্তিক" —('ইবনে-রোশদ ব ফিলসফা' ; কর-হুল-জোন)।

হজ্জাজের ব্যাখ্যার পর স্থলতান রোশদকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই রচনা সত্যিই তাঁর কি-না। এ এক অদ্ভুত নাটক। মনস্থর কি রোশদের বিচার-ধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না ? কয়েক বৎসর ধরে একত্রে দর্শন-চর্চার পরেও কি তা তাঁর অজ্ঞাত ছিল ? আসলে ধর্মপ্রাণতা দেখানোর এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে জনপ্রিয়তার দ্বারা দৃঢ়নিবদ্ধ রাখার জন্যই তিনি ঐ অজ্ঞতার অভিনয় করেন। খুবই ভালো হতো যদি রোশদও সক্রেটিসের পথ অনুসরণ করতেন, কিন্তু রোশদের সমাজ এথেন্সের সমাজের তুলনায় এত নিম্নস্তরের ছিল যে তারা রোশদকে সমর্থন করত না, তাছাড়া রোশদ তাঁর দর্শন ও বিচার-স্বাতন্ত্র্য নিয়েই সন্তুষ্টভাবে বাঁকি জীবন-যাপন করতে চেয়েছিলেন, নিজের শিষ্যদের নিরাপত্তার দিকেও তাঁকে যত্নবান হতে হয়েছিল। অতএব সবদিক বিবেচনা করে তিনিও নিজের রচনাসমূহ অস্বীকার করেন। জবাব শুনে মনস্থর ঐ অজ্ঞাত লেখকের উদ্দেশে 'নির্লজ্জ' তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করে সভাভঙ্গ করেন। সন্দেহ নেই যে রোশদের অপরাধ জনসমক্ষে প্রমাণিত হয়েছিল। এবং স্থলতান মধ্যস্থতা না করলে জনসাধারণের কোপে তাঁর অবস্থা আরও শোচনীয় হতো। যাই হোক রোশদের নির্বাসন দণ্ডেই তারা শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়।

রোশদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী কয়েকজন ব্যক্তি এমন কথাও বলেন যে স্পেনে যে সব আরবী কবীলা এসে বসবাস করেছেন তাঁদের সঙ্গে রোশদের রক্তের সম্বন্ধ নেই, বরং বনী-ইস্রাইল (ইহুদী) বংশের সঙ্গে থাকা সম্ভব। অতএব কার্দোবার পার্শ্ববর্তী লোসীনিয়া নামক ইহুদী অধ্যুষিত গ্রামে তারা রোশদকে নির্বাসিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রোশদের শত্রু ও মোল্লাগণ, যারা অপ-প্রচার দ্বারা মানুষকে উত্তেজিত করেছিলেন, ঐ মীমাংসায় তারা স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়লেন। রোশদকে যদি ইহুদী এলাকায় নির্বাসন দেওয়া হতো তবে তা তাঁর পক্ষে ভালোই হতো। জনতা মোল্লাদের কথায় আরও কিছু হয়ত বলত,

এই কল্পনা করে তাদের শান্ত করবার জন্য তথা নিজেকে সন্দেহমুক্ত করার জন্য মনসুর একটি সরকারী বিভাগ খোলেন। এর কাজই ছিল দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহকে পুড়িয়ে ফেলা এবং এর পাঠকগণকে কঠোর শাস্তি দেওয়া। উত্তেজিত, ধর্মান্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য মনসুর তাঁর লিখিত একটি ঘোষণা দেশের সর্বত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণাকে আন্সারী তাঁর 'ইবনে-রোশদ' গ্রন্থে পুরোপুরি উদ্ধৃত করে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন: "প্রাচীনকালে এমন কিছু লোক ছিল যারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে সবকিছুতেই যুক্তিহীন প্রশ্ন উত্থাপিত করত; তা সত্ত্বেও তারা বুদ্ধি-প্রাখর্য দ্বারা সাধারণ মানুষকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল। এরা নিজেদের বিচারানুযায়ী এমন গ্রন্থ রচনা করেছিল যা ইসলামী ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে যেন উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতুল্য দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। আমার সমকালীন কিছু ব্যক্তি এই নাস্তিকতা অনুযায়ী পুস্তক রচনা করেছেন, যা আপাতদৃষ্টিতে কোরাণ অপেক্ষাও অলঙ্কৃত কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এর মধ্যে নাস্তিকতা এবং ধর্মবিরোধিতা ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। এই শঠতা বুঝতে পেরে আমি তাদের দরবার থেকে বহিষ্কৃত করে ঐ গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে দিই। কারণ আমি ইসলামী ধর্মগ্রন্থ এবং মুসলমানগণকে নাস্তিকতামুক্ত রাখতে চেয়েছিলাম।... হে খোদা! এই নাস্তিক ও তাদের অনুগামীদের রচনা স্তব্ধ করে দাও।...(আবার জনতার প্রতি অনুরোধ) বিষের মতো এদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলুন, এরূপ কোনো গ্রন্থ হাতে পেলে তা অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন; কারণ নাস্তিকের একমাত্র শাস্তি অগ্নি..."

তর্ক ও দর্শনের প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত মৌলবীগণের মনোভাব কি ছিল তা পণ্ডিত ইবনে-জুহ্‌র —যাঁকে মনসুর, পুস্তকসমূহ দগ্ধ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন— উক্তি থেকেই জানা যায়। দু'জন শিষ্য তাঁর নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করত। একদিন তাদের নিকট একটি তর্কশাস্ত্র-গ্রন্থ দেখে জুহ্‌র ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দেন। কিছুদিন পরে তারা গুরুর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে যে গ্রন্থটি তাদের একজন বন্ধুর, ভুলক্রমে সেটি তাদের কাছে রয়ে গিয়েছিল। জুহ্‌র তাদের ক্ষমা করে উপদেশ দেন —কোরাণ কণ্ঠস্থ কর, ফিকা এবং হদীস পাঠ কর। তাদের ঐ পাঠ সমাপ্ত হলে তিনি তাঁর গ্রন্থাগার থেকে ফোর্ফোরিয়াস রচিত ইসাগোজী নামক পুস্তক এনে বলেন —এখন এই পুস্তক সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের সময় হয়েছে। অতএব বোঝা যাচ্ছে বাহ্যিকভাবে তর্ক ও দর্শনগ্রন্থ দগ্ধ করলেও জুহ্‌র আন্তরিকভাবে দর্শনানুরাগী ছিলেন। জুহ্‌র এক শত্রু তাঁকে জব্দ করার জন্য বহুলোকের স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্রে মনসুরকে জানান যে জুহ্‌র নিজেই একজন দর্শনচর্চাকারী, তাঁর গৃহেই আছে দর্শনের সহস্র গ্রন্থ। মনসুর এই আবেদন-পত্রের লেখককে অবিলম্বে বন্দী করার হুকুম দেন। স্বাক্ষরকারীরা আতঙ্কিত হয়ে আত্মগোপন করেন। মৌলবীগণ জনতার চোখে ধুলো দিয়ে তাদের মনে ধর্মান্ধতার

আগুন জেলে দিতেন। মনস্থর জানতেন যে ঐ আগুন বেশীদিন প্রজ্জলিত থাকবে না, তবে তাকে নির্বাপিত করা তখনই সম্ভব যখন একটা বৃহৎ কিছু উৎসর্গ করা যাবে। রোশদই ছিলেন সেই উৎসর্গ, জনতাও শান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মনস্থর জানতেন যে তাদের আবার উত্তেজিত করা মৌলবীদের পক্ষে কঠিন হবে না। অতএব তাদের কঠোর হস্তে দমন করার সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করলেন।

রোশদের সঙ্গে জহবী, উস্থলী, বজায়া, কাফীফ, করাবী প্রভৃতি আরও কয়েকজন দার্শনিককে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। মৌলবীগণ উল্লসিত হয়ে তাঁদের নিয়ে ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন, অথচ এঁরা অনেকেই ছিলেন শিক্ষিত। এই কবিতাগুলির কিছু কিছু আজও স্থরক্ষিত আছে।

স্পেনে ইহুদীরা প্রথম থেকেই দর্শনের প্রচারক ছিল। লুসীনিয়ার ইহুদীরা এই উৎপীড়িত দার্শনিকদের দীনহীন শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁদের একটা শ্রদ্ধার আসন দিতে উদ্যোগী হন। আর ভাগ্যের লিখনও এমনই যে স্পেনের এক ছোট্ট গ্রাম ও তার অধিবাসীগণই রোশদকে একজন সত্যের শহীদ বলে বুঝতে পারেন। তাঁর এই সম্মানের মূল্য আরও বেড়ে যায়, যখন আমরা জানতে পারি যে তাঁরা জানতেন না যে লুসীনিয়ার এই রোশদই ভবিষ্যতে শিক্ষা জগতে একজন পূজ্য দেবতার আসন পাবেন এবং ঐ আসনের ভিত্তিমূলে তাঁর বিচার এবং অপমানের কাহিনীও থাকবে।

তাঁর প্রতি অত্যাচারের কাহিনী তো আমরা জেনেইছি। একবার লুসীনিয়া থেকে ফ্রান্সে পলায়ন করতেও তিনি বাধ্য হন। মৌলবীগণ তাঁকে গ্রেপ্তার করে মসজিদের সামনে দাঁড় করিয়ে এই শাস্তি দেন যে মসজিদে যারা ঢুকবে এবং মসজিদ থেকে যারা বেরোবে তারা তাঁর উপর থুথু ফেলবে। রোশদ নিজেই এক অপমানের বর্ণনায় লিখেছেন: "আমি সেদিন সবচেয়ে দুঃখ পেয়েছি, যেদিন পুত্র আবদুল্লাকে নিয়ে কার্দোবার জামা মসজিদে নমাজ পড়তে গিয়েও পড়তে পাইনি। বহু দুর্বৃত্ত চিৎকার ও সোরগোল শুরু করে আমাদের দু'জনকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার করে দেয়।" ('ইবনে-রোশদ'; রেনাঁ কর্তৃক একজন পুরনো লেখক আবু-মহম্মদ আবদুল কবীর আন্সারী থেকে উদ্ধৃত; পৃঃ. ১৬)।

রোশদকে লুসীনিয়া থেকে নির্বাসিত করে তাঁকে নির্জনে নজরবন্দী করে রাখা হয়।

(খ) মুক্তি ও মৃত্যু —দুই বছর ধরে কেবলমাত্র নিজের দার্শনিক প্রতিভায় দ্বারা রোশদ তাঁর দুঃসহ মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। মনস্থর বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই যুগ এবং ইতিহাসের সামনে তাঁর অপরাধের বোঝা তিনিই বাড়িয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু রোশদের পরিবর্তে সমস্ত শাস্তি মাথা পেতে নেওয়ার সাহস তাঁর ছিল না। এরপর মনস্থর তাঁর প্রতিবেশী খৃষ্টান রাজাকে পরাজিত করে প্রজাদের ওপর একজন বিজয়ী রাজা হিসেবে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। এদিকে

মৌলবীগণের প্রচারের প্রভাবও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। সেবিলির (অস্‌বিলিয়া) কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মনস্থরের ইঙ্গিতেই হোক বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সাক্ষ্য দেন যে রোশদের ওপর মিথ্যা, ভিত্তিহীন কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে! মনস্থর শর্ত আরোপ করেন যে যদি রোশদ জামা মসজিদে সমবেত জনতার সামনে অনুশোচনা প্রকাশ করেন তবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। যতক্ষণ নমাজ পাঠ চলল রোশদও ততক্ষণ উন্মুক্ত মস্তকে মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান থাকলেন (এবং খোদাও শান্ত হৃদয়ে সেই নমাজ শুনলেন!)। এরপর রোশদ কার্দোবায় অত্যন্ত দরিদ্র জীবন-যাপন করতে লাগলেন।

মনস্থর প্রকৃতই রোশদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাই রোশদের উপকার করার উপায় সন্ধান করতে থাকলেন। ইতিমধ্যে মরক্কোর কাজীকে বরখাস্ত করার প্রয়োজন হয়েছিল। মনস্থর সেই শূন্যপদে তাড়াতাড়ি রোশদকে নিয়োগ করলেন। দর্শনের গ্রন্থ ধ্বংস করার হুকুম প্রত্যাহার করলেন, এবং রোশদের সঙ্গে অন্য যাঁদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাঁদেরও মুক্ত করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব দিলেন!

এর এক বৎসর পরে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর মরক্কোয় রোশদের জীবনাবসান হয়। তাঁর শব কার্দোবার বনেদী কবরস্থান মকবরা-আব্বাসে কবরস্থ করা হয়।

তাঁর মৃত্যুর ২৩ দিন পরে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী মনস্থরেরও মৃত্যু হয়। এবং সেই সঙ্গে তাঁর নামে যে কলঙ্ক লিপ্ত হয়েছিল তাও মুছে যায়। এর অল্প কিছু দিন পরে স্পেনের মাটিতে কেবলমাত্র মনস্থরের বংশের শাসন নয়, ইসলামী শাসনেরও অবসান ঘটে কিন্তু রোশদের বাণী সারা ইউরোপে ধ্বনিত হতে থাকে।

(গ) রোশদের চরিত্র—এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বাজী মন্তব্য করেছেন—

"ইবনে-রোশদের সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। তাঁর প্রতিভা তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করেছিল। স্থির-প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলেই কোনো কষ্টতেই তিনি ভীত ছিলেন না।

"গাম্ভীর্যের জীবন্ত মূর্তি ছিলেন রোশদ ' বেশী বাক্যব্যয় করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। অভিমান তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। কাউকে ভালো-মন্দ কথা বলা তাঁর পছন্দ ছিল না। ঐশ্বর্য এবং উচ্চপদে তাঁর লোভ ছিল না। নিজের জন্য কোনোদিন তিনি ব্যয় করেননি। অন্যকে সাহায্য করে তিনি আনন্দানুভব করতেন। দাম্ভিকতার প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক ঘৃণা। উদার ও মহান্ হৃদয়ে শত্রু-মিত্র সকলকেই তিনি স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—'বন্ধুগণের সঙ্গে আমি এমন আচরণ করি যা আমার রুচিকে আঘাত করে না। দয়া এবং উপকার শত্রুকেও দেখানো যায় কিন্তু সেটা আমার রুচির বিরোধী'।

"তিনি এত দয়ালু ছিলেন যে কয়েক বছর কাজীর পদে কাজ করলেও কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেননি। এ রকম কোনো অবস্থা এলে স্বয়ং বিচারকের আসন ত্যাগ করে অন্য ব্যক্তিকে সেখানে বসাতেন। গ্রীক দার্শনিকগণের নিকট এথেন্স ছিল

যেমন প্রিয় তাঁর নিকট কার্দোবাও ছিল তেমন। একবার মনস্থরের দরবারে জুহ্ ও রোশদ নিজ নিজ দেশের উৎকর্ষতা নিয়ে বিতর্ক করছিলেন। রোশদ পরিহাস করেন —'যখন সেবিলিতে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন তাঁর পুস্তকসমূহ বিক্রয়ার্থে কার্দোবায় নিয়ে আসা হয়, কারণ সেগুলির সঠিক মূল্যায়ন করার মতো ব্যক্তি সেবিলিতে নেই। অবশ্য কার্দোবার কোনো সঙ্গীতজ্ঞের মৃত্যু হলে তাঁর বাদ্যযন্ত্রগুলিও একই কারণে সেবিলিতে নিয়ে যাওয়া হয়'।"

গ্রন্থপাঠে রোশদের প্রবল আসক্তি সম্বন্ধে ইব্‌নু'ল-আবারের মন্তব্য হলো যে : "রাত্রিবেলাও রোশদের হাতে বই থাকত। তাঁর জীবনে মাত্র দুটি রাত্রি তিনি বই-ছাড়া ছিলেন; এক তাঁর বিবাহ-রজনী এবং দুই তাঁর পিতার মৃত্যু-রাত্রি।"

(২) কৃতি —বিভিন্ন গ্রন্থের ওপর রোশদের লিখিত পুস্তকের সংখ্যা ষাটেরও অধিক। ইব্‌নু'ল আবারের বর্ণনানুযায়ী সেগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা আনুমানিক দশ হাজার। মৌলবী মুহম্মদ ইউনুস আন্সারী (ফিরিঙ্গীমহলী) 'ইবনে-রোশদ'-এ (যা আমার এই প্রকরণেরও মুখ্য আধার) বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রোশদের নিম্নলিখিত পুস্তক-সমূহের বিস্তৃত সূচীপত্র দিয়েছেন; আমি তা থেকে শুধুমাত্র পুস্তকের সংখ্যা তুলে দিলাম।

পুস্তক	সংখ্যা
(১) দর্শন	২৮
(২) চিকিৎসাশাস্ত্র	২০
(৩) ফিকা	৬
(৪) কলাম (বাদ) শাস্ত্র	৪
(৫) জ্যোতিষ গণিত	৮
(৬) আরবী ব্যাকরণ	২
মোট পুস্তক	৬৮

রোশদ তার সমস্ত গ্রন্থই আরবীভাষায় লেখেন। অবশ্য মূল আরবী ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেগুলির লাতিন অনুবাদ মাত্র পাওয়া যায়।

ইবনে-রোশদ স্বয়ং লিখেছেন যে কিভাবে তুফৈল তাঁকে দর্শনগ্রন্থ রচনায় প্রেরণা দিতেন —"একবার ইবনে তুফৈল আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন যে, 'আমীরুল মোমিনীন (ইউসুফ) আফসোস করছিলেন যে অ্যারিস্টটলের গম্ভীর দর্শনের সঠিক আরবী অনুবাদ করার মতো যোগ্য ব্যক্তির বড় অভাব। এ রকম সক্ষম কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি সংক্ষেপে বোধগম্য করে তা অনুবাদ করবেন। তা দেখো রোশদ, আমি তো বৃদ্ধ হয়েছি তা ছাড়া রাজকার্য করে অবসরও পাই না। তুমি যদি এতে প্রস্তুত থাকো তবে আর অসুবিধা থাকে না। আর, আমি তোমাকেই এ কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করার উপযুক্ত মনে করি।' আমি তখন

তুফৈলকে কথা দিই এবং সেইদিন থেকেই অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যা ও টীকা রচনা শুরু করি।"

রোশদের দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—

(১) অ্যারিস্টটল এবং আরও কয়েকজন গ্রীক দার্শনিকের গ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং টীকা ও বিবরণ।

(২) অ্যারিস্টটলের পক্ষ অবলম্বন করে সীনা এবং ফারাবীর যুক্তি খণ্ডন।

(৩) দর্শন শাস্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করে গজ্জালী প্রভৃতি বাদশাস্ত্রজ্ঞগণের যুক্তি খণ্ডন।

রোশদ অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের তিন প্রকার টীকা লিখেছেন—

(১) বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও টীকা —এতে সর্বদাই মূল শব্দের উদ্ধৃতি সহযোগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(২) মধ্যম ব্যাখ্যা —এতে শুধু বাক্যের প্রথম শব্দকে উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(৩) সংক্ষেপ গ্রন্থ —এখানে শব্দানুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

রোশদ কর্তৃক অনূদিত অ্যারিস্টটলের কিছু গ্রন্থের নাম, সন এবং যে স্থানে রোশদ এগুলি অনুবাদ করেছেন সেই জায়গার নাম দেওয়া হলো—

	সন	মূল গ্রন্থের নাম	রোশদের অনূদিত গ্রন্থ	স্থান
১.	১১৭১ খৃষ্টাব্দ	De Coelo et mundo (দেবাত্মা ও জগৎ)	অস্তমাঅ-বল্‌-আলম্‌ (ব্যাখ্যা)	সেবিলি
২.	১১৭৪ „	Rhetoric (ভাষণশাস্ত্র) এবং Poetics (কাব্যশাস্ত্র)	খতাবত-বল-শেঅর (মধ্যম ব্যাখ্যা)	কার্দোবা
৩.	১১৭৪ „	Metaphysics (অধ্যাত্মশাস্ত্র)	মাবাদ'ত্‌-তবীআত্‌ (মধ্যম ব্যাখ্যা)	কার্দোবা
৪.	১১৭৬ „	Ethics (নীতিশাস্ত্র)	অথ্‌লাক (মধ্যম ব্যাখ্যা)	কার্দোবা
৫.	১১৮৬ „	Physics (সায়েন্স বা বস্তুশাস্ত্র)	তবীআত্‌ (বিস্তৃত ব্যাখ্যা)	সেবিলি

এ ছাড়া তাঁর স্বরচিত কিছু গ্রন্থের নাম, সন এবং স্থানের নাম দেওয়া হলো—

	গ্রন্থের নাম	সন	স্থান
১.	জবাহুরু'ল্‌-কৌন	১১৭৮ খৃষ্টাব্দ	মরক্কো
২.	কশ্‌ফ-মনাহজু'ল্‌-অবলা	১১৭৯ „	সেবিলি
৩.	আল্‌-ইস্তেকাত্‌ (ব্যাখ্যা) মূল লেখক জালিনুস (গ্যালেন)	১১৯৩ „	সেবিলি
৪.	বাজ'ল্‌-অসঅলা ব'ল-অজবা ফি'ল-মস্তিক	১১৯৫ „	নির্বাসন

অ্যারিস্টটলের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিকে রোশদ তিনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলি আরবী ইরাণী, এবং লাতিনের মধ্যে কোনো না কোনো ভাষায় লেখা হয়েছে—

১. তবীয়াত্ (বস্তুশাস্ত্র) ২. সমাম (দেবতা বা ফরিস্তা)

৩. Nous (ভাব বা আত্মাশাস্ত্র) ৪. মাবাদ'ত্-তবীয়াত্ (অধ্যাত্মশাস্ত্র ;

অ্যারিস্টটলের প্রাণীশাস্ত্রের (কিতাবু'ল্-হৈবান) দশ অধ্যায়ের বেশী রোশদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না ; নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন : "আমি অ্যারিস্টটলের রাজনীতি-শাস্ত্রের আরবী অনুবাদ স্পেনে পাইনি, তাই বাধ্য হয়ে প্লেটোর 'প্রজাতন্ত্র'কেই নির্বাচন করি।"

রোশদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত বুঝতে হলে তাঁর দর্শন সম্বন্ধীয় 'সংক্ষেপ', (তল্খীস্) ফারাবী ও সীনার উদ্দেশে আক্ষেপ এবং তর্কশাস্ত্রের খণ্ডন দেখা দরকার, যেগুলি দুর্ভাগ্যবশত কোনো প্রচলিত ভাষায় খুব কম ছাপা হয়েছে। রোশদের কোনো পুস্তকের বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, অতএব পাঠককে কিছু উদ্ধৃতি উদাহরণেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

রোশদের পুস্তকের হস্তলিপি ইউরোপের যে সমস্ত গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় সেগুলি হলো : (১) স্ক্যারিয়াল গ্রন্থাগার (মাদ্রিদ থেকে ৪০ মাইল দূরে, স্পেন) ; (২) বিব্লিয়োথেক ন্যাশনাল (প্যারিস) ; (৩) বোড্লিয়ান লাইব্রেরী (অক্সফোর্ড. ইংলণ্ড) ; (৪) লারন্তিন লাইব্রেরী (ফ্লোরেন্স, ইতালী) ; (৫) লাইডেন লাইব্রেরী (হল্যাণ্ড)। এর মধ্যে সর্বাধিক গ্রন্থ স্ক্যারিয়ালে সংরক্ষিত আছে। স্পেন ও ইতালীতে আরবী লিপিতে কিছু হাতে লেখা বই আছে, তবে ইব্রাণী-লিপিতে আরবী ভাষায় ইব্রাণী ও লাতিন গ্রন্থের অনুবাদই সর্বাধিক। ভারতের আরা শহরের এক মসজিদেও তাঁর দুটি গ্রন্থ আছে।

(৩) দার্শনিক বিচার—রোশদের নিকট অ্যারিস্টটলই ছিলেন মানুষের বুদ্ধির উচ্চতম বিকাশের ক্ষেত্র। তিনি অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ ও দর্শনকে এমনভাবে প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করেছিলেন যাতে সেই তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করতে মানুষের না অসুবিধা হয়। ফারাবী দ্বিতীয় অ্যারিস্টটল নামে খ্যাত হয়েছিলেন, কিন্তু রোশদ অ্যারিস্টটলকে অনেক গভীরভাবে বুঝেছিলেন, তাই ফারাবী ও সীনার ত্রুটিসমূহ নির্দেশ করতে দ্বিধা করেননি। পরবর্তীকালের জগৎ তাঁকে যে অ্যারিস্টটলের ভাষ্যকার উপাধি দিয়েছিল তা যদি তিনি শুনতে পেতেন তবে কত আনন্দিত হতেন।

প্রথমে আমি সেই বিষয়েই আলোচনা করতে চাই যে ব্যাপারে রোশদ এবং গজালীর মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ছিল—

(ক) গজালীর যুক্তি খণ্ডন—রোশদের সমকালীন শ্রীহর্ষের দর্শনগ্রন্থ 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য'-এর সঙ্গে রোশদের গ্রন্থ তোহাফতুল-তোহাফতুল-ফিলাসফা

(দর্শন-খণ্ডন-খণ্ডন) নামের সাদৃশ্য আছে। অবশ্য নামগত সাদৃশ্য থাকলেও এদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও এক বলে মনে করলে ভুল হবে। সাদৃশ্য বলতে উভয় গ্রন্থেরই রচনাকাল এমন সময়ে যখন খণ্ডন এবং পুনর্গঠন খুব বেশী প্রচলিত ছিল। শ্রীহর্ষ তাঁর 'খণ্ডন'-এ ধর্মকীর্তি এবং তাঁর ন্যায় বস্তুবাদী দার্শনিকগণের বক্তব্য খণ্ডন করে 'শূন্য-ব্রহ্মবাদ' স্থাপিত করতে চেয়েছেন। রোশদ চেয়েছেন গজালীর দ্বিবিধাত্মক 'ব্রহ্মবাদ'কে খণ্ডন করে বস্তুবাদী বিজ্ঞানবাদ —যা কি-না ধর্মকীর্তির মতবাদের খুব কাছাকাছি —তাই প্রতিষ্ঠিত করতে। অর্থাৎ একই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই মহান্ দার্শনিকের মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ বস্তুবাদের জায়গায় অবস্তুবাদ (শূন্যবাদ) এবং আর একজন (রোশদ) অবস্তুবাদ (সুফী ব্রহ্মবাদ)-এর পরিবর্তে বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ভবিষ্যতে এর পরিণাম কি হলো ? শ্রীহর্ষের পরম্পরা ব্রহ্মবাদের মায়াজালে আবদ্ধ করে ভারতে এক মৃতপ্রায় সমাজের আবির্ভাব ঘটালেন, আর রোশদের পরম্পরা পুনর্জাগরণের সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে নব্য-ইউরোপীয় সমাজের জন্মদানে সাফল্য অর্জন করলেন। ভারতে যদি গজালী ও শ্রীহর্ষ-এর ধারা সর্বমান্য হয়ে থাকে তবে তার কার্য-কারণ সম্বন্ধও দেখতে হবে।

(ঘ) **দর্শনালোচনা গজালীর অনধিকার চর্চা**—এ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে আমাদের ইসলামী বাদশাস্ত্র (=কলাম)-কে স্মরণে রাখা দরকার। মোতজলা, 'বাদ'-কে গ্রহণ করেন, অতঃপর আবুল-হাসান অশ্‌অরী এই সুযোগ নিয়ে বসরায় মোতজলার ওপরে আঘাত শুরু করেন। অশ্‌অরীর ন্যায় আবুবকর বাকলানী 'বাদে'-র মধ্যেও কিছু দর্শনের মিশ্রণ ঘটাতে চান, যাকে গজালীর গুরু ইমাম হর্মৈন শুধু তাঁর জ্ঞানের আশ্রয়ই দান করেননি, এমনকি গজালীর মতো একজন শিষ্যকেও উপযুক্ত করে দিয়েছিলেন। গজালী সুফীবাদ, বুদ্ধিবাদ, অযুক্তিবাদ, ধর্ম, কোরাণ, দর্শন, কবিলাশাহী, গণতন্ত্র সবকিছুর সংমিশ্রণে যে জগাখিচুড়ি তৈরী করেছিলেন তার নমুনা আমরা দেখেছি। রোশদ এই জগাখিচুড়িকে পছন্দ করেননি, তিনি তাঁর গ্রন্থ 'কশফুল্-অদলা'-য় এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম বাহরীগণই মতভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করে। তারপর তা ক্রমান্বয়ে চালিয়ে যেতে থাকেন মোতজলা, অশ্‌অরী, সুফী এবং সবশেষে গজালী। প্রথমে গজালী 'মকাসিদুল্-ফিলাসফা' (দর্শনাভিপ্রায়) নামে পুস্তক রচনা করেন। যাতে গ্রীক আচার্যগণের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নেই। এরপর 'তোহাফতুল ফিলাসফা'-তে তিনটি সিদ্ধান্তের সাহায্যে দার্শনিকগণকে কাফের বলেছেন। 'জবাহুর'ল্-ফিলাসফা'য় গজালী স্বয়ং বলেছেন যে 'তোহাফতুল ফিলাসফা' কেবল মিথ্যা তর্কাতর্কি ; আমার বাস্তবিক বিচার পাওয়া যাবে 'মজ্‌নুন বে-আলা-গৈরে-অহ্লেহী' গ্রন্থে। এরপর তিনি 'মিশকাতু'ল-আনোয়ার' গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে জ্ঞানী ব্যক্তিগণেরও আসল সত্যের সঙ্গে পরিচয় নেই। আবার কয়েক জায়গায় চিন্তন ও মনন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব প্রমাণ করার

জন্য 'মুনক্কজ্-মিন্'ল্-জলাল্' গ্রন্থে অ্যারিস্টটলাদি দার্শনিকগণের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে ; যাঁরা দার্শনিক সিদ্ধান্তকে ঠিক বলে মানেন তাঁদের বিরুদ্ধে বিবিধ অপবাদও দিয়েছেন। সার কথা, গজালীর সিদ্ধান্তগুলি এত বিভিন্ন এবং অস্থির যে তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত জানা মুশকিল।"

গজালী তাঁর যে কুড়িটি সিদ্ধান্ত দ্বারা সমকালীন দার্শনিকগণের মত খণ্ডন করেছিলেন, তার উত্তরও রোশদের 'খণ্ডন-খণ্ডন' (তোহাফতুল-তোহাফতুল ; পৃঃ. ৩৪)-এ পাওয়া যায় : "দার্শনিকগণের সমালোচনা শুধু তিনিই করতে পারেন, যিনি আন্তরিকভাবে দর্শনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন (গজালী, সীনা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ছিলেন না) ; গজালীর আক্ষেপের দুটি কারণ থাকতে পারে —হয় তিনি সর্বজ্ঞ ছিলেন তাই অন্যের অজ্ঞতায় আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু এ কাজ অসৎ ব্যক্তিরই শোভা পায়, নয়ত তিনি স্বয়ং ছিলেন অনভিজ্ঞ, আর অনভিজ্ঞ ব্যক্তির আক্ষেপ মূর্খতা ছাড়া কিছু না। কিন্তু এই দুটি কারণ গজালী সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না, সম্ভবত বুদ্ধি ও জ্ঞানের অহঙ্কারই তাঁকে এই ধরনের পুস্তক রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল, এবং এটাই যে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ তাতে সন্দেহ নেই।"

(b) **প্রকৃতির কার্য-কারণ নিয়ম অটল** —প্রকৃতির কার্য-কারণ নিয়মকে গজালী এই বলে অস্বীকার করেছেন যে, "এটা মেনে নিলে 'করামাত' অর্থাৎ অপ্রাকৃত ঘটনা সম্বন্ধে ভ্রান্তি সৃষ্টি হবে, এবং মনে রাখা দরকার ধর্মের বুনিয়াদ এই করামাতের ওপরেই নির্ভরশীল।" ('তোহাফতুল-ফিলাসফা' ; পৃঃ. ৫৪)

রোশদ তার উত্তর দিয়েছেন : "যিনি কার্য-কারণ নিয়মকেই অস্বীকার করেন, তাঁর এটাও স্বীকার করার প্রয়োজন নেই যে প্রতিটি সৃষ্টি ও কার্যের পিছনে একজন কর্তার হাত আছে। এ কথা ঠিকই যে সরাসরি যে কারণ আমাদের চোখে পড়ে তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগের অভাব আমাদের থাকে, কিন্তু এতেই কার্য-কারণ নিয়মকে অস্বীকার করতে হবে! আসল কথা এমন কিছু বস্তু আছে যার কারণ আমাদের অজ্ঞাত, এর থেকে কিভাবে কার্য-কারণ নিয়মকে একদম অস্বীকার করা যায়? আমাদের কাজ অনুভূত (বস্তু) থেকে অননুভূত (অজ্ঞাত) বস্তুর সন্ধান, না কোনো একটা বস্তু অজ্ঞাত থাকার যুক্তিতে জ্ঞাত বস্তুকে অস্বীকার করা!…

"জ্ঞানের প্রয়োজন কোথায়? অস্তিত্বশীল পদার্থের কার্য-কারণের হদিস পাবার জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু সেই কারণকে অস্বীকার করলে আর কি থাকল? কার্য মাত্রেরই যে কারণ থাকে তর্কশাস্ত্রেই তার অজস্র প্রমাণ মেলে। অতএব কারণকে অস্বীকার করার অর্থ কোনো বস্তুই জ্ঞাত থাকবে না, পদার্থ সম্বন্ধে কারও দৃঢ় ধারণা থাকবে না, ফলে সকল বস্তুই কাল্পনিক বলে পরিচিত হবে এবং পৃথিবীতে জ্ঞানের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে।" ('তোহাফতুল-তোহাফতুল'; পৃঃ. ১২২)

'কশফুল্‌-অদালা'-য় (পৃঃ. ৪১) এই বিষয়ের ওপর রোশদের বক্তব্য হলো—

"যদি কার্য-কারণ নিয়মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় অর্থাৎ কল্পনা করা হয় যে জগতের বর্তমান স্থিতিকে অন্যরূপে পরিবর্তিত করা সম্ভব এবং জগতে কোনো অটল সম্বন্ধ নেই, তাহলে শিল্পীর (হাকিমের) সৃষ্টির (হিকমতের) জন্য কি বাকি থাকবে ? জগতের ক্রম ও নিয়মানুসরণই তো শিল্প। মানুষের শরীরে বিভিন্ন কাজের জন্য যে অঙ্গসমূহ —দৃষ্টির জন্য চক্ষু, গন্ধ গ্রহণের জন্য নাসা, শ্রবণের জন্য কর্ণ —যদি না হয় তবে মানুষের কাঠামোয় শিল্পী ভগবানের সৃষ্টি কি ব্যাহত হবে না ?···

"···যদি বর্তমান এই নিয়ম পরিবর্তিত হয়, যে বস্তুর গতি পশ্চিম দিকে তা যদি পূর্ব দিকে যায়, যার গতি পূর্ব দিকে সে যদি যায় পশ্চিমে ; আগুন ওপরে না উঠে নিচের দিকে নামতে থাকে, মাটি নিচে না পড়ে ওপরে উঠতে থাকে তাহলে কি ঈশ্বরের কারিগরি এবং শিল্প মিথ্যা হয়ে যাবে না ?"

(c) **ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় ভুল** —গজালী দর্শন ও ধর্মের সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন, রোশদও তাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা হলো : "ইবনে-রোশদ ধর্মকে জ্ঞানের বাধা মনে করতেন এবং গজালীর মতে জ্ঞান ধর্মের অন্তরায়।" রোশদ লিখেছেন : "যখন কোনো কথা প্রমাণ (দর্শন) দ্বারা সিদ্ধ হবে তখন ধর্মের কথারও অবশ্যই নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে।"

(খ) জগৎ আদি-অন্তহীন —অ্যারিস্টটল তথা অন্যান্য গ্রীক দার্শনিক বলেছেন যে জগৎ শুধু অ-ভাব থেকেই উৎপন্ন নয়, বরং অনাদিকাল থেকে চলে আসছে এবং অনন্তকাল ধরেই চলবে। ইসলাম ও গজালীর এতে আপত্তি ছিল, রোশদ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থ —'অধিবিদ্যা-সংক্ষেপে' ('তল্‌খীস্‌ -মাবাদ'-তব্‌ইয়াত' ; অধ্যায় ১, ৫) লিখেছেন : "জগতের উৎপত্তি বিষয়ে দার্শনিকগণের দুটি পরস্পর-বিরোধী মত আছে (১) একদল উৎপত্তিকে অস্বীকার করে বিকাশ মেনে নিয়েছেন (২) অপরপক্ষ বিকাশকে অস্বীকার করে উৎপত্তিকে মেনেছেন। বিকাশ-বাদীগণের মতে, বিক্ষিপ্ত পরমাণু সমূহের একত্রিত রূপ নিয়েই উৎপত্তি হয়। এ রকম অবস্থায় নিমিত্ত-কারণ অর্থাৎ ঈশ্বরের কাজ হলো শুধু বস্তুগত পরমাণুর অভ্যন্তরে পারস্পরিক ভেদ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ কর্তা এখানে আর স্রষ্টা থাকেন না বরং চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

"এর বিরোধী, সৃষ্টি বা উৎপত্তির সমর্থকগণ মনে করেন যে ভূত (প্রকৃতি) ব্যতীতই উৎপাদক জগৎ উৎপন্ন করেছেন। আমাদের (ইসলামিক) বাদ-শাস্ত্রী (গজালী, মুত্‌কল্লমীন প্রভৃতি) এবং খৃষ্টান দার্শনিকগণও এই মত মানেন।···

"এই দুটি মত ব্যতীত আরও কিছু মত আছে যাতে কম-বেশী এই বিচার-দুটিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন : (১) ইবনে-সীনা যদিও বিকাশ-বাদীগণের সঙ্গে সহমত ছিলেন যে জগৎ উৎপত্তি কেবল প্রকৃতির আকৃতিকে অবলম্বনের নাম ;

কিন্তু আকৃতির উৎপত্তির প্রশ্নে তিনি অ্যারিস্টটলের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। অ্যারিস্টটলের বক্তব্য হলো : প্রকৃতি এবং আকৃতি উভয়েই অনুৎপন্ন অর্থাৎ নিত্য ; ইবনে-সীনা কিন্তু প্রকৃতিকে নিত্য এবং আকৃতিকে অনিত্য বলে মেনেছেন। তাই তিনি জগৎ-স্রষ্টার নাম রেখেছেন 'আকৃতি কারক শক্তি'। এইভাবে সীনার মতানুযায়ী প্রকৃতি কেবল (কার্যের) অধিকরণ, উৎপাদন বা কাজের সামর্থ্য তার নেই। (২) তাঁর বিপক্ষে দেমাসিয়াস এবং ফারাবীর মত হলো : অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম। (৩) তৃতীয় মতটি অ্যারিস্টটলের। তার সংক্ষিপ্তসার এই : স্রষ্টা (=উৎপাদক) শুধু প্রকৃতি বা আকৃতিরই নন, দুটির মিলনে নতুন যে বস্তু সৃষ্টি হয় তারও উৎপাদক। অর্থাৎ প্রকৃতির (এখানে প্রকৃতিকে সাংখ্য যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সেই অর্থে ব্যবহৃত নয়, বস্তুবাদী অর্থে প্রযুক্ত) মধ্যে গতি দান করে তার আকৃতি, চেহারা এতদূর পর্যন্ত পরিবর্তন করে দেয় যে তার অন্তর্হিত শক্তির অবস্থা থেকে তাকে কর্মাবস্থায় পরিণত করে। স্রষ্টার কাজ শুধু এইটুকুই। অর্থাৎ সৃষ্টি গতি ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু গতির একটা অনিবার্য উপাদান —উষ্ণতা। কারণ ভূমণ্ডলে যে উষ্ণতা নিহিত আছে তার দ্বারাই জল ও মাটি ক্রমশ বৃক্ষাদি, উদ্ভিদ ও প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। সমস্তই কার্য-নিয়মের ক্রমানুসারী ; যা দেখে ধারণা হয় যে, কোনো পূর্ণবুদ্ধি এর পথপ্রদর্শক, যদিও এর কোনো ইন্দ্রিয় বা মানসিক জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী জগৎ-স্রষ্টা আকৃতির স্রষ্টা নয়। আর যদি তা মানা যায় তবে এও স্বীকার করতে হবে যে, বস্তুর উদ্ভব হয় অ-বস্তু থেকে, অর্থাৎ অ-ভাব থেকেই ভাবের উৎপত্তি।

"ইবনে-সীনা আকৃতিকে উৎপন্ন বলে এবং ইসলামী বাদ-শাস্ত্রীগণ বস্তুকে অবস্তু থেকে উৎপন্ন বলে মেনে ভুল করেছেন। এই ভুল সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে এঁরা জগৎ-স্রষ্টাকে এমন এক পূর্ণ স্বতন্ত্র কর্তা বলে মনে করেছেন যিনি একই সময়ে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী বস্তু সৃষ্টি করেন। এই মতানুসারে অগ্নির দাহিকাশক্তি বা জলের তরলতা ও আর্দ্রতা থাকবে না। জগতের সমস্ত বস্তু তাদের ক্রিয়ার জন্য স্রষ্টার ওপর নির্ভরশীল। এমনকি এঁদের ধারণা মানুষ তার কাজের জন্য নিজের অঙ্গকে চালায় না, জগৎ-স্রষ্টাই তার প্রবর্তক ও চালক। এইভাবে এঁরা মানুষের কর্ম-শক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করেছেন।"

অন্যত্র 'তল্‌খীস্-তব্‌হয়াত' (ভৌতিকশাস্ত্র-সংক্ষেপ)-এ এই তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে রোশদ লিখেছেন—

(a) **প্রকৃতি**—"(জগৎ) উৎপত্তি গতিরই এক নাম কিন্তু গতির জন্য একজন গতি-স্রষ্টার প্রয়োজন। এই গতি-কর্তা যখন কেবলমাত্র (অন্তর্হিত) উপযুক্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতার অবস্থায় থাকে তখন এর নাম মূলভূত (প্রকৃতি), যার ওপরে সব রকমেরই আকৃতি বা রূপের আবরণ দেওয়া যায় যদিও সে তার স্বভাবানুসারেই

আকৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। একে ক্ষমতা বা যোগ্যতা ছাড়া আর কোনো তর্কসম্মত নাম দেওয়া যায় না। অর্থাৎ জগৎ অনাদি, কেন না বিশ্বের সমস্ত বস্তুই অস্তিত্বে আসার আগে ক্ষমতা বা যোগ্যতার স্তরে ছিল, অর্থাৎ অ-বস্তু বা অ-ভাব থেকে বস্তু বা ভাবের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব।"

"প্রকৃতি অনাদি এবং অ-নশ্বর; জগতে জাত বস্তুর অনন্ত ক্রম কার্যকর। যে বস্তুর (অন্তর্হিত) ক্ষমতা এবং যোগ্যতা আছে সে নিশ্চয়ই সক্রিয় অবস্থায় আসবে। অন্যথায় জগতে বস্তুবিশেষকে কর্তা ব্যতীতই থাকতে হবে। গতির আগে স্থিতি বা স্থিতির আগে গতি হয় না, কারণ গতি স্বয়ং আদি-অন্তহীন। স্থিতি বা গতিশূন্যতা তার কর্তা নয়, বরং গতিই, গতি এবং স্থিতির কারণ।"

(b) **গতিই সর্বপ্রধান**—"জগতের অস্তিত্ব গতিময়। আমাদের দেহের মধ্যে মুহুর্মুহু যে পরিবর্তন হয় তার দ্বারাই আমরা জগৎকে অনুভব করি; এই পরিবর্তন আসলে গতিরই ভিন্ন ভিন্ন ধরন। বিশ্ব যদি একটা নির্জীব যন্ত্রের মতো স্থির হয়ে যায় তবে আমাদের চিন্তা থেকেও জগৎ-সম্পর্কিত ধারণা দূরীভূত হয়ে যাবে। চিন্তা ও ধারণার গতির ফলেই আমরা স্বপ্ন দেখি। যখন মধুর স্বপ্নে বিভোর থাকি তখন সত্যিই বাহ্য-জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লুপ্ত হয়, অর্থাৎ চিন্তার গতির চমৎকারিত্বের সূচনা ও উপসংহার হয় আমাদের অন্তরের মধ্যেই। গতি যদি অস্তিত্বহীন হতো তবে সৃষ্টির নিরন্তর প্রবাহেরও কোনো অস্তিত্ব থাকত না, অর্থাৎ জগৎ হতো বস্তুশূন্য।"

(গ) আত্মা—অ্যারিস্টটলের নিকট আত্মার অস্তিত্ব যত মহত্বপূর্ণ, রোশদের নিকট তা আরও মহান্ সিদ্ধান্ত। কারণ এর ওপর তিনি তাঁর এক-আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু যেভাবে জগৎকে অনুভব করার জন্য মৌলিক পদার্থ বা প্রকৃতি, গতির স্রোত এবং ঈশ্বরকে জানা প্রয়োজন সেইভাবেই ঈশ্বর বা সক্রিয় হেতু, যিনি কি-না আত্মাসমূহেরও আত্মা (Nous) অর্থাৎ সকল ভাবের উৎস, তাঁর নিকট উপনীত হওয়ার জন্য আগে প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের বা পরমাত্মার মধ্যস্থ তত্ত্ব-আত্মা সম্বন্ধে জানা দরকার।

(a) **প্রাচীন দার্শনিকগণের মত**—প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ আত্মা সম্বন্ধে দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেছেন—একদিকে এম্পিডক্লেস, এপিকিউরাসের ন্যায় দার্শনিকগণ আত্মাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেননি; অন্যদিকে এ্যানাক্সিগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণ আত্মাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেছেন। আত্মার মধ্যে জ্ঞান ও স্বতঃগতি পাওয়া যায়—এ বিষয়ে কিন্তু প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ সকলেই সহমত পোষণ করেছেন। এ্যানাক্সিমনের মতে আত্মা সদা গতিশীল এক আদি অনন্ত নিত্য পদার্থ। ক্ষণিকবাদী হেরাক্লিটাসের মতে সমস্ত পদার্থের মধ্যে আত্মা শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম পদার্থ, তাই তা সমস্ত পরিবর্তনশীল পদার্থ সম্বন্ধেই জ্ঞানী। দেবাজেন আত্মার মূলতত্ত্বকে বায়ুর তুল্য মনে করেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে

আত্মা সূক্ষ্ম এবং প্রজ্ঞাবান। পরমাণুবাদী ডিমোক্রিটাসের মতে আত্মা অস্থির গতিশীল তথা অন্য পদার্থে গতিসঞ্চারকারী পদার্থ বা তত্ত্ব। বস্তুবাদী এম্পিডক্লেসের মতে অন্যান্য মিশ্র বস্তুর মতো আত্মাও চার মৌলিক উপাদান থেকে উৎপন্ন। দেখা যাচ্ছে গ্রীক দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ অবশ্যই আছে কিন্তু সক্রেটিসের পূর্বগামী দার্শনিকগণের মধ্যে শুধু পিথাগোরাস এবং জেনো ব্যতীত সকল দার্শনিকই আত্মা ও বস্তুকে (প্রকৃতি) অবিচ্ছিন্ন উপাদান বলে মনে করেছেন।

(b) **প্লেটোর মত**— প্লেটো অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন আত্মা ও প্রকৃতি দুই সম্পূর্ণ পৃথক উপাদান। তাঁর মতে মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা তিন প্রকার— (১) ভাববাদী আত্মা, যা কি-না মনুষ্যের মস্তিষ্কের মধ্যে সদা গতিশীল, (২) পাশবিক আত্মা যা হৃদয়ে অবস্থিত এবং নশ্বর। এর দ্বারা মানুষ ক্রোধ এবং বীরত্ব প্রাপ্ত হয়; (৩) এর চেয়েও নিম্ন স্তরে প্রাকৃতিক আত্মার অবস্থান। এর দ্বারাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনার উদ্গম হয়। প্রাকৃতিক এবং পাশবিক আত্মা বুদ্ধি বা ভাববাদী আত্মার অধীনস্থ, তবে কখনো কখনো তারা দাসত্বকে অস্বীকার করতে চায় এবং ভাববাদী আত্মা তাদের দমনে অসমর্থ হলে মানুষের কার্যও হয় বুদ্ধিহীনের মতো।

(c) **অ্যারিস্টটলের মত**— অ্যারিস্টটল তার গুরু প্লেটোর মত (প্রকৃতি ও আত্মা ভিন্ন)-কে সমর্থন করেননি। প্রাচীন দার্শনিকগণের প্রতি অ্যারিস্টটলের এই আক্ষেপ ছিল যে তাঁরা আত্মার এমন কোনো লক্ষণ নির্দেশ করতে পারেননি যা তিন প্রকার আত্মার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি নিজেই এই লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন যে, প্রকৃতি হলো ক্রিয়ার আধার এবং আত্মা কেবল ক্রিয়া বা আকৃতি। বস্তু এবং আত্মা অথবা প্রকৃতি ও আকৃতির সংযোগকেই বস্তু-পিণ্ড বলা চলে, উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক। অ-ভাব বা অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকৃতি (= বস্তু)-কে আত্মা (= আকৃতি) প্রকাশিত করে, অন্যদিকে আত্মাও প্রকৃতির মুখাপেক্ষী, কেন না প্রকৃতির মধ্যে দিয়েই তারও আত্মপ্রকাশ, এই যোগ্যতা তার মধ্যে পূর্ব থেকেই সঞ্চিত আছে।

অ্যারিস্টটলও প্লেটোর ন্যায় তিন প্রকার আত্মার কথা বলেছেন— (১) বানস্পতিক আত্মা —যার কাজ প্রসব এবং বৃদ্ধি আর তা উদ্ভিদের মধ্যেই প্রাপ্য; (২) পাশবিক আত্মা —যার মধ্যে প্রসব ও বৃদ্ধির অতিরিক্ত স্মৃতিশক্তিও আছে। সমস্ত পশুজাতির মধ্যেই এই গুণ বর্তমান; (৩) মানবিক আত্মা —এই আত্মা উপরোক্ত দুটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এর প্রসব, বৃদ্ধি, স্মৃতিশক্তি ব্যতীত আছে বুদ্ধি ও চিন্তন, অর্থাৎ বিচারক্ষমতা যা শুধু মানুষের মধ্যেই বর্তমান। প্রাণীশাস্ত্রের জনক অ্যারিস্টটল হয়ত ডারউইনের বিবর্তনবাদ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি, কিন্তু তিনি উদ্ভিদ থেকে পশু ও মানুষের বিকাশের ক্রমানুসারকে অবশ্যই মানতেন; যা জীবের পূর্বের গুণসমূহকে নিয়ে পরবর্তী নতুন গুণের বিকাশের ধারণা থেকেই

বোঝা যায়। তিনি আকৃতি থেকে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেননি। আত্মা ব্যক্তিক রূপে ব্যক্ত হয়ে ব্যক্তির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তা বিনষ্ট হয়। অ্যারিস্টটল আত্মার সীমাকে এখানে সমাপ্ত করে পরমাত্মার (Nous) সীমায় উপনীত হয়েছেন। তাঁর বর্গীকরণ এইরূপ —প্রকৃতি —আকৃতি (= আত্মা) —পরমাত্মা, যার মধ্যে প্রকৃতি এবং আকৃতির সম্পর্ক যেন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুর মতো। উপনিষদের ত্রৈগুণ্যবাদ প্রকৃতি ও আকৃতির সখ্যতাকে স্বীকার না করে আকৃতিকেই আত্মা হিসেবে নিয়ে তাকে পরমাত্মার সখা করেছে (মুণ্ডক উপনিষদ) কিন্তু এখানে যত পরিষ্কারভাবে এই বর্গীকরণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অ্যারিস্টটল তত স্পষ্ট হতে পারেননি। কোথাও তিনি মানবিক আত্মাকে আত্মাকোটিতে রেখে তাকে প্রকৃতি-সহচর তথা ব্যক্তির সঙ্গে উৎপত্তিশীল ও মরণশীল বলে মেনেছেন, আবার কোথাও বা বানস্পতিক এবং পাশবিক আত্মাকে জ্ঞান-লোকে আনতে চেয়েছেন।

প্রজ্ঞাবান আত্মা (Nautic Nous) —এই জ্ঞানী আত্মা নিচের তত্ত্ব (প্রকৃতি, আকৃতি) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সকল জীবাত্মা সম্বন্ধে প্রজ্ঞাবান— এই জ্ঞানী আত্মা বা Nautic Nous বিশেষ উদ্দেশ্যে ওপর থেকে নিচে প্রেরিত হয়েছে। তার সঙ্গে দুনিয়ার কারও আত্মীয় সম্বন্ধ নেই, সে অবয়বী, সামান্য তথা আকৃতির জ্ঞানে জ্ঞানী। এর দ্বারাই মানুষ ইন্দ্রিয়-জগতের বাইরের জ্ঞানগম্য জগৎকে জানতে সমর্থ হয়। এই জ্ঞানগম্য জগতের উপলব্ধি অবশ্য অতিমানব ব্যতীত আর কারও পক্ষে সম্ভব নয় —সেই অতিমানব হলো পরমাত্মা। প্রজ্ঞাবান আত্মা হলো যেন এক দর্পণ যাতে অধ্যাত্ম-জগতের প্রতিবিম্ব মানুষের সামনে প্রতিফালিত হয়।

ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান (ঐন্দ্রিক আত্মা) —জ্ঞানী আত্মা কেবল পরমাধ্যাত্মিকের ন্যায় অবয়বী, আকৃতি বা সামান্য-জ্ঞানের অধিকারী। তাই অবয়বের জ্ঞানের জন্য অ্যারিস্টটল ঐন্দ্রিক আত্মার কল্পনা করেছেন। অগ্নির স্পর্শে তাপকে অনুভূত হওয়াই ইন্দ্রিয় বা ঐন্দ্রিক আত্মার কাজ। এর কর্মক্ষেত্র কেবল দেহেই নির্ধারিত। কিন্তু Nautic Nous বা জ্ঞানী আত্মার (বিজ্ঞান) না আছে অবয়ব, না আছে শরীরের কোনো অংশে তার স্থান, দেহের ভিতরে সে থাকে না, বাহ্য-বিষয়েও তার কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তার ক্রিয়ার জন্য কোনো সীমিত দেশ-কাল নেই। অর্থাৎ সে কখনোই জড় বস্তুকে আশ্রয় করে না।

নাতিক (Nautic Nous) —শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন তাই দেহের বিনাশ হলেও তার বিনাশ হয় না, সে নিত্য সনাতন।

অ্যারিস্টটল Nautic Nous-এর দুটি প্রকার-ভেদ করেছেন —সক্রিয় হেতু এবং অধিকরণ-কারণ বা গ্রাহী ; সক্রিয়-আত্মা বস্তুকে জ্ঞাত হওয়ার যোগ্যতা দান করে, এই-ই হলো পরমাধ্যাত্মিক ভাব, মানুষও যার অংশীদার। অধিকরণ-আত্মা

জ্ঞাত বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার প্রতিবিম্ব নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। এ হলো মানব-ব্যক্তির বিজ্ঞান। উভয়ই বর্তমান, কিন্তু গ্রাহীর ভাব (অধিকরণ-বিজ্ঞানের প্রকাশ) সক্রিয় হেতু বা ক্রিয়া-বিজ্ঞানের পরে ঘটে। ক্রিয়া-বিজ্ঞান তুলনায় শ্রেষ্ঠ, কেন না তা হলো সূক্ষ্ম বিজ্ঞানীয় শক্তি, কিন্তু যেহেতু অধিকরণ বা গ্রাহী বিজ্ঞান তার দ্বারা প্রভাবিত তাই তার মধ্যে শরীরের সংযোগও হয়। অ্যারিস্টটলের আত্মা বা বিজ্ঞান (Nous) সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত এই প্রকার—

(১) ক্রিয়া এবং অধিকরণ-বিজ্ঞান এক নয় ভিন্ন; (২) ক্রিয়া-বিজ্ঞান নিত্য এবং অধিকরণ-বিজ্ঞান নশ্বর; (৩) ক্রিয়া-বিজ্ঞান মানব-ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন; (৪) ক্রিয়া-বিজ্ঞান মানুষের মধ্যেও আছে।

অ্যারিস্টটলের টীকাকার আলেকজাণ্ডার আফ্‌দিসিয়াস এবং দেমাসিয়াস উভয়েই অ্যারিস্টটলের থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁদের মতে ক্রিয়া-বিজ্ঞান মানবের থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন, দেমাসিয়াস এর নাম রেখেছেন ভেদক-বিজ্ঞান এবং আলেকজাণ্ডার বলেছেন 'কারণ-কারণ'।

(ঘ) রোশদের বিজ্ঞান (= আত্মা)-বাদ —রোশদের বর্ণনায় আমরা আত্মার (বিজ্ঞানের) পাঁচটি প্রকার-ভেদ পাই —(১) প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, (২) অভ্যস্ত-বিজ্ঞান, (৩) জ্ঞাতা-বিজ্ঞান, (৪) অধিকরণ-বিজ্ঞান এবং (৫) ক্রিয়া বিজ্ঞান। সিকন্দর এবং আরবী দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক এবং অধিকরণ-বিজ্ঞানকে এক মনে করেছেন, কিন্তু রোশদ কখনো কখনো প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে ক্রিয়া-বিজ্ঞান আত্মার অর্থে গ্রহণ করেছেন, আবার তাকে অনাদি অনুৎপন্নও মনে করেছেন। কোথাও বা এদের ভিন্ন বলে মেনেছেন। দেমাসিয়াস অভ্যস্ত এবং জ্ঞাতা বিজ্ঞানকে এক বলে মেনেছেন, কারণ, আত্মা (= বিজ্ঞান)-কে জন্ম দিতে একমাত্র আত্মাই সক্ষম। প্রকৃতি কখনও আত্মার জন্ম দিতে পারে না। অতএব সমস্ত বিজ্ঞানসম্মত বস্তুই ক্রিয়া-বিজ্ঞান থেকে জাত। এই তত্ত্বকে আরও পুষ্ট করার জন্য তিনি বলেছেন —যদিও সমস্ত বিজ্ঞানই (= আত্মা) কর্তা-বিজ্ঞান (= পর-মাত্মা) থেকে উৎপন্ন, কিন্তু মানুষের জ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার অভ্যাস থেকে প্রাপ্ত যোগ্যতা অনুসারে হয়। তাই জ্ঞাতা-বিজ্ঞান এবং অভ্যস্ত-বিজ্ঞানে কোনো পার্থক্য নেই। দেমাসিয়াসের এই মতের বিরুদ্ধে রোশদ অভ্যস্ত-বিজ্ঞানের মধ্যে দুটি তত্ত্বকে মেনেছেন —একদিকে তিনি জ্ঞাতা-বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের (কর্তা বিজ্ঞান) কার্য বলেছেন এবং তাকে অনাদি অনন্ত বলে মেনেছেন, অন্যদিকে আবার তাকে বলেছেন মানুষের অভ্যাসের পরিণাম তথা উৎপন্ন এবং নশ্বর। নামের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বজায় রেখেও অ্যারিস্টটল এবং তাঁর টীকাকারগণের ন্যায় রোশদও বস্তুত আত্মার (= Nous, বিজ্ঞান) ভেদ না মেনে তার ঐক্যকেই স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো —এ কথা ঠিক যে বিজ্ঞান (= আত্মা) বিভিন্ন ধরনের আকার-প্রকারকে স্বীকার করার ক্ষমতা রাখে, তাই যে পর্যন্ত তার নিজের

স্বরূপ সম্বন্ধ, তার ততদূরই আকার-প্রকার রহিত থাকা দরকার—অর্থাৎ বিজ্ঞানের (=আত্মার) জ্ঞান-যোগ্যতা শুধু তার মৌলিক স্বরূপের মধ্যেই। অবশ্য শুধু যোগ্যতার অস্তিত্বকে স্বীকার করেই মানুষের মধ্যে ক্রিয়া-বিজ্ঞান উৎপন্ন হওয়াকে অস্বীকার করা যায় না; আর ক্রিয়া-বিজ্ঞানকে মানুষের মধ্যে স্বীকার করলে আমি এটাও স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, বিজ্ঞান তার মৌলিক স্বরূপেও কিছু বিশেষ আকার-প্রকারের সঙ্গে মিলনেই মূর্ত হয়ে ওঠে। —"ক্রিয়া কেবল অন্তর্হিত যোগ্যতার প্রকাশের নাম", কোনো বিশেষ আকার-প্রকারের দ্বারা সে রূপপ্রাপ্ত হয়। অতএব এ কথা বলার কোনো কারণ নেই যে আধ্যাত্মিক সম্ভাব্যতা বা যোগ্যতাকে স্বীকার করা যায়, কিন্তু বাহ্য ক্রিয়াবত্তা বা প্রকাশকে স্বাকার করা যায় না। এমতাবস্থায় জ্ঞান ও প্রতীতির অর্থ মাত্র জ্ঞান-যোগ্যতাই নয় এমনকি জ্ঞান-ঘটনাও। যতক্ষণ না আধ্যাত্মিক বা অধিকরণ সম্বন্ধী এবং বাহ্যিক বা ক্রিয়া সম্বন্ধী বিজ্ঞানের পারস্পরিক প্রভাব—অর্থাৎ কি-না ব্যক্তিসত্তা এবং ক্রিয়াবত্তা একত্রিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান অস্তিত্ব প্রাপ্ত হতে পারে না; এটা ঠিক যে অধি-করণ-বিজ্ঞান সংখ্যাবহুল এবং মানবদেহের মতোই নশ্বর কিন্তু স্বয়ম্ভূত হওয়ায় মানব থেকে ভিন্ন ও অবিনশ্বর।

উভয় বিজ্ঞানেই উপরোক্ত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও তাদের মিলিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তিসংখ্যা প্রচুর বলে ক্রিয়া-বিজ্ঞানও প্রচুর হয় অথবা ব্যক্তির প্রাচুর্য হ্রাস পেলে তা ক্রিয়া-বিজ্ঞানের একতায় বিলীন হয়ে যায়। এর আসল অর্থ হলো ক্রিয়া-বিজ্ঞানের (অনাদি, সনাতন) অংশে মানবতা বণ্টিত হয়। মানব মস্তিষ্কের যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষ ক্রিয়া-বিজ্ঞানের অংশভাগী হয়। এই অংশ নিজের স্বরূপে অবিনশ্বর এবং চিরস্থায়ী। এর অস্তিত্ব ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং যদি কখনো মানব-ব্যক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্তও হয় তখনও কিন্তু এর কার্য অব্যা-হতই থাকবে, অবশ্য এমন অসম্ভব কল্পনা করারও কোনো যুক্তি নেই। সমস্ত বিশ্বই পরমবিজ্ঞানের (=পরমাত্মা) রশ্মিতে বিকাশিত। প্রাণী, উদ্ভিদ, ধাতু, মৃত্তিকা সকলই এর শাসনে নিয়ন্ত্রিত। মানুষের মধ্যেও পরমবিজ্ঞান একইভাবে প্রকাশমান, কারণ মানুষও সেই প্রকাশমান বিশ্বেরই একটা অংশ। মানবতার মতো আত্মাও সকল মানুষের মধ্যে বর্তমান। অর্থাৎ বিশ্বশাসক পরমাত্মা (=পরম-বিজ্ঞান) যখন ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তা তখন নানারূপে—কখনো প্রাণী, কখনো দেবতা, কখনো বা মনুষ্য রূপে—উদ্ভাসিত হয়; তাই ব্যক্তি-স্বরূপ নশ্বর, কিন্তু মানবতা-বিজ্ঞান চিরন্তন, কেন না তা বিজ্ঞানেরই একটা অংশ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে ক্রিয়া-বিজ্ঞান এবং মানবতা-বিজ্ঞান একত্রে অনাদি হলে মানবতা কখনও নষ্ট হয় না। মানুষের জ্ঞানের প্রকাশ বিভিন্নভাবে (শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সায়েন্স) হয়েই চলে।

(ঙ) সকল বিজ্ঞানই পরমবিজ্ঞানে মিলিত হয়—রোশদ তাঁর পক্ষ

বিজ্ঞানকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন —(১) মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি-বিজ্ঞান জন্মায়, এবং তখন সে থাকে জ্ঞানের সম্ভাবনা রূপে, আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যতা ক্রিয়ার রূপ পরিগ্রহ করে এবং বিকাশের সমাপ্তি হয়। (২) অভ্যস্ত-বিজ্ঞান আয়ত্ত করাই মানবজীবনের চরম সীমা। কিন্তু তা বিজ্ঞানের চরম স্থান নয়। প্রকৃতির মধ্যে লীন থাকা কালে তার যে বিকাশ তাকেই চরম বিকাশ বলা যায়। প্রাকৃতিক জগৎ থেকে তা যতই শুদ্ধ বিজ্ঞানজগতের দিকে অগ্রসর হয়, ততই তা বিজ্ঞানজগতের সঙ্গে অন্বিষ্ট হতে থাকে ; এই অবস্থায় পৌঁছে বিজ্ঞান সর্ব প্রকার বস্তু সম্বন্ধেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এ হলো সেই অবস্থা যেখানে 'আমি-তুমি'র ভেদ লুপ্ত হয়ে মানুষ কর্তা-বিজ্ঞানে পরিণত হয়। যেহেতু কর্তা-বিজ্ঞানে (= ঈশ্বর) সকল প্রকার বস্তু মজুদ থাকে সেহেতু মানুষও মূর্তিমান সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মে রূপান্তরিত হয়।

[কর্তা (পরম) বিজ্ঞানই সব] অ্যারিস্টটল বলেছেন : "জ্ঞানই বিজ্ঞানের স্বরূপ, মামুলী ইন্দ্রিয় বিষয়ের নয়, সনাতন গুণের অধিকারী বিজ্ঞানজগতের বিষয়। অতএব এ কথা স্পষ্ট যে কর্তা-বিজ্ঞান বা ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয়। ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত জীবন কেবল জ্ঞানক্রিয়া। কর্তা-বিজ্ঞান সনাতন, শুভ ও মঙ্গলময়, এবং জ্ঞান ব্যতীত কোনো কল্যাণ সম্ভব নয় ; অতএব ঈশ্বর এই শুভের স্রোত। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞাতা এবং বিজ্ঞেয়-এর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, কেন না সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং স্বরূপিত। অতএব কর্তা-বিজ্ঞান যদি নিজেকে ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর জ্ঞাতা হন তবে তা তাঁর স্বরূপের জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ তিনি নিজেই একাধারে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়। এর অতিরিক্ত সবকিছুই অস্তিত্বহীন।"

রোশদ তার নীতিশাস্ত্রে বিজ্ঞান অদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখেছেন : "জ্ঞান-প্রতীতির থেকে উন্নত এবং সমস্ত মঙ্গলের উৎস। তার থেকে অন্য কোনো কিছুই কাম্য নয়। ঐ সকলই নশ্বর, কিন্তু জ্ঞান অবিনশ্বর। অন্য শুভগুলির দ্বারা বিভিন্ন ধরনের কামনা পূর্তি হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান যেহেতু আন্তরিক বাসনা তাই তাকে ছাড়া কোনো বাসনাই পূর্ণ হয় না। কিন্তু মুশকিল এই যে, জ্ঞানের উচ্চতম পদ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। মানুষের আপাদমস্তক বস্তুবাদী ধারণায় আচ্ছন্ন, সেই চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে পৌঁছানো সম্ভব নয়, অবশ্য তার ভেতর ঐশ্বরিক জ্যোতি জাগরূক হতে থাকে যদি সে কর্তা-বিজ্ঞান বা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে। মানবতার আবরণ ছিন্ন করে যদি আমিত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারে তবে নিঃসন্দেহে সে পরম শুভের সন্ধান পাবে। প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, মানুষের উচিত মানুষের মতো জীবন-যাপন করা, সে নিজে যেহেতু বস্তু, তাই বাস্তবিকতার সঙ্গে তার সম্পর্ক রাখা উচিত। কিন্তু এই ধারণা ভুল ! সমস্ত জাতির শুভ শুধু সেই বস্তু থেকেই প্রাপ্ত হয়, যা আনন্দ-বৃদ্ধির সহায়ক এবং অনুকূল। অতএব স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেই সত্য-শিবের

সন্ধান মেলে না। মানুষের মধ্যেই তো ঈশ্বরের জ্যোতি বিরাজমান। অতএব সে বিষয়ে খেয়াল রাখা এবং তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টা কেন করবে না? —এটাই তো বাস্তবিক শুভকর্ম, এতেই অমর জীবন লাভ হয়।

"ঐ পদ কেন প্রসংশা-যোগ্য? কারণ তা আশ্চর্যময়, চেতনা আপ্লুতকারী, আনন্দে আত্মবিভোর করে, লেখনী স্তব্ধ হয়, বাক্‌রহিত হয়, শব্দ অর্থের প্রাবল্যে রুদ্ধ হয়, এমন অবস্থায় বাক্য কি করে নিঃসৃত হবে, সে স্বরূপকে ব্যাখ্যা করতে কি প্রকারেই বা লেখনী চলবে?"

(চ) পরম-বিজ্ঞানকে প্রাপ্তির উপায় —যদিও উপরোক্ত উদাহরণের ভাষা থেকে এমন ভ্রম হতে পারে যে রোশদ হয়ত সুফীবাদের যোগ-ধ্যানকে কর্তা-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন, কিন্তু গভীরভাবে অনুশীলন করলে বোঝা যায় যে তাঁর পরম-বিজ্ঞান-সমাগম পরম-জ্ঞান দ্বারা লব্ধ। ইসলামী দার্শনিকগণের মধ্যে রোশদই ছিলেন সর্বাপেক্ষা সুফীবাদ-বিরোধী। যোগ, ধ্যান, ব্রহ্মলীন হওয়া প্রভৃতিকে তিনি মিথ্যাচার বলে মনে করতেন। মানুষ যে জ্ঞানের যোগ্যতা নিয়ে জন্মায় তাকে বিকাশিত করাই কল্যাণকর্ম। মানুষ তখনই শুভত্ব প্রাপ্ত হয় যখন সে তার যোগ্যতাকে উন্নত করে বাস্তবতার দ্বারে উপনীত হয়। সুফীনীতি অসত্য এবং কোনো কাজেই লাগে না। ইন্দ্রিয়জগতের ওপর বিজ্ঞান জগতের প্রভাব বিস্তারের জন্যই মনুষ্যসৃষ্টির প্রয়োজন। মাত্র এই একটি উদ্দেশ্য সফল হলেই মানুষের স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। "দার্শনিকগণের আসল ধর্ম হলো বিশ্বের অস্তিত্বকে অধ্যয়ন করা, কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্পর্কে বাস্তবিক জ্ঞান অর্জন করলেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা করা হয়। এ যেন ঈশ্বরের পরিচয় করানো, প্রকৃত পক্ষে এই কর্মেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। সবচেয়ে গর্হিত কাজ তাঁরাই করেন, যাঁরা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক এই অনুসন্ধানী দার্শনিকগণকে কাফের বলে প্রচার এবং বিরক্ত করেন।" (G. E. Lewis : *History of Philosophy* ; Vol. I)

(ছ) মানুষ পরিস্থিতির দাস —কর্মে মানুষ স্বতন্ত্র বা পরতন্ত্র —অন্যান্য দার্শনিকগণের ন্যায় রোশদও এই বিষয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে জানার আগে সংকল্প সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। কারণ কর্মগ্রহণের পূর্বে তার জন্য সংকল্প করা হয়, অথবা বলা যায় যে সংকল্প হলো এক প্রকার কর্ম —মানস-কর্ম।

(a) **সংকল্প** —সংকল্প সম্বন্ধে রোশদের মত হলো: এ একপ্রকার মানসিক অবস্থা যার উদ্দেশ্য হলো কোনো কর্মগ্রহণের চিন্তা। অবশ্য সংকল্প শুধু আত্মিক প্রেরণাই নয় কিছুটা বাহ্যিক কারণের ওপরেও নির্ভরশীল। বাহ্যিক কারণ সংকল্পকে দৃঢ় করে, সীমা ও স্থায়িত্ব দেয়। অনুরাগ ও দ্বেষ এই দুই মানসিক অবস্থা থেকে সংকল্পের উদ্ভব হয়। অনুরাগ বা দ্বেষ লাভদায়ক বা ক্ষতিকারক বস্তুর অস্তিত্বের ধারণা থেকে জন্মায়। অতএব সংকল্প যে বাহ্যিক কারণের ওপরও নির্ভরশীল তা স্পষ্ট —সুন্দর বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ এবং বিভৎস দৃশ্যে বিতৃষ্ণা ও

ঘৃণার উদয় হয়। মনের এই অনুরাগ-দ্বেষ বা আকর্ষণ-বিরাগের অবস্থার নামই সংকল্প। অতএব মনকে নাড়া দেওয়ার মতো কিছু না থাকলে সংকল্প জন্মায় না।

(b) **সংকল্পোৎপাদক বাহ্যিক কারণ**—(১) মনে রাখা দরকার যে সংকল্পোৎপাদক বাহ্যিক কারণও ক্রমরহিত—নিয়ম-বিহীন নয়; বরং তারা স্বয়ং কারণের অধীন। মনুষ্য-চিত্তে সংকল্পের উদ্ভব অসময়ে হয় না। (২) কারণের পরম্পরার ন্যায় সংকল্পও একপ্রকার ক্রমবদ্ধ শৃঙ্খলা যার প্রতিটি ধাপ বাইরের ধাপের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া (৩) আমাদের দৈহিক গঠন, যার ওপর আমাদের সংকল্প অনেকাংশে নির্ভরশীল তাও এক বিশেষ ব্যবস্থার অধীন। এই তিনটি কারণ কার্য-কারণের শৃঙ্খলায় পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়নিবদ্ধ। এদের প্রতিটি অংশই মানুষের বুদ্ধির সীমার বাইরে। আমাদের দৈহিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন হয় তার সবই আমাদের জ্ঞান বা অধিকারের অনায়ত্ত। আমাদের জীবনে বিস্তৃত বাহ্যিক জগতের অসংখ্য ক্রিয়া ও প্রভাব আমাদের অধিকারের বাইরে থেকেও জীবনে কাজ করে চলে। কাজেই এগুলিকে জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চয় করা অসম্ভব। মানুষ পরিস্থিতির দাস, সে চায় একরকম, ঘটে অন্যকিছু।

(৪) সামাজিক বিচার—রোশদ জ্ঞানের শুভ্র ঝলককে পরমবিজ্ঞান থেকে আগত তথা সবকিছুকেই বিজ্ঞানময় বলে গ্রহণ করেছেন। অথচ প্রকৃতিকে অস্বীকার বা তাকে বিজ্ঞানের মায়া বলে তিনি মনে করেননি; বরং পরিস্থিতিবাদের মধ্যে বিজ্ঞান-জ্যোতির্ময় মানবকে তিনি যেভাবে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বলেছেন, তাতে তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও প্রকৃতি, বিজ্ঞান থেকে কম স্বতন্ত্র নয়। এই দুই প্রকার বিচার নিয়ে তাঁর সমর্থকগণও বস্তুবাদী ও বিজ্ঞান (=ভাব)-বাদী এই দুই দলে স্বাভাবিকভাবেই বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। রোশদ যদি বিজ্ঞানবাদকে পছন্দও করতেন, তবু সন্দেহ নেই যে তিনি গজালীর ন্যায় সুফীবাদী বা শঙ্করাচার্যের মতো অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী ছিলেন না যাতে জগৎকে, কল্পনা, মায়া বা অভ্যাস বলে মনে করা হয়। কিন্তু রোশদের সামাজিক বিচারের যে নমুনা আমি দিতে যাচ্ছি তা অবহিত হওয়ার আগে, জানা দরকার যে তিনি বস্তুবাদ এবং ব্যবহারবাদেই সর্বাধিক বিশ্বাসী ছিলেন।

(ক) সমাজের পক্ষপাতী—সমাজের তুলনায় ব্যক্তিকে তিনি কতটা তুচ্ছভাবে দেখেছেন তা তাঁর এই বিচারেই স্পষ্ট: "মানবজাতি বনস্পতির তুল্য। কৃষক যেমন তার জমি থেকে অপ্রোয়জনীয় আগাছাসমূহ উৎপাটন করে কেবল প্রয়োজনীয় বৃক্ষগুলিরই যত্ন করে, সেইভাবে বড় বড় নগরে জনগণনা করে তাদের মধ্যে যারা বেকার জীবন-যাপন করে এবং এমন কোনো কাজ করে না যাতে জীবিকা নির্বাহ করা যায় এমন সব লোকদের হত্যা করা দরকার। পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মানুসারে নগর বসানো সরকারের কর্তব্য, আর যতদিন না অক্ষম, বিকলাঙ্গ এবং বেকারদের শহর থেকে বহিষ্কার করা না হবে ততদিন এটা

সম্ভব হবে না।" ('ইবনে-রোশদ'; রেনা, পৃঃ. ২৪৭, আন্সারী কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ. ২৬২)

রোশদ অ্যারিস্টটলের রাজনীতি শাস্ত্রের অভাবে প্লেটোর 'প্রজাতন্ত্র'-এর ওপর পুস্তক লিখেছিলেন এবং বহুলাংশে প্লেটোর সঙ্গে সহমত হয়েছিলেন। তাঁর অক্ষম নাগরিকগণকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত, প্লেটোর দুর্বল শিশুগণকে মৃত্যুর জন্য পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্তেরই অনুকরণ। স্বাস্থ্যরক্ষা, আনুবংশিকতা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা যে হত্যা বিনাই দুর্বল ও অক্ষমগণের কল্যাণ সাধন সম্ভব তা রোশদ বোঝেননি। তবুও তৎকালীন শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এটা ক্ষমার অযোগ্য ছিল না। কিন্তু নির্বিচার হত্যার দ্বারা 'হীন' জাতির সংহার করে 'উচ্চ' জাতির বিস্তার সাধনের যে ইচ্ছা তিনি পোষণ করেছিলেন সে বিষয়ে কি বলা যায়!

রোশদ মূর্খ শাসক এবং ধর্মান্ধ মৌলবীদের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন ছিলেন। মৌলবীগণ স্বাতন্ত্র্যের শত্রু হওয়ায় তাদের তিনি মানবতার শত্রু বলে মনে করতেন। সমসাময়িক মৌলবীগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত ছিল এবং চারলক্ষ হস্তলিখিত পুস্তকসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেবার ঘটনা তিনি বিস্মৃত হতে পারেননি। অথচ জগতে সর্বত্র আঁধার দেখলেও ফারাবী কিংবা বাজীর ন্যায় একান্ত জীবন যাপনের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। সমাজ-বিশ্বাসী রোশদ বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তিগত জীবন, কোনো শিল্প বা বিজ্ঞান সৃষ্টিতে সক্ষম নয়। তা বড়জোর, সমাজের পূর্বার্জিত ধনসম্পদে পুষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত এবং মাঝে-মধ্যে কিছু সংস্কার সাধন করতে সক্ষম। সমাজের মধ্যে বাস করেই সমাজের কল্যাণ করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত। এই কারণে তিনি স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী ছিলেন। সদাচারকে তিনি শুভবুদ্ধিজাত মনে করেছেন, ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ব্যক্তিবুদ্ধিজাত নয়, ধর্মবাদীগণের মতানুযায়ী শূন্য থেকে নিক্ষিপ্ত কোনো বস্তুও নয়। তাঁর নিকট সদাচারের অর্থ ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের হিতসাধন। ধর্মের মহত্বকে তিনি সামাজিক উপযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ-ভাবে দর্শন থেকে ভিন্ন এবং প্রতিকূল মন্তব্য করার কারণে ধর্মের অসত্যতায় রোশদ বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্লেটো যেমন "বিভিন্ন ধাতু দ্বারা সৃষ্ট হয়েই মানবের শ্রেণী বিভাগ ঘটে"—প্রচার করে মানুষের মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তেমন রোশদও মনে করেছেন যে ধর্মও তদ্রূপ একটি প্রচার যন্ত্র, এবং একে ব্যবহার করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না যদি তার দ্বারা সমাজের কিছু কল্যাণ করা সম্ভব হয়।

(খ) নারী-স্বাতন্ত্র্যবাদী—মলসমীন শাসক বংশের নারীগণ বোরখাহীন হয়ে এবং পুরুষগণ মুখ আচ্ছাদিত করে দেখাতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা যে কোনো চরম পন্থা গ্রহণ করতে সক্ষম। কিন্তু এই প্রথা শুধু রাজবংশের মধ্যেই সীমিত ছিল এবং তাঁরা যতই প্রগতির ধ্বনি তুলুন না কেন, আসল যে স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ

আর্থিক স্বাধীনতা তা কিন্তু রাজকন্যা অথবা রাজকুলবধূগণের ছিল না।' রোশদ বাস্তবিকই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, একে তিনি সমাজ কল্যাণকর বলে মনে করতেন। স্মরণ করা প্রয়োজন যে প্লেটোও স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারে এত উদার ছিলেন না।

রোশদের মতে, নারী-পুরুষের মধ্যে দৈহিক-মানসিক ক্ষমতায় কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই ! প্রভেদ হচ্ছে কিছুটা পরিমাণগত। শিল্প, সংস্কৃতি, রণ-কৌশল সকল ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের সমান দক্ষতাই দেখাতে পারেন। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারীও সমাজের মঙ্গল সাধনায় ব্রতী হতে সক্ষম। কিছু বিদ্যা ও চারুকলা শুধু নারীগণের জন্যই প্রকৃতির মধ্যে সুসংরক্ষিত থাকে, সঙ্গীতের চরম বিকাশ নারীর মধ্যেই হয়। যুদ্ধে নারীর দক্ষতা কোনো কল্পকাহিনী নয়। আফ্রিকার বদ্দু রিয়াসত জাতির মহিলাগণের মধ্যে রণ-কুশলতার এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে তারা সৈন্যবাহিনী এবং সেনাপতিগণের সাফল্যকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। শাসনযন্ত্র যখন কোনো নারীর হাতে থাকে তখনই রাজ্য যে সঠিকভাবে চলে এমন উদাহরণও আমাদের সামনে আছে। অথচ বর্তমান সমাজে স্ত্রীজাতির জন্য যে শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত তা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, হীন ; ফলে নারীগণ তাঁদের যোগ্যতা প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাঁরা শুধু সন্তান ধারণ ও পালন করা ছাড়া আর কোনো কাজের অবসর পান না। পরিণামে তাঁদের প্রতিভা বিকাশিত না হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে (=স্পেন) তাই এমন মহিলা খুব কমই দেখা যায়, যাঁরা সমাজে বিশেষ স্থানের অধিকারিণী ; এঁদের জীবন বৃক্ষের মতো, ফসলী জমির মতো স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয় ! আজ স্পেনে যে দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মূলে আছে নারীর অসম্মান। অথচ এ দেশে পুরুষের তুলনায় নারী সংখ্যাধিক। মহিলাগণ সংসারে বাড়তি আয় করে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির পরিবর্তে স্বামীর গলগ্রহ হয়ে বোঝাস্বরূপ জীবন-যাপনে বাধ্য হয়।

রোশদের এই বিচার থেকে বোঝা যায় যে তিনি কেন ইউরোপীয় সমাজে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনে এবং নবযুগের সূত্রপাতে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

৪—ইহুদী দার্শনিক

(ক) ইবনে-মৈমুন (১১৩৫-১২০৮ খৃষ্টাব্দ)—যদিও ইবনে-মৈমুন মুসলমান বংশের নয়, ইবনে-জিব্রোলের ন্যায় ইহুদী পরিবারেই ভূমিষ্ঠ হন, তবু ইসলামিক দর্শন বা দার্শনিক বলতে শুধু কোরাণ দর্শনই আমরা বুঝব না, বুঝব এমন এক বিচারধারাকে যে আরব থেকে বহির্গত হয়ে তার ক্ষীণ স্রোত অপর এক নব্য-প্রাচীন বিচারধারার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। তাই আমি স্পেনে

ইসলামী দর্শনধারার উদ্বোধক ইবনে-জিব্রোল সম্বন্ধে লিখেছিলাম, এখন লিখছি ইবনে-মৈমুন সম্বন্ধে, যাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই ধারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

(১) জীবনী—কার্দোবা শহরে ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে মুসা ইবনে-মৈমুনের জন্ম হয়। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন তেজস্বী এবং তীক্ষ্ণধী। যখন তিনি মাত্র কিশোর তখনই জেরুজালেমের 'তালমুদ'-এর ওপর টীকা এবং বিবরণ লেখেন, যার জন্য তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হন। তালমুদ হলো ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ, এর স্থান বাইবেলের নিচে। ইহুদী ধর্মাচার্যেরা জেরুজালেমে প্রবাসকালে বইটি লেখেন। মৈমুনের দর্শন-গুরু কে সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তিনি তাঁর বিচারধারায় রোশদকে অনুসরণ করায় অনেকে তাকে রোশদের শিষ্য মনে করেন। কিন্তু তিনি তাঁর পুস্তক 'দলালা'-তে নিজে এইমাত্র লিখেছেন যে তিনি ইবনে বাজার একজন শিষ্যের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রথম মোহিদীন শাসক আব্দুল মোমিনের শাসনকালে যে দুরবস্থা ইহুদীগণের জীবনে শুরু হয়, সেই সময়ই মৈমুন মিশর দেশে পলায়ন করেন। প্রথমে তিনি মিশরের নতুন শাসক তথা শিয়া সম্প্রদায়ের ধ্বংসকারী সলাহুদ্দীন আয়ুবীর রাজবৈদ্যের কার্যভার গ্রহণ করেন। মিশরে এসে তাঁর রোশদের গ্রন্থপাঠের কৌতূহল হয়। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর যোগ্য শিষ্য ইউসুফ ইবনে-যহ্যাকে লিখেছেন—"আমি ইবনে রোশদের 'হিস্সা ব মহসুস' (ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ও জ্ঞেয়) পুস্তকটি ব্যতীত অন্য সমস্ত গ্রন্থই সংগ্রহ ও একত্রিত করেছি। বস্তুত তাঁর বিচার অত্যন্ত ন্যায়-সম্মত, তাই তা আমার খুবই পছন্দ। দুঃখের বিষয় সময়াভাবে এগুলি অধ্যয়ন করতে পারছি না।"

মৈমুনই সর্বপ্রথম রোশদের মহত্ব উপলব্ধি করেন। তার কথাতেই ইহুদী পণ্ডিতগণ রোশদের দর্শন গ্রন্থ সমূহের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় তাঁদের হিব্রু ও লাতিন অনুবাদকগণও ইউরোপের পরবর্তী বিচার-ধারা গড়ে তোলার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেন। মৈমুনের দেহান্ত হয় ৬০৫ হিজ্‌রী সনে (১২০৮ খৃঃ)।

(২) দার্শনিক বিচার—রোশদ যেভাবে দর্শনের বুদ্ধিপ্রধান দৃষ্টিতে ইসলামের ধর্মীয় (=মজহবী) বাদ-শাস্ত্রীগণের বক্তব্য বিচার করেছিলেন, মৈমুনও সেইভাবেই ইহুদী বাদ-শাস্ত্রীগণের বক্তব্য পর্যালোচনা করেন। রোশদের 'তোহাফতুল-তোহাফতুল' (খণ্ডন-খণ্ডন)-এর ন্যায় তাঁর পুস্তক 'দলালা'-ও ইহুদী ধর্মাচার্যগণের ওপর আঘাত হানে। ইহুদীগণের কতিপয় সিদ্ধান্ত ছিল ইসলামেরই তুল্য এবং সেগুলির খণ্ডনকার্যে মৈমুন, রোশদের ন্যায়ই দৃঢ়তাসহ আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বক্তব্যে তিনি রোশদকেও অতিক্রম করে বলেছিলেন যে: "ঈশ্বর এই নন···এই রকম নন"। তিনি কি কি গুণের অধিকারী তা ব্যাখ্যা করা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। কারণ তাঁর গুণ যদি স্পষ্ট করে বলতে পারি তবে তিনি নিশ্চয়ই সংসারের সাধারণ বস্তুর তুল্য।

মৈমুন এ কথাও বলেছেন যে ঈশ্বরকে "অসঙ্গ-অদ্বৈত"ও বলা চলবে না, কেন না, অদ্বৈতও একটা গুণ। মৈমুন নিজে যদিও জগৎ-অনাদিতত্ত্ব মানতেন না, কিন্তু যাঁরা মানতেন তাঁদেরও নাস্তিক মনে করতেন না। আত্মার বিষয়ে (নফস সম্বন্ধে) সিদ্ধান্তে তিনি রোশদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অভ্যস্ত-বিজ্ঞান থেকে এবং অভ্যস্ত-বিজ্ঞান কর্তা-বিজ্ঞান (ঈশ্বর) থেকে জ্ঞান অর্জন করে। রোশদের মতোই তিনিও বিদ্যাকে (দর্শনকে) আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। জ্ঞানের উন্নতির ওপরেই মানুষের চরম উন্নতি নির্ভরশীল এবং জ্ঞানের সাধনাই যথার্থ ঈশ্বরের উপাসনা বলে তিনি মানতেন। বিদ্যার দ্বারা মানুষ ব্যক্তিজীবনে উন্নতি করতে পারে, কিন্তু সাধনার উপযোগ সকলের নিকট সহজসাধ্য নয়, কাজেই মূর্খ, অ-জ্ঞানীদের শিক্ষাদানের জন্য ভগবান পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেন।

(খ) ইউসুফ ইবনে-যহ্যা (১১৯১ খৃঃ)—ইউসুফ ইবনে-যহ্যা ছিলেন একজন মরক্কোবাসী ইহুদী। ইহুদীগণের নির্বাসনের সময়ে তিনিও মিশরে আসেন এবং মূসা ইবনে-মৈমুনের মিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন। তিনিও ছিলেন রোশদের গুণগ্রাহী। রোশদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় মৈমুনের নিকট লিখিত তার একটি পত্র থেকে: "আমি আপনার প্রিয় কন্যা সুরাইয়াকে বিবাহের প্রস্তাব দিই। তিনি তিনটি শর্তসাপেক্ষে এই দীনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। স্ত্রীধন (মেহর) দেওয়ার বদলে যেন তাঁকে হৃদয় দান করি; (২) পত্নীকে সর্বদা যেন ভালোবাসার অঙ্গীকার করি; (৩) তিনি যেন ষোড়শী কুমারীর মতোই রোমাঞ্চিতভাবে আমাকে আলিঙ্গন করতে পারেন। আমি বিবাহ-পরবর্তী জীবনে তাঁর ঐ তিনটি শর্ত পূরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। আর কোনো আপত্তি না করে তিনি বিবাহে রাজী হন। এখন আমরা পরস্পরের প্রেমে নিমজ্জিত, উৎফুল্ল। বিবাহ তো সাক্ষীগণের সম্মুখেই সম্পন্ন হয়েছে—একজন ছিলেন স্বয়ং আপনি মুসা ইবনে-মৈমুন—অন্যজন হলেন শ্রদ্ধেয় ইবনে-রোশদ।"

সমস্ত পত্রটিই ইউসুফ আলংকারিক ভাষায় লেখেন। সুরাইয়া বস্তুত মৈমুনের কোনো ঔরসজাত কন্যা নন, মৈমুন প্রদত্ত দর্শন-শিক্ষাকেই তিনি মৈমুনের কন্যা-দানের উপমা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এই শিক্ষাদানে রোশদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইউসুফ যখন হলব (আলেপ্পো, সিরিয়া)-এ ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে জামালুদ্দীন কুফতীর হৃদ্যতা গভীর হয়। জামালুদ্দীন লিখেছেন: "একদিন আমি ইউসুফকে বলেছিলাম—যদি এ কথা সত্য হয় যে মৃত্যুর পরেও আত্মা এই দুনিয়ার সংবাদ নিতে পারে, তবে এস আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাদের মধ্যে যার আগে মৃত্যু হবে, সে স্বপ্নে বন্ধুকে দেখা দিয়ে পরলোকের বর্ণনা

করবে। এর কিছুদিন পরেই ইউসুফের দেহান্ত হয়। আমি আশা করতে লাগলাম যে সে স্বপ্নে এসে পরলোকের বার্তা দেবে। প্রতীক্ষা করে দুই বৎসর অতিক্রান্ত হলো। অবশেষে এল সেই সৌভাগ্য-রজনী। স্বপ্ন দেখলাম সে এক মসজিদের অঙ্গনে উপবিষ্ট, তার পোশাক ঝলমল করছে। তাকে দেখে আমার পুরনো শপথের কথা মনে এল। কিন্তু সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল। তখন আমি তাকে প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে অনুরোধ করায়, নিরুপায় হয়ে সে বলল—অবয়বী (=পূর্ণব্রহ্ম) অবয়বে বিলীন হয়ে গেছে এবং অবয়ব (=পরমাণু-শরীর) অবয়বের মধ্যেই রয়ে গেছে।" ('অখবারুল …' ; পৃঃ. ২৫৯)

ইউসুফ ইবনে-যহ্যার প্রসিদ্ধি শুধু একজন লেখক হিসেবেই নয়, তিনি তাঁর গুরুর কাজ —রোশদের দর্শনকে পঠন-পাঠন দ্বারা ইহুদীগণের মধ্যে খুবই সাফল্যের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। ফলে ইহুদীগণের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য জাগে। এই অবস্থা দেখে ইহুদী ধর্মাচার্যগণ মৈমুনের বিরোধী হয়ে যান, এবং ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনের প্রধান ধর্মাচার্য সুলেমান ইবনে-ইদ্রীস আদেশ জারি করেন যে ২৫ বৎসর বয়সের পূর্বে কোনো ব্যক্তি দর্শনচর্চা করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে।

ইউরোপে দর্শনের প্রচার —বিশেষত রোশদের গ্রন্থের অনুবাদের দ্বারা —ইহুদী পণ্ডিতগণ কিভাবে করেছিলেন সে বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করব।

৫ —ইবনে খলদূন (১৩৩২-১৪০৬ খৃঃ)

সামাজিক অবস্থা —ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইসলাম ভারত বিজয় করে প্রাচ্যে নিজের রাজ্য বিস্তার করেছিল এবং ইউরোপের নবজাগ্রত জাতির তাড়নায় তাদের স্পেন পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। এই বিতাড়নে শুধু শাসনক্ষেত্রেই নয়, ইসলাম ধর্মকেও জিব্রাল্টারের তটভূমি ত্যাগ করে আফ্রিকায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আফ্রিকার মরক্কোয় আজও ইসলাম ধর্মের পতাকা উড্ডীয়মান, সেখানকার রাজধানী ফেজে নির্মিত কালো ঝালর দেওয়া লাল টুপি, তুর্কী টুপি নামে আজও ভারতবর্ষের কিছু মুসলমানের মস্তকে দেখা যায়। কবিলাশাহী যুগের ইহুদী ধর্ম যেভাবে রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে ধর্মবিজয়ও করেছিল, সামন্তশাহী যুগের খৃষ্টান ধর্মের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি, তারা কবিলাশাহী মনোবৃত্তি ত্যাগ করে কেবল ধর্মকে অবলম্বন করেই বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রসারও হয়েছিল ; এমনকি ইউরোপের স্লাভ, জার্মান প্রভৃতি সামন্তগণ, তাঁদের প্রজাগণের মধ্যে এত প্রবলভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন যে তাতে কবিলাশাহী স্বাতন্ত্র্য নিঃশেষ হয়ে আসছিল। ফলে নিরঙ্কুশ ঈশ্বরের প্রতিনিধি সামন্ত-শাসন পুষ্টি লাভ করছিল। তবুও খৃষ্টধর্মের এমন কোনো ক্ষমতা

ছিল না, যাতে অন্য রাজ্য আক্রমণ করে, তাকে জয় করে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। বিশুদ্ধ কবিলাশাহী সমাজে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সামাজিক অঙ্গ থেকেই গড়ে উঠত, অতএব তাদের প্রতিটি কার্যেরই যে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল এ কথা বলা যায় না। কবিলাশাহী আরবেই ইসলামের জন্ম, কিন্তু তা ছিল সামন্তশাহী দ্বারা প্রভাবিত, অবশ্য ধর্মক্ষেত্রে সংবদ্ধ থাকা পর্যন্ত। জন্মলগ্নেও তা আর্থিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল অবশ্যই কবিলাশাহী। প্রত্যেকটি কবীলের ঈশ্বর, তার ধর্ম এর জাতীয়তার সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল যে তা অন্য কবীলকে গ্রহণ করানো যেত না। এ দিক থেকে ইসলাম ছিল এমন এক অ-কবীলাশাহী ধর্ম যার ঈশ্বর ও ধর্ম শুধু কুরেশের কবীলাদের জন্য বা আরব ভাষাভাষী কবীলাগুলির জন্য নয়, বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্যই। ধর্মের দিক দিয়ে অ-কবীলাশাহী হলেও ইসলাম ধর্ম, যুদ্ধ ও রাজনীতিতে কবীলাশাহীর অনুকরণেই ইচ্ছুক ছিল। সুলতান স্বাবিয়া শাসনক্ষেত্রে কবীলাশাহীকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন তা আমরা জানি। কিন্তু যুদ্ধনীতিতে ইসলামের নিকট কবিলাশাহীই—তার ধর্মযুদ্ধ বা মালেগনীমত—ছিল নিদর্শন। এ ছিল তাদের সার্বদেশিক নিয়ম এবং এর ঔচিত্য সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ইসলাম যে সামন্তশাহী ধর্ম প্রচার করছিল তার মধ্যে আরও বেশী উদারতার প্রয়োজন ছিল, যেভাবে খৃষ্ট বা বৌদ্ধধর্ম অন্যান্য আন্তর্দেশীয় ধর্মসমূহকেও স্বীকার করেছিল। ইসলামকে এ রকম হতে ইতিহাসও বাধ্য করেছিল, মুহম্মদ তাঁর পয়গম্বরীর প্রারম্ভিক বর্ষে ইসলামের যে নীতি নির্ধারণ করেন তা অনেকাংশেই খৃষ্টধর্মের যুক্তি ও প্রেমের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু কুরেশদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য মদিনায় গিয়েও যখন তাঁকে একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তখন বাধ্য হয়েই তিনি অস্ত্রধারণ করেন। প্রত্যেকটি সশস্ত্র সংগ্রামের পিছনে অবশ্যই একটা নীতি বা লক্ষ্য থাকা দরকার। সেখানকার লোক কবিলাশাহীর নীতি—ধর্মযুদ্ধ এবং লুটপাটকেই বুঝত, এবং পয়গম্বরকেও সেই নীতিই মেনে নিতে হয়েছিল। আর একবার যখন আল্লার দোহাই দিয়ে কোনো নীতি প্রচলিত হয়ে যায়, তখন কোন দেশ কালই বা তাকে দমন করে রাখতে পারে? ইসলাম আরবের বাইরেও এই জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) নিয়ে গিয়েছিল। ইসলামের নেতৃত্ব আরবী কবীলা তথা আরবী সামন্তদের হাত থেকে অনারবী লোকদের হাতে চলে গিয়েছিল এবং তারাও ঐ নীতিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করেছিল।

এ কথা আগেই বলেছি যে একটি ক্ষুদ্র রূপ থেকে ক্রমশ বর্ধিত হয়ে ইসলাম বহুজাতি-ব্যাপী এক বিশ্বধর্মে পরিণত হওয়ার আদর্শ গ্রহণ করে। কবীলা হওয়ার জন্য ধর্ম, ভাষা, জাতি, দেশ এবং সংস্কৃতিতে এক হওয়া প্রয়োজন। ইসলাম এই অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করে। বর্তমানে মরক্কো, ত্রিপোলী, মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়ায় যে সব আরবী ভাষা-ভাষী জাতির বাস, তাদের অনেকেই

সেই এক-ভাষা সৃষ্টির ফল। আরবী ভাষাতেই নমাজ পাঠের ইচ্ছা সেই মনোভাবেরই প্রকাশ। ইরাণ, ইরাক, তুর্কীস্তান প্রভৃতি দেশের জাতীয় সংস্কৃতি তথা সাহিত্যের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টাও এক কবীলা স্থাপনের কুফল। সূচনায় আরবের মুসলিম বিজেতা খুবই উদারতার সঙ্গে এই আদর্শকে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল না, যে কাজ তিনি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন তা বর্তমানের কোনো কোনো জাতি যে শুধু মেনে নিতে চাইছে না তাই নয়, উপরন্তু তাদের মানসিকতা সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে কবীলাশাহী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতেও প্রস্তুত ছিল না। শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর নরহত্যা ও বলি-দান সত্ত্বেও এক কবীলা (সমাজ) সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

সামন্তশাহী যুগের স্থায়িত্বের জন্য ধর্মযুদ্ধের নীতি খুবই অদ্ভুত বৈকি! এরা যে যুদ্ধ করেনি তা নয়, কিন্তু তা রাজার নেতৃত্বে রাজনৈতিক লাভের জন্য। এতে ঈশ্বরের সাহায্য এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হলেও যুধ্যমান দুই পক্ষই জানত যে ঈশ্বর এতে বিরক্তই হন। ধার্মিকগণ জানেন যে ন্যায়ের দিকেই ঈশ্বরের পাল্লা ঝুঁকে পড়ে। অথচ এটা মানা তাদের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর ছিল যে সেই ঈশ্বরের নামেই তাদের লড়াই। এটা জানা দরকার যে ইসলামী অনুকরণেই ইউরোপের বিভিন্ন জাতিকে ধর্মযুদ্ধ শুরু করতে হয়েছিল। এর ভয়ঙ্করতা এতেই বোঝা যাবে যে যেখানে মুসলিম স্পেনে কিছু স্প্যানিশ খৃষ্টান প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, সেখানে খৃষ্টানী স্পেনে একজনও স্প্যানিশ মুসলমান রক্ষা পায়নি।

ইসলামের এমন একটি যুগের একজন দার্শনিক সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব।

(১) জীবনী—ইবনে খলদূনের জন্ম হয় ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার টিউনিস নগরে। তাঁর পরিবার ছিলেন স্পেনের (= সেবিলি) অধিবাসী। অতএব তাঁকে আমরা প্রবাসী স্পেনীয় মুসলমান বলতে পারি। তাঁর শিক্ষালাভ হয় টিউনিসেই। তাঁর দর্শনাচার্য এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি প্রাচ্যদেশ থেকেও জ্ঞানার্জন করেছিলেন, এতে তাঁর শিষ্যেরও সেবিলি, টিউনিস এবং প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষায় লাভবান হওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

শিক্ষা শেষ করার পর খলদূন কখনো কোনো রাজ দরবারে চাকরী করেছেন, কখনো বা দেশের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি কয়েকবার আফ্রিকা এবং স্পেনের সুলতানগণের মধ্যে রাষ্ট্রদূতের কাজও করেছেন। এই কাজে তিনি সেবিলিতে পিটারের দরবারে কয়েকদিন ছিলেন। এই সময়ে তাঁর পূর্বপুরুষের জন্মভূমি স্পেনের গৌরব, সেবিলিকে খৃষ্টানদের হস্তগত দেখে তাঁর আহত হৃদয় কি চিন্তা করেছিল এবং তার ফল কি হয়েছিল তা আমরা ইতিহাস দর্শন থেকেই জানতে পারি। কৈস্তিলের রাজা পেড্রোর এবং আরও কয়েকজনের দরবারে তিনি ছিলেন। তৈমূরলঙ্গ সেই সময়ে মধ্য-এশিয়া থেকে ভূমধ্য-সাগরের পূর্বতট পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন, দামাস্কাসেও তাঁর একটি রাজধানী ছিল, খলদূন

সেখানেও তৈমুরের সম্মানিত অতিথি হয়ে কিছুদিন কাটান। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে মিশরে তাঁর মৃত্যু হয়।

(২) দার্শনিক বিচার : (ক) প্রয়োগবাদ —ইসলামিক দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করে আমরা দেখেছি যে অশ্‌অরী সম্প্রদায়ের মতো কিছু সম্প্রদায় ও ব্যক্তি তর্ক ও দর্শনকে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, দর্শন ভ্রমমাত্র, বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রাপ্তির পক্ষে শতছিদ্র তরণী। গজালীর মতো কয়েকজনের মন্তব্যানুযায়ী দর্শনের তরী কিছুদূর পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিতে পারে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানার্জনের একমাত্র সহায়ক হলো যোগ-ধ্যান। সীনা ও রোশদ কিন্তু যোগ ধ্যানকে মিথ্যা এবং অকেজো বলে মন্তব্য করেছেন ও বুদ্ধি-নির্ভর দর্শন চর্চাই একমাত্র পথ বলে মেনেছেন। সীনা ও রোশদের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেও খলদূন জগৎ ও তার বস্তুসমূহকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন —এই সম্ভ্রমসূচক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অন্তরে বিশ্বাস জাগিয়েছিল যে, বস্তুজগতের মধ্যেই সত্যে পৌঁছানোর উৎকৃষ্ট উপায় মিলবে। তিনি বলেছেন —দার্শনিকগণ নিজেদের সর্বজ্ঞ ভাবেন, কিন্তু মহান্ বিশ্বকে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া তাঁদের ক্ষমতার বাইরে। জগতের অসংখ্য আশ্চর্য বস্তু ও প্রাণীকে জানা মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তর্কের মাধ্যমে যে নিষ্কর্ষে আমরা পৌঁছাই তা প্রয়োগ বা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না। অতএব এটা স্পষ্ট যে কেবলমাত্র তর্কের সাহায্যে সত্যে পৌঁছাবার চেষ্টা দুরাশা। তাই বৈজ্ঞানিকের কর্তব্য হলো প্রয়োগ থেকে প্রাপ্ত অনুভূতি দ্বারা সত্যের সন্ধান করা। কিন্তু সেখানে শুধু স্বয়ং অনুভূতিতে সন্তুষ্ট না হয়ে পর্যায়ক্রমে মানবজাতির মধ্যেও উৎসাহ সঞ্চারিত করতে হবে। প্রয়োগসিদ্ধতার ওপরেই সত্যতা নির্ভরশীল —বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তকে খলদূন কতটা পুষ্ট করেছিলেন তা আর ব্যাখ্যা না করলেও চলবে।

(খ) তর্ক জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় নয় —স্বভাবত আত্মা জ্ঞানহীন বলে খলদূন মনে করেছেন। সেই সঙ্গে নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা দ্বারা আত্মাকে নিরীক্ষা ও মননকার্যে যখন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন তখন বিশিষ্ট এক বিচারধারা তাঁর অন্তরে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল এবং আমরা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি—বাস্তবতা —সত্য পর্যন্ত পৌঁছালাম। এই প্রয়োগ, মনন, অন্তর্দৃষ্টিকে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ প্রভৃতি তার্কিক ভাষায় ক্রমবদ্ধ করা যায়। অতএব প্রমাণিত হলো যে তর্ক জ্ঞানের উৎপাদক নয়, পথ নির্দেশক, মননকর্মে সহায়ক। তর্ক আমাদের ভ্রম সংশোধন করে, বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে। খলদূন জ্ঞান-অন্বেষণে প্রয়োগকে প্রধান এবং তর্ককে সহায়ক শক্তি বলে মনে করেছেন : তিনি আশা করেছেন তা রসায়ন এবং ফলিত-জ্যোতিষের মিথ্যা বিশ্বাস থেকে মুক্ত হবে।

(গ) ইতিহাস-সায়েন্স —খলদূনের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ অবদান হলো এই যে, তিনি ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করে তার মৌলিক নিয়ম —ইতিহাসের

দর্শন তথা ইতিহাস-সায়েন্সকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। খলদুনের মতে. ইতিহাস বিজ্ঞান তথা দর্শনেরই একাংশ। ঐতিহাসিকগণের কর্তব্য হলো ঘটনাসমূহকে সংগ্রহ পূর্বক তার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধের অনুসন্ধান করা এবং তা নিরপেক্ষভাবে গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে। স্মরণ রাখতে হবে যে, কারণ থেকেই কার্যের উদ্ভব, বর্তমান ঘটনা তার পূর্বস্থিত ঘটনারই অনুরূপ, অর্থাৎ সভ্যতার একই রকম পরিস্থিতিতে ঘটনাও একই রকম হয়। সময়ের সঙ্গে মানব ও মানবসমাজের স্বভাবের খুব বেশী পরিবর্তন না হওয়াই সম্ভব। বর্তমান-সংক্রান্ত সত্য-জ্ঞানই অতীত-সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য প্রয়োজন। আমাদের দৃষ্টির সম্মুখীন জ্ঞাত ঘটনাই পূর্বঘটিত অল্পজ্ঞাত ঘটনার সঙ্গে পরিচয় করে দেয়। প্রতিটি ঘটনা পরম্পরাকে বর্তমানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন, বর্তমানে যদি তাকে একেবারে অসম্ভব মনে হয়, তবে তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা দরকার। বর্তমান ও অতীত যেন কাল-সমুদ্রে দুটি বিন্দু। অবশ্য এটা মনে রাখা দরকার যে, এই নিয়ম সামান্য ক্ষেত্রে ঠিক হলেও, বিস্তারিত ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা দেখা দেয় এবং সেখানে তাকে ঠিক হওয়ার জন্য ঘটনার আবশ্যকতা হবে।

খলদুনের মতে ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সামাজিক জীবন অর্থাৎ সমগ্র সমাজের বাস্তব, বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন। ইতিহাস দেখায় যে মানুষ কিভাবে পরিশ্রম করে আহার সংগ্রহ করে। কেন সে পরস্পর নির্ভরশীল অথবা কোনো নেতার অধীনে থেকে এক বৃহৎ সম্প্রদায়ের অংশীদার হতে চায়? কেমন করে এক স্থায়ী সমাজে, উচ্চতর শিল্প বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে আনুকূল্য ও অবকাশ পায়? কিভাবে ছোট্ট একটি কুঁড়ি থেকে সুন্দর এক সংস্কৃতির কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে আবার ক্রমশ কালে লীন হয়ে যায়? জাতির উত্থান ও পতন নিম্নোক্ত সামাজিক রূপগুলির মধ্য দিয়ে চলে: (১) খানাবদোশী সমাজ; (২) সৈনিক রাজবংশের অধীনস্থ সমাজ; (৩) নাগরিক ধাঁচের সমাজ।

মানুষের প্রথম প্রশ্ন ও চিন্তা আহার নিয়ে। অর্থনৈতিক কারণে মানুষ এবং জাতির তিন রকম অবস্থাভেদ হয়—(১) খানাবদোশ (যাযাবর); (২) স্থায়ী বসবাসকারী পশুপালক; (৩) কৃষিজীবী। আহারের চাহিদাই যুদ্ধ, লুঠতরাজ এবং সংঘর্ষের স্রষ্টা, এবং মানুষ এমন এক রাজার অধীনতা স্বীকার করে যে তাদের নেতৃত্ব দিতে পারে। ঐ সৈনিক নেতা আবার তার রাজবংশ স্থাপন করে এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় নগর—রাজধানী প্রতিষ্ঠার। নগরে শ্রমবিভাগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং তাতে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি ও সম্পত্তিবান হন, ঐ রাজা বা নেতা। এই ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি নাগরিকগণকে ক্রমশ আলস্য এবং বিলাসিতার দিকে আকৃষ্ট করে। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমের দ্বারাই যদিও সমৃদ্ধি সৃষ্টি হয়, কিন্তু উচ্চতম পর্যায়ে এক মানুষ নিজের জন্য অন্যকে দিয়ে পরিশ্রম করাতে সক্ষম এবং প্রায়ই তার শ্রমের বদলে কোনো পারিশ্রমিক না

দিয়ে। সমাজের—বিশেষত ধনীবর্গের প্রয়োজন বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে করের হারও বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ অসহনীয় হয়ে ওঠে। প্রথমত, সমৃদ্ধিশালী ধনিকবর্গের বিলাসিতার দরুণ অকারণ ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে এবং দ্বিতীয়ত করের বোঝা বাড়ে, এর ফলে তারা আরও বেশী গরিব হয়; এর সঙ্গে অস্বাভাবিক জীবন-যাপনের ফলে তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। খলদূন স্বয়ং সেবিলির এমনই এক দারিদ্র্য-কবলিত পরিবারে জন্মেছিলেন। তাই তিনি শুধুমাত্র এই সভ্য প্রভুবর্গের দুরবস্থায় অশ্রুপাত করেছেন, নিজের চারপাশে দাস এবং শ্রমিক শ্রেণীর পশুবৎ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করার অবকাশ পাননি। নাগরিক জীবন, তার পুরাতন রীতি-নীতি বর্জন করে অধিকতর সম্ভ্রান্ত রূপ ধারণ করার ফলে, নিজের মৌলিক উপযোগিতা হারিয়েছিল এবং মানুষ আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। এক সমাজ ও ধর্মে আবদ্ধ থাকার ফলে যে সমষ্টিগত শক্তি ও সামর্থ্য পূর্বে বজায় ছিল, তা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে মানুষ অধার্মিক ও স্বার্থপর হয়ে পড়ল, ফলে শুরু হলো সমাজের অবধারিত ভাঙন। এই সময়ে রেগিস্তান থেকে কিছু প্রবল-প্রতাপশালী খানাবদোশ—যারা প্রগতিশীল সভ্য ছিল না, কিন্তু সমষ্টিগত-জীবনে ছিল দৃঢ়—তারা এই মেরুদণ্ডহীন নাগরিকগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটি নতুন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বারবার বিজয়ী জাতি প্রাচীন সভ্যতা এবং বৌদ্ধিক সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নেয়, ফলে ইতিহাসেরও কলেবর বৃদ্ধি পায়। পরিবারের মধ্যে যেমন, তেমনই রাজবংশ ও সমাজেও উত্থান-পতন দেখা যায়, এইভাবে তিন থেকে ছয় পর্যায়ে তাদের ইতিহাস সমাপ্ত হয়ে যায়। প্রথম পর্যায়ে অধিকার স্থাপন, দ্বিতীয় পর্যায় সেই অধিকার বজায় রাখে, তিন থেকে পরবর্তী কয়েকটি পর্যায় সেই অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং শেষে অনিবার্যভাবে পতন হয়। এ সবই সভ্যতার জীবন-চক্র।

জার্মান পণ্ডিত, অগাস্ট মুলায় বলেছেন, খলদূনের এই সিদ্ধান্ত একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত যুগের স্পেন, মরক্কো, সিসিলী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে প্রচলিত ছিল। মনে হয়, সেই ইতিহাস অধ্যয়ন করেই খলদূন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

খলদূনের প্রধান পরিচয় ঐতিহাসিক হিসেবে, যিনি ইতিহাসের ব্যাখ্যা ঈশ্বর কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশ্রয়ে না করে তার অভ্যন্তরীণ বস্তু থেকে করার প্রচেষ্টা করেছেন এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত নিয়মসমূহের ওপর ভিত্তি করে—ইতিহাস-দর্শনে পৌঁছানর চেষ্টা করেছেন। খলদূন তাঁর ঐতিহাসিক রচনাগুলিতে ইতিহাসের কারণ-শৃঙ্খলায় পৌঁছানর জন্য জাতি, জলবায়ু, খাদ্য-উৎপাদন প্রভৃতি সব কিছুকেই গভীরভাবে বিচার করেছেন, এবং সভ্যতার জীবন-প্রবাহে স্বীয় সিদ্ধান্তকে পুষ্ট হতে দেখেছেন। প্রত্যেক স্থানেই অ-প্রাকৃতিক নয়, প্রাকৃতিক, দৈবী, লোকোত্তর নয়, লৌকিক কারণসমূহের অনুসন্ধান করেই তিনি চরম সীমার সন্ধান পেয়েছেন।

যেখানে কারণ-শৃঙ্খলা অজ্ঞাত থাকে সেখানেই ঈশ্বরকে স্বীকার করতে হয়। ইতিহাসের কারণ-শৃঙ্খলার মধ্যে ঈশ্বরকে টেনে আনা খলদূন অজ্ঞতা বলেই মনে করেছেন। নিজের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হওয়াও একপ্রকার জ্ঞানোদয় বটে, তবে যতদূর সম্ভব যথার্থ জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করা উচিত। খলদূন নিজ কর্ম সম্পর্কে শুধু এটুকু বুঝতেন যে তিনি কেবল মাত্র প্রধান-প্রধান সমস্যা সম্পর্কে ইঙ্গিত করতে সমর্থ হয়েছেন, এবং ইতিহাস-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা, গবেষণা এবং নিরীক্ষার কথা বলেছেন। তিনি আশা করেছেন ভবিষ্যতের মানুষ একে আরও বর্ধিত করবে।

ইবনে খলদুনের আশা পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু তা ইসলামের ভেতর নয়; সেখানে—যেখানে তাঁর বিচারের কোনো পূর্বসূরীও যেমন ছিল না তেমন কোনো যোগ্য উত্তর-সূরীও মেলেনি।

অষ্টম অধ্যায়

ইউরোপের নিকট ইসলামী দার্শনিকগণের ঋণ

মোহিদীন শাসক এবং স্প্যানিশ খৃষ্টানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধে, স্পেনের ইসলামী ও খৃষ্টান উভয় শ্রেণীর ইহুদীগণই তাঁদের জ্ঞান ও জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে স্পেন পরিত্যাগ করেন। এই পলাতক ইহুদীগণ স্পেনের উত্তরদিকে প্রাবিন্স, বার্সিলোনা, সারাগোসা প্রভৃতি যেখানেই বসবাস করেছেন সেখানেই গড়ে উঠেছে বিদ্যাকেন্দ্র।

§ ১. অনুবাদক এবং লেখক

১. ইহুদী (ইব্রানী)

আমরা জানি যে গ্রীক গ্রন্থসমূহের আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। সাত শতাব্দী পরে এই অনুবাদকর্ম আবার নতুন করে শুরু হয়। আরবী ভাষায় গ্রীকদর্শনের ভিত্তির ওপর যে প্রাসাদ গড়ে তোলা হয়েছিল, তার ওপর এখন ইউরোপের দর্শন-প্রেমিকগণের নজর পড়ল এবং তাঁদের অংশীদার হলেন এই প্রবাসী ইহুদীগণ। ইসলামিক স্পেনের বাসিন্দা থাকাকালীন তাঁদের মাতৃভাষা ছিল আরবী, কাজেই অনুবাদের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অন্যদেশে বসবাস ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য সেখানকার ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হলো। ফলে আরবী ভাষা ও লিপিকে দ্বিতায় ভাষার পটভূমিতে টিকিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য ছিল। আঞ্চলিক ভাষাসমূহও এত উন্নত ছিল না, তাই যেখানে তাঁরা আরবী গ্রন্থকে ইহুদী লিপিতে লিখতেন, সেখানে তাদের ইহুদী ভাষাতেই অনুবাদ শুরু করে দিলেন। এর মধ্যে রোশদের গ্রন্থের অনুবাদই সর্বাধিক।

(১) **ইহুদী অনুবাদের প্রথম যুগ** —এই কর্মে ইবনে-তৈবুনের বংশের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। এঁরা ইসলামিক স্পেন থেকে এসে উত্তর স্পেনের ল্যোনলে বসবাস শুরু করেন। এই বংশের পূর্বপুরুষ ইবনে-তৈবুন দর্শন, প্রাণীবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। এবং সর্বপ্রথম অনুবাদক শামুয়েল ইবনে-তৈবুনও ছিলেন এই বংশেরই একজন। ইনি রোশদের অনুকরণে দার্শনিকের সিদ্ধান্ত (আরাউল হুকমা) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সময়েই

স্পেনের টলেডো নগরের যহ্যা বিন সলামা নামে একজন ইহুদী ধর্মাচার্য 'তিব্বুল-হিক্‌মত' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যহ্যা জার্মান রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের দরবারে আরবী গ্রন্থের অনুবাদক হিসাবে কাজ করতেন।

স্যামুয়েলের পরে মূসা বিন্-তৈবুন আরও অনেক বস্তুশাস্ত্র (পদার্থবিদ্যা) গ্রন্থের ইহুদী ভাষায় অনুবাদ করেন। স্যামুয়েলের সমসাময়িক ইবনে-ইউসুফ বিন্-ফাথীরা (জন্ম-১২২৬ খৃঃ) ও জর্সান বিন্-সুলেমানও অনুবাদ কর্ম করেন। জর্সান ছিলেন স্যামুয়েলের আত্মীয় এবং ইনি বহু গ্রন্থ ইহুদী ভাষায় অনুবাদ করেন।

ফ্রেডরিকের দরবারে ইয়াকুব বিন্-মরিয়ম আবী-শামশুন একজন বিখ্যাত ইহুদী অনুবাদক ছিলেন, তিনি ১২৩২ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডরিকের আদেশে রোশদের প্রচুর পুস্তকের অনুবাদ করেন। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির নাম—

তর্কশাস্ত্র (মন্তকিয়াত)-ব্যাখ্যা	১২৩২ খৃঃ, নেপল্‌স্
তর্ক-সংক্ষেপ (তল্‌খীস মন্তিক)	
তল্‌খীস-মুহস্‌সতী	১২৩১ খৃঃ, নেপল্‌স্

এ ছাড়া আরও কয়েকজন অনুবাদকের অনুবাদ গ্রন্থগুলি হলো—

(i) সুলেমান বিন্-ইউসুফের 'মুকালা ফি'স্-সমাঅ-ব-আলম্।' (১২৫৯ খৃঃ)

(ii) জাক্‌রিয়া বিন্-ইসহাক্-এর 'পদার্থশাস্ত্র টীকা', 'অধিবিদ্যাশাস্ত্র-টীকা' এবং 'দেবাত্মা-জগৎ-টীকা'। তিনটি অনুবাদই ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে করা হয়।

(iii) ইয়াকুব বিন্-মশীরের 'তর্ক-সংক্ষেপ' (১২৯৮ খৃঃ) এবং 'প্রাণীশাস্ত্র' (১৩০০ খৃঃ)।

(২) ইহুদী অনুবাদের দ্বিতীয় যুগ —চতুর্দশ শতকে ইহুদী অনুবাদের দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়। প্রথম যুগের অনুবাদের ভাষাও যেমন মনোরম ছিল না তেমনই তাতে মূল গ্রন্থকারের অন্তর্নিহিত ভাবও পরিস্ফুট হয়নি। এই অনুবাদ ফারাবীরও পূর্ব যুগের তুলা, কিন্তু দ্বিতীয় যুগের অনুবাদ তুলনামূলকভাবে ভাষা-ভাব উভয় ক্ষেত্রেই ছিল উৎকৃষ্টতর। এই যুগের সর্বপ্রথম অনুবাদক হলেন কালোনীম্ বিন্-কালোনীম্ বিন্-মীর (জন্ম—১২৮৭ খৃঃ)। তাঁর অনূদিত অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের ক্রমসূচি নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

(i)	Topics	(তর্ক)	১৩১৪ খৃঃ
(ii)	Sophistics	(")	" "
(iii)	The Second Analytics	(তর্ক)	১৩১৪ খৃঃ
(iv)	Physics	(পদার্থবিদ্যা)	১৩১৭ "
(v)	Metaphysics	(অধিবিদ্যা)	" "
(vi)	De coelo et Mundo	(বস্তুবাদ)	" "
(vii)	De generatione et Corruptione	(বস্তুশাস্ত্র)	" "
(viii)	Meteorology	(")	" "

ইব্রানী অনুবাদ —তৌফিক (তর্ক), সোফিস্তা (তর্ক), অনালিতিকে দ্বিতীয় (তর্ক), ভৌতিক শাস্ত্র, অতিভৌতিক শাস্ত্র, দেবাত্মা ঔর জগৎ (ভৌতিক শাস্ত্র), কোন-ব-ফসাদ (ভৌতিক শাস্ত্র), মুকালা ফিল-মাহয়াত (ভৌতিক শাস্ত্র)। এ ছাড়া আরও কয়েকজন অনুবাদকের অনুবাদের পরিচয় নিম্নরূপ—

	অনুবাদক	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	অনুবাদ-কাল
(i)	কালোনীম্ বিন্-দাউদ	খণ্ডন-খণ্ডন (তোহাফতুল-তোহাফতুল)	রোশদ	
(ii)	আবী সামুয়েল বিন্-যহ্বা	নীতিশাস্ত্র	অ্যারিস্টটল	১৩২১ খৃঃ
(iii)	"	'প্রজাতন্ত্র'-ব্যাখ্যা	রোশদ	" "
(iv)	থিয়াদোর	তৌফিক (Topics)	অ্যারিস্টটল	১৩৩৭ "
(v)	থিয়াদোর	খিতাবত্ (Rhetoric ভাষণশাস্ত্র)	"	" "
(vi)	"	আচার-শাস্ত্র	"	" "

এই শতাব্দীরই অনুবাদক : ইবনে-ইসহাক ; মূসা বিন্-সুলেমান ; যহ্বা বিন্-মৈমুন ; যহ্বা বিন্-ইয়াকুব ; মূসা বিন্-তাবুরা ; সুলেমান বিন্-মূসা আল্-গোরী। এঁরা রোশদের প্রায় সব গ্রন্থ ইব্রানীতে অনুবাদ করেছিলেন।

(ক) লেয়ন আফ্রীকি —এই চতুর্দশ শতাব্দীতেই লাবী বিন্-জর্সান তথা লেয়ন আফ্রীকি, রোশদের দর্শনের শিক্ষা ও প্রচারের সুবিধার জন্য সেই কাজই করেছিলেন, যা রোশদ করেছিলেন অ্যারিস্টটলের জন্য। লেয়ন রোশদের গ্রন্থের আরও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লেখেন। একসময় তাঁর এত খ্যাতি হয়েছিল যে মানুষ রোশদের গ্রন্থকেও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। লেয়ন মনে করতেন প্রকৃতি এক অনুৎপন্ন নিত্য পদার্থ। তিনি পয়গম্বরীকে মনে করতেন মানবিক শক্তিরই একটি ভেদ।

লেয়নের গ্রন্থসমূহের জন্য ইহুদী পণ্ডিতগণের মধ্যে রোশদের প্রচার এতই বেশী হয় যে এ্যারিস্টটলের পুস্তকও কেউ চাইতেন না। এই যুগে মূসা নারবোলী, রোশদের বহু ব্যাখ্যা সংক্ষেপে লেখেন।

(খ) আহরন্ বিন্-ইলিয়াস —এতদিন পর্যন্ত ধর্মান্ধ ইহুদীগণ দর্শনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেই চলছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তভাগেই একজন প্রসিদ্ধ ইহুদী দার্শনিক —আহরন্ বিন্-ইলিয়াস-এর জন্ম হয়। রোশদের দর্শনের দৃঢ় সমর্থনে লিখিত তাঁর গ্রন্থ 'জীবন-বৃক্ষ' তাঁর প্রচার ও খ্যাতি বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ইহুদী পণ্ডিত ইলিয়াস মদীজু ছিলেন, ইতালীর পাদুয়া (Padua) বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ অধ্যাপক। ইনিও রোশদের ওপর কয়েকখানি পুস্তক লেখেন।

ষোড়শ শতকের কাছাকাছি সময়েই রোশদের দর্শনের প্রভাবে বিচার-স্বাতন্ত্র্যের প্রচার এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ইহুদী ধর্মাচার্যগণ, ধর্মহানির আশঙ্কা করতে লাগলেন। তাঁরা দর্শনের বিরোধী মুসলমানগণের সহায়তায় অস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহারে দ্বিধা বোধ করলেন না। দর্শন বিরোধিতার অভিপ্রায়ে আবী মুসা আল্‌-মাসিনো ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গজালীর তোহাফতুল্‌-ফিলাসফার ইহুদী ভাষায় অনুবাদ করেন। প্লেটোর দর্শনকে অপেক্ষাকৃত বেশী ধর্মের অনুকূল দেখে তিনি তার প্রচারও শুরু করেন। এখন আমরা ক্রমশ বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খৃঃ), হব্‌স (১৫৮৮-১৬৭৯ খৃঃ) এবং দে-কার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খৃঃ)-এর যুগের সঙ্গে দর্শনের আধুনিক যুগের দিকে উপনীত হতে যাচ্ছি। এই যুগের অন্তিম ইহুদী দার্শনিক স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭ খৃঃ), যিনি প্রাচীন ইহুদী দর্শন এবং দে-কার্তের সিদ্ধান্তকে যুক্ত করে আধুনিক ইউরোপের দশনের বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন। তখন থেকেই দর্শন, ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। স্পিনোজার ওপর ইজরাইলী (৮৫০-৯৫০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি) সাদিয়া (৮৯২-৯৪২ খৃঃ), বাকিয়া (১০০০-১০৫০ খৃঃ) ইবনে জিরোল (১০২১-১০৭০ খৃঃ), মৈমুন (১১৩৫-১২০৮ খৃঃ), গেরস্নী (১২৮৮-১৩৪৪ খৃঃ) এবং ক্রস্ক! (১৩৪০-১৪১০ খৃঃ)-এর স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

২. খৃষ্টান (লাতিনী)

খৃষ্ট ধর্মযুদ্ধ বিষয়ে আগেই বলেছি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই ধর্মযুদ্ধে স্পেন তো শান্ত থাকেইনি, বরং সমস্ত ইউরোপের খৃষ্টান সামন্তগণকে একত্রিত করে, জেরুজালেমে এবং অন্যান্য ফিলিস্তানী খৃষ্টীয় তীর্থস্থানগুলিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য যুদ্ধে মেতে উঠেছিল। সাধারণ মানুষকেও এতে অংশগ্রহণের জন্য ক্রমাগত প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছিল। সামন্তগণ পরস্পরকে নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখানোর জন্য যুদ্ধে নেতৃত্বদানে আগ্রহী হচ্ছিলেন।

(১) দ্বিতীয় ফ্রেডরিক (১২৪০খৃঃ)—জার্মান রাজা সেলিবির যুদ্ধে অগ্রণী বীর ছিলেন। জেরুজালেম আক্রমণকারী ইউরোপীয় খৃষ্টানগণের সঙ্গেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর ধারণা খুব ভালো ছিল না। তবুও মূর্খ সৈনিক এবং জনতার ওপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের কথা রাখবার জন্য এতে অংশগ্রহণ করেন। এই কাজে তিনি ছিলেন হিটলারের পথ-প্রদর্শক। ফ্রেডরিকের প্রারম্ভিক জীবনের বহুলাংশই সিসিলীতে কাটে। এই স্থান শতাব্দীকাল আরবের অধীন থেকে আরবী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। আরবী পণ্ডিতগণের সঙ্গে ফ্রেডরিকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তিনি ভালো আরবী বলতে পারতেন। আরবী সভ্যতাকে অত্যন্ত ভালোবাসার

ফলে তিনি হারেম এবং খোজা-দরগা (নপুংসকদের বাসস্থান) প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছিলেন। খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"গীর্জার প্রারম্ভিক দরিদ্রাবস্থার জন্যই তখন খৃষ্ট দুনিয়ায় সাধুসন্তর আধিক্য ছিল। কিন্তু এখন ঐশ্বর্য-সঞ্চয়ের নেশা গীর্জা এবং ধর্মগুরুদের অন্তরকে নোংরামিতে ভরিয়ে তুলেছে।"

তিনি খোলাখুলি খৃষ্টধর্মকে উপহাস করার ফলে ক্রুদ্ধ পাদ্রীগণ তাকে শয়তান আখ্যা দিয়েছিলেন। চতুর্থ পোপ ইন্নোসেঁতের প্রেরণায় লীয়ান্স-এ একটি ধর্মপরিষদ আহ্বান করা হয় এবং খৃষ্টীয় সমাজ থেকে ফ্রেডরিককে বিতাড়িত করা হয়।

সেলিবির যুদ্ধ চলাকালে ফ্রেডরিকের দার্শনিক আলোচনার সংবাদও প্রচারিত হচ্ছিল। মুসলমান পণ্ডিতগণ সবসময়েই তাঁর দরবারে থাকতেন। মিশরের সুলতান সালাহুউদ্দীন-এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সৌহার্দ থাকার ফলে সেই যুদ্ধের সময়েও উভয়ের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং উপহার উপঢৌকনের আদান-প্রদান চলত।

যুদ্ধ থেকে ফিরবার পর তিনি সরাসরি দর্শন এবং অন্যান্য বিদ্যার প্রচার শুরু করেন; সিসিলীতে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং রোশদ, টলেমি ও অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের অনুবাদের জন্য ইহুদী পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করেন। পিপল্‌সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন ও সলনোর বিদ্যাপীঠের সংরক্ষক হন। জ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি দূর দেশ থেকেও আরবী পণ্ডিতগণকে আমন্ত্রিত ও একত্রিত করেন, তৈবুন বংশের অনুবাদকগণ এঁর দরবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। ফ্রেডরিক স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শীর্ষস্থানীয় তৎকালীন আরবকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখার ফলে তিনি নিজের প্রজাগণকেও অনুরূপভাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছিলেন। অক্সফোর্ডের একটি গ্রন্থাগারে 'মসায়ল্‌-সক্লিয়া' নামে একটি হস্তলিখিত আরবী পুস্তক আছে। বলা হতো এই পুস্তক ফ্রেডরিক নিজে লিখেছেন, কিন্তু বস্তুত এই পুস্তকটি দক্ষিণ স্পেনের ইবনে-সবইন নামে একজন সূফী দার্শনিকের রচনা। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডরিকের কিছু প্রশ্নের উত্তরে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন— যে প্রশ্ন তিনি ইসলামী দুনিয়ার বাইরেও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট রেখেছিলেন। ঐ সময় দক্ষিণ স্পেনে সুলতান রশীদীর আদেশ বলবৎ থাকার ফলে তৎকালীন বিচার-স্বাতন্ত্র্যের অবস্থা কেমন ছিল তা সবইনের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়—

"আমার দেশে এই বিষয়ের ওপর লেখনীধারণ খুবই বিপজ্জনক। এই বিষয়ে আমার কলম ধরার সংবাদ যদি প্রকাশিত হয় তবে তিনি আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হবেন এবং আমার জীবন বিপন্ন হবে।"

চল্লিশ বৎসর ধরে চার্চের বিরোধিতা সত্ত্বেও ফ্রেডরিক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের জন্য ক্রমাগত চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি। তাঁর মৃত্যু হলে পোপ ইন্নোসেঁত সিসিলীর পাদ্রীগণের সামনে আনন্দের সঙ্গে বলেন—

"স্বর্গ ও মর্তের পক্ষে এ এক আনন্দের সময়, কেন না, যে সঙ্কটের আবর্তে মানব জগৎ পড়েছিল, তা থেকে খৃষ্ট-জগৎ শেষবারের মতো মুক্তিলাভ করল।"

কিন্তু ফ্রেডরিকের পর ইউরোপের যে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল তাতে পোপের এই মন্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল।

(২) অনুবাদক —বিন্‌-মীর 'খণ্ডন-খণ্ডন'-এর লাতিনী অনুবাদ করেছিলেন ঠিকই, তবে তার আগে থেকেই আরবী গ্রন্থের লাতিনী অনুবাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফ্রেডরিকের দরবারের কালস্কাট ছিলেন স্পেনের টলেডোর অধিবাসী। তিনি একজন ইহুদী পণ্ডিতের উৎসাহক্রমে, কিছু গ্রন্থ লাতিনী ভাষায় অনুবাদ করেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো—

সমাঅ-ব-আলম্‌-শরহ (টীকা)	রোশদ	১২৩০ খৃঃ
মুকালা ফিল্‌-রুহ (টীকা)	"	" "
মুকালা কোন-ব-ফসাদ	"	" "
জৌহরুল-কৌন	"	" "

রজার বেকনের (১২১৪-১২৯২ খৃঃ) মতে, স্কাট আরবী ভাষা খুব কমই জানতেন এবং অন্যের সহায়তায় অনুবাদ করতেন। যাই হোক না কেন, স্কাটই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি খৃষ্ট দুনিয়ার সামনে রোশদের দর্শনের অনুবাদ করেন—তৎকালীন চার্চের-লাতিনী-ভাষায়। রোশদের দর্শনকে নিজের দেশে সফল করার জন্য তিনি কি করেছিলেন, সে বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করব।

ফ্রেডরিকের দরবারের আর একজন পণ্ডিত হরমন, নিম্নলিখিত দর্শনগ্রন্থসমূহের অনুবাদ করেন।

ভাষণ-টীকা (Rhetoric)	ফারাবী	১২৫৬ খৃঃ	টলেডো
অলঙ্কার-সংক্ষেপ "	রোশদ	" "	"
নীতি-সংক্ষেপ (Ethics)	রোশদ	১২৪০ খৃঃ	"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই রোশদের সমস্ত দর্শন গ্রন্থেরই লাতিনী অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়।

নবম অধ্যায়

ইউরোপে দর্শন-সংঘর্ষ

সেণ্ট অগাস্টিনের দর্শন-প্রেম সম্বন্ধে আমি আগেই আলোচনা করেছি, কিন্তু তা শুধু তাঁর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর পরে যদিও খৃষ্টধর্ম ইউরোপে অত্যন্ত সফল হয়েছিল, কিন্তু খৃষ্টান সাধুগণ মানুষকে তাঁদের উপদেশে বিশ্বাস করতে এবং মঠে দান ধ্যান করতে উপদেশ দিতেন, আর নিজেরা ছোট-বড় মোহন্ত সেজে স্ফূর্তি করতেন। কেউ আবার সবকিছু ত্যাগ করে, একান্তবাসী হয়ে ধ্যান ভক্তিতে আত্মনিয়োগ করতেন। শিক্ষার প্রদীপ একদিক থেকে নির্বাপিতই হয়েছিল বলা চলে।

§ ১. স্কলাস্টিক

অষ্টম শতাব্দীতে চার্লস শার্লেমান রাজা হয়ে উপরোক্ত অবস্থা লক্ষ্য করেন। সেই সঙ্গে তিনি এও লক্ষ্য করেন যে বহির্জগৎ সম্বন্ধে দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যেও গোপনে গোপনে ধর্মকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার প্রবৃত্তি বর্ধিত হচ্ছে। শার্লেমান এর প্রতিবিধানের জন্য মূর্খ, উদ্ধত সাধুতে পরিপূর্ণ মঠে, শিক্ষিত সাধুগণকে তাদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত করেন এবং নতুন নতুন মঠ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। এই সমস্ত পাঠশালায় ধর্ম-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং তর্ক এই সাতটি বিষয়েও শিক্ষাদান করা হতো। বুদ্ধি-বাদের যে প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল তাকে খর্ব করে ধর্মের অনুসরণ করার জন্যই সেখানে তর্কশাস্ত্র পড়ানো হতো। শার্লেমানের এই প্রযত্নের সময়েই ভারতের নালন্দার খ্যাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং সেখানেও শার্লেমানের ন্যায় সামন্তবর্গ এবং রাজন্যবর্গ আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রাম এবং ধন-দৌলত দান করেছিলেন। নালন্দা ব্যতীত আরও অনেক বিদ্যাপীঠ এবং 'গুরুকুল'-এ বিদ্যা, বিশেষত দর্শনের চর্চা হতো। শার্লেমান-স্থাপিত বিদ্যাপীঠেও গ্রন্থের বিষয়সমূহ কণ্ঠস্থ করা এবং শাস্ত্রার্থ বিচার করা ছিল অধ্যয়নের মুখ্য অঙ্গ। এটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যে ভারতের উন্নত এই শিক্ষাব্যবস্থাও, কেন নিষ্ফল হয়ে কাল-কবলিত হয়েছিল। বস্তুত ভারতে ঐ সময়ে বা তার পরে শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলার কোনো প্রচেষ্টা হয়নি ; তা শাসক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ।

শার্লেমানের মৃত্যুর পরে যদিও তাঁর স্থাপিত মঠ ও বিদ্যাকেন্দ্রে শৈথিল্য দেখা গিয়েছিল, তবুও খৃষ্টধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় ইউরোপে —স্পেনে —ইসলাম কালসাপের মতো লুকিয়ে ছিল এবং শুধু অস্ত্র বা বলপ্রয়োগেই প্রভুত্ব বিস্তার করেনি, সেই সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচ্য দেশের পুরনো জ্ঞানভাণ্ডার ইউরোপের জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করতেও শুরু করেছিল। এই অবস্থায় খৃষ্টধর্ম ভালোভাবেই বুঝেছিল যে আত্মরক্ষার জন্য তাদেরও একমাত্র বিদ্যাকেই হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শার্লেমানের এই বিদ্যাপীঠকে School এবং তার শিক্ষকগণকে বলা হতো Doctors Scholastic বা স্কলাস্টিক আচার্য। পরে ধর্মরক্ষার সমর্থকের পটভূমিতে যে মিশ্র দর্শন তাঁরা বিকাশিত করেছিলেন তার নামও হয় স্কলাস্টিক দর্শন। এই দর্শন যে খৃষ্টান ধর্মাচার্যগণের প্রযত্নকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল তার প্রমাণ এই যে, যুক্তিবাদ ও দর্শনের ছায়ায় পুষ্ট রুচিকে অবদমিত করার জন্য তাঁরা পাশবিক হিংস্রতায় সরব হয়ে উঠেছিলেন। এই নব্য প্রযত্ন এত আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছিল যে, একই সময়ে, দ্বাদশ শতকের শেষে ভারতে নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা এবং ইউরোপে অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, প্যারিস, সোরবোন, বোলোনা, সার্লেনো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করছিল।

স্কলাস্টিক পণ্ডিতগণের মধ্যে জন স্কটস এরিগেনা (৮১০-৮৭৭ খৃঃ), সেণ্ট আনসেলম (১০৬৩-১১০৯ খৃঃ), রোসেলিনাস (১০৫১-১১২১ খৃঃ), আবেলার্দ (১০৭৯-১১৪২ খৃঃ) সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন।

১ —জন স্কটস এরিগেনা

এরিগেনা ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, এবং স্কলাস্টিক প্রযত্নের প্রথম পাদের পণ্ডিতের একজন ছিলেন। অ্যারিস্টটলের দর্শন তাঁর খুব পছন্দ ছিল। ঐ সময়ে গ্রীক দর্শন-গ্রন্থসমূহ, কেবলমাত্র এশীয় ভাষাতেই পাওয়া যেত এবং এরিগেনা ছিলেন আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সম্ভবত স্থরীয়ানী ভাষা পাঠের অথবা স্থরীয়ানী খৃষ্টান পণ্ডিতগণের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা করার স্থযোগ ঘটেছিল।

এরিগেনার মুখ্য সিদ্ধান্ত ছিল অদ্বৈত ভাব (=বিজ্ঞান)-বাদ এবং বিশ্বের অনাদিত্ব। বলা বাহুল্য যে উভয় সিদ্ধান্তই ছিল খৃষ্টধর্মের বিরোধী। এরিগেনা তাঁর 'জগতের বাস্তবিকতা' গ্রন্থে স্বীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লিখেছেন—

"বিশ্বের অস্তিত্ব প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই, সকল বস্তু পূর্ণ-বিজ্ঞানের ভেতর সংরক্ষিত ছিল। সেখান থেকে বহির্গত হয়ে তারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে ; কিন্তু এই রূপ যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন তারাও সেই পূর্ণ-বিজ্ঞানে পুনরায় মিলিত হবে।"

সন্দেহ নেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত বসুবন্ধুর (৪০০ খৃঃ) 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি'র (ত্রিংশতিকা) এই কারিকার অনুরূপ : "(আলয়-বিজ্ঞান রূপী সমুদ্রের) তরঙ্গ-মালার

ন্যায় তার (জগতের বস্তুসমূহের) উৎপত্তি তথায়ই বিলীন হয়।" এরিগেনার পূর্ণ-বিজ্ঞান যোগাচারের (বিজ্ঞানবাদ) আলয়-বিজ্ঞান ; যাতে ক্ষণিকতার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুযায়ী সৃষ্টি ও বিনাশ—সমুদ্র তরঙ্গের উত্থান পতনেরই সমতুল্য। এরিগেনার আগে এই সিদ্ধান্ত ইউরোপে অজ্ঞাত ছিল। পরে রোশদকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখেছি। ধর্মান্ধ যুগের অন্যান্য দার্শনিকগণের ন্যায় এরিগেনাও ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন।

২—আমীরী এবং দাবিদ

এরিগেনার বিচার পশ্চিম ইউরোপের বৌদ্ধিক জগৎকে প্রভাবিত করলেও তার প্রতিক্রিয়া খুব শীঘ্র হয়নি। দশম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন আমীরী এবং তাঁর শিষ্য দাবিদ-দে-দেনিতী। আমীরীর সঙ্গে জিব্রোলের (১০২১-১০৭০ খৃঃ) সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য দেখা যায়। যদিও জিব্রোল তখনও জন্মাননি। প্রকৃতি থেকেই জগতের উদ্ভব বলে দাবিদ মনে করেছেন। এরিগেনার পূর্ণ-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যানুযায়ী প্রকৃতি হলো আকৃতিহীন, অরূপ, যদিও মূল প্রকৃতির রূপে তা বাহ্যার্থবাদ—বাস্তবিক দুনিয়ার খুব নিকটস্থ হয়।

৩—রোসেলিনাস (১০৫১-১১২১ খৃঃ)

আমীরী ও দাবিদের দর্শন বাহ্যার্থবাদ অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের বাস্তবিকতার দিকেই অগ্রসর হয়েছিল। স্কলাস্টিক ডক্টর রোসেলিনাস তার বিপক্ষে নামবাদ বা অপরূপবাদ (Nominalism)-এর ওপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে সামান্য-রূপ আছে তা ব্যক্তি-বিচ্ছিন্ন নয়।

§ ২. ইসলামিক দর্শন এবং খৃষ্টান-গীর্জা

রোশদের দর্শনের পঠন-পাঠন এবং তার অনুবাদকগণের প্রগতিশীলতা সম্পর্কে আমি আগেই আলোচনা করেছি। এরিগেনা, আমীরী প্রভৃতির প্রচেষ্টা যে অত্যন্ত সজাগ খৃষ্টধর্মের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করবেই, তাতে সন্দেহ ছিল না।

১—ফ্রান্সিস্‌কান সম্প্রদায়

রোশদের দর্শনের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের ওপর। এই সম্প্রদায়ের সংস্থাপক (প্রথমে কাফের, পরে সেন্ট) ফ্রান্সিস (১১৮২-১২২৬ খৃঃ)

ত্রয়োদশ শতকের বিলাসিতায় নিমজ্জমান পোপ ও তাঁদের সমর্থকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠেন। ফ্রান্সিসের জন্ম হয় ইতালীতে। পাণ্ডিত্যের সহজাত তীক্ষ্ণ প্রতিভার সঙ্গে, দরিদ্রের দুঃখে সমব্যথী হওয়ার মতো সহানুভূতিশীল হৃদয়েরও তিনি অধিকারী ছিলেন। "মার্জিত আচরণ এবং উন্নত বিচার" ছিল তাঁর আদর্শ। গীর্জার পোপ এবং মোহন্তগণের উন্নাসিকতা ও দুরাচার দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে খৃষ্টধর্ম ক্রমশ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাই তিনি দারিদ্র্যে জীবনযাপনকারী শিক্ষিত সাধুগণকে একত্রিত করার জন্য একটি সংঘ স্থাপন করেন। এই সংঘই তাঁর নামানুসারে ফ্রান্সিস্‌কান সম্প্রদায় নামে খ্যাতি অর্জন করে। তাঁর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিকে, দরিদ্রদের দুর্দশা মোচনে ব্রতী হতে দেখে, মানুষের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল, বিশেষত সেই বিচার-সংঘর্ষের যুগে। এরই ফলস্বরূপ অল্পকালের মধ্যেই তাঁর অনুগামীর সংখ্যা পাঁচ হাজারে পৌঁছায়।

(১) আলেকজাণ্ডার হেস—ইনি ছিলেন (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ফ্রান্সিস্‌কান সম্প্রদায়ের একজন সাধু। ইনি প্যারিসে শিক্ষালাভ করেন। এ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যায় ওপরে তিনি এক নিবন্ধ লেখেন, এতে তিনি সীনা এবং গজ্জালীর মতকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু রোশদের কোনো উল্লেখ না করায় মনে হয় তিনি রোশদের বিচারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না।

(২) রজার বেকন (১২১৪-১২৯৪ খৃঃ)—**(ক) জীবনী**—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ফ্রান্সিস্‌কান সম্প্রদায়ের কেন্দ্র, সেখানে রোশদের দর্শনকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হতো। রজার বেকন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের (১২০০ খৃঃ) কয়েক বছর পরেই ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করে, প্যারিসে গিয়ে তিনি ডক্টর উপাধি অর্জন করেন। লাতিন ভাষার সঙ্গে গ্রীক ও আরবী ভাষাও তাঁর জানা ছিল। বিশেষত আরবী ভাষা ছিল, সেই যুগের বিদ্যার্জনের জন্য একান্ত আবশ্যক ভাষা। প্যারিস থেকে ফিরে এসে, তিনি ফ্রান্সিস্‌কান সম্প্রদায়ের সদস্য হন।

যদিও মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে তাঁর বিচার মুক্ত ছিল না, তবুও প্রয়োগ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপরে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; তাঁর মতে শুধুমাত্র গ্রন্থ ও শব্দ প্রমাণের ওপর নির্ভরশীলতা প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। তিনি যন্ত্র-বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে আগ্রহী হওয়ায় স্বার্থান্ধ পাদরীগণ তাঁকে মায়াবী, ডাইন, যাদুকর বলে প্রচার করে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। ডাইন-ডাইনীর অপবাদ নিয়ে তৎকালীন ইউরোপে লক্ষাধিক নারী-পুরুষকে জীবন্ত দগ্ধ হতে হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত, বেকন এইরূপ অপঘাত মৃত্যু থেকে রক্ষা পান। কিন্তু তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত পাদরীর অভাব ছিল না। তাঁর বিচার স্বাতন্ত্র্যের সংবাদ রোমের পোপের নিকট পৌঁছালেও, তিনি কিছু করতে পারছিলেন না। কিন্তু

১২৭৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্‌কান সম্প্রদায়েরই একজন সাধু জেরোম-ডি-এসেল রজারের শত্রুতে পরিণত হওয়ার ফলে, পোপের হাতে সুযোগ এসে যায়। এবার রজার নাস্তিকতা এবং যাদুকরীর অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বন্ধুগণের চেষ্টায় তিনি মুক্তি পান এবং ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে তাঁর মৃত্যু হয়। পাদরীগণ তাঁর রচনাসমূহ অগ্নিদগ্ধ করেন, ফলে তাঁর বিচার অজ্ঞাতপ্রায় থাকায় মানুষ খুব বেশী লাভবান হতে পারেননি।

(খ) দার্শনিক বিচার—সীনা ও রোশদের দার্শনিক বিচার দ্বারা বেকন প্রচুর প্রভাবিত হয়েছিলেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

"ইবনে সীনাই হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি অ্যারিস্টটলের দর্শনকে বিশ্বের দরবারে প্রকাশ করেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী দার্শনিক হলেন, ইবনে রোশদ, যিনি সীনার সঙ্গেও মতভেদ ব্যক্ত করেছিলেন। রোশদের দর্শন একসময় উপেক্ষিতই ছিল; কিন্তু এখন (ত্রয়োদশ শতাব্দী) বিশ্বের প্রায় সকল দার্শনিকই তাঁর দর্শনের স্থায়িত্ব এবং দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন। কারণ, অ্যারিস্টটলের সঠিক ব্যাখ্যাকারী হলেন রোশদই। কোথাও কোথাও অ্যারিস্টটলের প্রতি কটাক্ষ করলেও, সিদ্ধান্তের দিক থেকে তাঁর বিচারের সত্যতা রোশদ স্বীকার করেছেন।"

অন্যান্য ফ্রান্সিস্‌কানগণের মতো রজারও ছিলেন রোশদের সমর্থক; কর্তা-বিজ্ঞান (Creative reason)-কে তিনি আত্মা থেকে স্বতন্ত্র এক সত্তা বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন, যে কর্তা-বিজ্ঞানই ঈশ্বর।

"কর্তা-বিজ্ঞান একাধারে ঈশ্বর ও দেবাত্মা। (ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের মতে) কর্তা-বিজ্ঞান হলো নাতিক-বিজ্ঞানেরই (Noutic nouse = আত্মা) একটি অবস্থার নাম, কিন্তু এই ধারণা ভুল। দৈবী সাধনার সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে নাতিক বিজ্ঞানে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। কিন্তু এই সহায়তা কিরকমভাবে হয়? কর্তা-বিজ্ঞানের দ্বারা, যা মানুষ তথা ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপক, এবং মানুষ থেকে ভিন্ন স্বতঃসত্তাবান এক অ-প্রাকৃত দ্রব্য।"

(ঙ) ডন স্কটস—আরবী দর্শনের আর একজন সমর্থক হলেন ডন স্কটস। প্রথমে তিনি অ্যাকুইনাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু পরে সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের এই মতের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে যে, ঈশ্বরের মানুষের কর্মের ওপর কোনো অধিকার নেই। এই বিবাদের প্রতিধ্বনিই সমস্ত স্কলাস্টিক দর্শনের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়। টমাসের বিরুদ্ধে স্কটস-এর মত হলো, মূলভূত বা প্রকৃতি হলো অনাদি, আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির যে উদ্ভব হবেই এমন কোনো কথা নেই, কারণ প্রকৃতি, আকৃতিহীনও হতে পারে। প্রকৃতিকে, আকৃতির পোশাক পরানোই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। স্কটস, রোশদের অদ্বৈত-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে, এই সিদ্ধান্তের সূচনাকে মনুষ্যত্বের সীমার মধ্যে রাখতে চাননি। রোশদের অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তের জন্য

স্কটসই প্রথম তাঁকে নাস্তিক বলে ঘোষণা করেন, যাকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে ইউরোপে রোশদের আড়ালে, নাস্তিকগণের আশ্রয় স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল।

২—ডোমিনিকান সম্প্রদায়

ফ্রান্সিস্‌কান সম্প্রদায় যেমন রোশদ ও ইসলামিক দর্শনের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন, তেমন তার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন ডোমিনিকান সম্প্রদায়। এর সংস্থাপক সেণ্ট ডোমিনিক স্পেনের কাস্টিল নগরে ১১৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সম্ভবত তিনি ভারতের অন্তিম বৌদ্ধ সংঘরাজ তথা বিক্রমশীলার প্রধান আচার্য সাক্য শ্রীভদ্রের সমকালীন ছিলেন (১১৭২-১২২৫ খৃঃ)।

(১) অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস (১১৯৩-১২৮০ খৃঃ)—অ্যালবার্টাস সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন দিল্লীতে তুর্কীদের বিজয়-কেতন উড়ছিল। যে বৎসর সেণ্ট ডোমিনিকের মৃত্যু হয় সেই বছরই তিনি ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের সদস্য হন। পরে তিনি ফ্রান্সের বোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। আরবী দার্শনিকগণের মত খণ্ডন করার জন্য কয়েকখানি পুস্তক তিনি রচনা করেন; তবে তিনি ছিলেন ইবনে সীনার প্রশংসক এবং রোশদের নিন্দাকারী। রোশদের বিরোধী তথা অ্যারিস্টটলের দৃঢ় সমর্থক টমাস অ্যাকুইনাস (Aquinas) ছিলেন এঁরই শিষ্য। আলবার্টাস নিজেও বেকন এবং স্কটস-এর রোশদ-সমর্থনী বিচারকে খণ্ডন করেছেন। তিনি ছিলেন খুবই নির্জনতাপ্রিয়। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন তাঁর শিষ্য অ্যাকুইনাস।

(২) টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৫-১২৭৪ খৃঃ) **(ক) জীবনী**—১২২৫ খৃষ্টাব্দে অ্যাকুইনাস ইতালীর এক প্রাচীন সামন্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই শাক্য শ্রীভদ্র তাঁর জন্মভূমি কাশ্মীরে দেহত্যাগ করেন। কাসিনো এবং নেপল্‌স-এ তাঁর শিক্ষা শুরু হলেও, শেষে তিনি অ্যালবার্টাস ম্যাগনাসের জ্ঞানের প্রসিদ্ধি শুনে বোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম, দর্শন এবং তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। ১২৭২ খৃষ্টাব্দে দশম পোপ গ্রেগরী রোমান (ক্যাথলিক, উদারপন্থী) এবং গ্রীক (প্রাচীন অর্থডক্স) ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য যখন একটি পরিষদ আহ্বান করেন, তখন অ্যাকুইনাস একটি পুস্তক রচনা করে পরিষদের সম্মুখে পেশ করেন। এতে গ্রীক চার্চের ত্রুটি দেখানো হয়েছিল। ফলে সমন্বয় সাধনে বাধা পড়লেও অ্যাকুইনাসের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

(খ) দার্শনিক বিচার—অ্যাকুইনাস ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে তিনি যে কতটা গোঁড়া ছিলেন তা বোঝা যায়, যখন পোপ গ্রেগরী, গজালীর ন্যায় উদারতার পরিচয় দিয়ে, সমস্ত খৃষ্ট সম্প্রদায়কে

সম্মিলিত করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন, তখন সর্বাপেক্ষা উল্লসিত হয়েছিলেন অ্যাকুইনাস। রোশদের প্রগতিশীলতার জন্য নয়, পরন্তু বস্তুবাদ অপেক্ষা অদ্বৈত-বিজ্ঞান (ভাব)-বাদের প্রতি বেশী সমর্থন থাকায় ফ্রান্সিস্‌কান সম্প্রদায় তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু অ্যাকুইনাস, তাঁর গুরু অ্যালবার্টাসের মতো বস্তুবাদের প্রতি আকৃষ্ট ও মনোযোগী ছিলেন। মধ্যযুগের সুষুপ্ত ইউরোপকে পুনর্জাগরিত করার কাজে চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। চেঙ্গিসের তরবারির সঙ্গে বারুদ, কাগজ, দিক্‌-নির্ণয় যন্ত্র প্রভৃতির প্রবর্তন ও ব্যবহার এই প্রত্যক্ষ জগতের মূল্য বর্ধিত করে, তাই এদিকে অ্যাকুইনাসের দৃষ্টি-আকর্ষিত হওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না।

জন লিউইস তাঁর *Introduction to Philosophy* গ্রন্থে অ্যাকুইনাস সম্বন্ধে লিখেছেন —"তিনি বিক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তসমূহকে একত্রিত করে এক সংগঠিত পূর্ণকায় রূপ দান করেছিলেন এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত ও অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সঙ্গে মিলিত করেছেন। এইভাবে তিনি যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক রচনা উপহার দিয়েছেন তা চারশত বৎসর ধরে ইউরোপীয় সভ্যতার অবলম্বন হয়েছে, এবং তিনশত বৎসর ধরে ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল তথা লাতিন আমেরিকায় এক প্রবল —যদিও পতনোন্মুখ —শক্তি হিসেবে বর্তমান ছিল।

"অ্যাকুইনাস-কৃত খৃষ্ট দর্শনের নব্য সংস্করণ অধিক সজীব, অধিক আশাবাদী, অধিক পার্থিব এবং অধিক রচনাত্মক ছিল। …এ যেন অ্যারিস্টটলেরই পুনরুজ্জীবন।"

অ্যাকুইনাস এবং ম্যাগনাসের নব্য চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করা কম কঠিন কাজ ছিল না। প্রাচীনপন্থী খৃষ্টান বিদ্বানগণ, অ্যারিস্টটলের বস্তুবাদী দর্শনের এই রকম পুনঃপ্রবর্তন, ধর্মের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি নব্য চিন্তাধারার অনুকূল থাকায় অ্যাকুইনাসেরই জয় হয়। তাঁর প্রধান গ্রন্থ *Summa Theologica* (=ব্রহ্মবিদ্যা সংক্ষেপ)-কে একটি বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। তাঁর দর্শন আজও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বমান্য দর্শন।

(১) **মন** —অ্যাকুইনাস বলেছেন যে সমস্ত জ্ঞানের মূলই অনুভূতি —"সমস্ত বস্তুই যা বুদ্ধিগ্রাহ্য তা ইন্দ্রিয়গত বটে।" মন ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ প্রদীপে আলোকিত। কোনো বস্তুই স্বয়ং খারাপ নয়, বস্তুর আধারানুযায়ীই ভালোমন্দ হয়। এইভাবে তিনি ইন্দ্রিয় সংবেদন, এবং মানুষের সাধারণ অনুভূতিকে তুচ্ছ না করে তাদের মহৎ বলেই মনে করেছেন।

(২) **শরীর** —সমগ্র মনুষ্যত্বকে বিচার করেই আমরা মানুষকে জানতে পারি। শরীর ব্যতীত যেমন মানুষ অস্তিত্বহীন, মন ব্যতীতও তদ্রূপ। দেহ ও মনের সংযোগেই মানুষের পরিপূর্ণতা। বাস্তব উপাদান অমূর্ত, অপরিণত, এর থেকেই

সমস্ত বস্তু সৃষ্টি হয়। এই উপাদান বিভিন্ন বাস্তব রূপে সংগঠিত করা সম্ভব, চিন্তাশীল মানুষও এই বাস্তবিকতারই একটি রূপ। বাস্তব উপাদানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা নতুন পরিবর্তন, নতুন সংগঠন এবং নতুন গুণসমূহকে অস্তিত্বে আনতে পারে। অ্যাকুইনাস এখানে অজ্ঞাতসারেই মার্কসীয় বস্তুবাদের দিকে এগিয়ে গেছেন। গুণাত্মক পরিবর্তন যদি সম্ভব হয় তবে বাস্তব উপাদান, চেতনার জন্মও দিতে পারে।

মানুষের নিজের সম্পর্কে বা নিজের চেতনা সম্বন্ধে জ্ঞান হয় পরে। চৈতন্য কি তাও পরে জানতে পারে। সর্বপ্রথম মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তু দেখে এবং জানে যে, 'আমি দেখছি,' যার অর্থ হলো সে কোনো জিনিস দেখছে। এখানে দেখছি মানে, আছে এবং মন কেবলমাত্র বাইরের বস্তু সম্বন্ধে যে সংস্কার আছে তা-নয়, ঐ বস্তুর সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে জানে। নিজের বা নিজের চেতনা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান, উপরোক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর পরে জন্মায়। এজন্য বাইরের বস্তুকে অস্বীকার করলে জ্ঞানের ভিত্তিকে অস্বীকার করা হয়।

(৩) দ্বৈতবাদ—অ্যাকুইনাস জগৎকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগৎ; এবং (২) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগতের মূল রূপ বা বিজ্ঞান (=ভাব) জগৎ। অ্যারিস্টটলের দর্শনানুযায়ী শুদ্ধতম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান হলেন ঈশ্বর। এ ছাড়া কয়েকটি বিশেষ বিজ্ঞানকে আমরা আত্মা বলতে পারি, যারা দেবাত্মা, মানবাত্মা প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ পর্যায়ে বিভক্ত থাকে। এ ছাড়া এক পরমাত্মাও আছে, যার দ্বারা নক্ষত্রলোক পরিচালিত হয়।

অ্যাকুইনাস ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর সর্ববৃহৎ প্রচেষ্টা। তিনি বলেছেন যে, দর্শন ও ধর্ম, উভয়েরই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র আছে; কাজেই তাদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। সেণ্ট অগাস্টিন জ্ঞানের প্রকাশকে ভগবানের দান মনে করেছেন; কিন্তু অ্যাকুইনাস ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

অ্যাকুইনাস নব্য অ্যারিস্টটল-দর্শনের সমর্থক ডোমিনিকান সাধু-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। ফ্রান্সিস্‌কানগণের এতে আপত্তি ছিল। এই সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ডন স্কটস (১২৬৫-১৩০৮) এবং ইয়কহামের উইলিয়ম (১৩২৪-১৪০৪ খৃঃ) দর্শন ও ধর্মের সমন্বয় সাধন অসম্ভব মনে করতেন। দর্শন এবং পদার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে তত্ত্ব সত্য তা ধর্মক্ষেত্রে ভুল বলে প্রমাণিত হতে পারে। সত্যের সাক্ষাৎকার শুধু ইন্দ্রিয় এবং অনুভূতি দ্বারাই সম্ভব নয়, সেই সঙ্গে আত্মার সহায়তাও প্রয়োজন। যা শুভ তা সত্যেরও উর্ধ্বে, এবং ঈশ্বর যা শুভ বলে নির্দেশ করেছেন তা-ই হলো শুভ। মানুষের কর্তব্য হলো সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা। যে কর্ম খারাপ বলে মনে হয় তা-ও কল্যাণকর, যদি তা ঈশ্বরের তুষ্টির জন্য করা হয়। চার্চ ও ধর্মসম্প্রদায়ের মাধ্যমেই আমরা তাঁর আদেশ জানতে পারি, তাই

ধর্মের সমর্থকগণ বলেছেন যে ভগবান যীশুর এই বিশ্বে যে অধিকার ছিল, আজকের চার্চ ও পোপদেরও সেই অধিকার আছে।

(৩) রেমণ্ড মার্টিনী—অ্যাকুইনাসের পর রেমণ্ড মার্টিনী, ডোমিনিকানদের সংস্পর্শে থেকে বিজ্ঞবাদ এবং রোশদের বিরুদ্ধতা আরম্ভ করেন। এই কাজে তিনি গজালীর পুস্তকের সাহায্য নেন; যদিও গজালী ছিলেন স্বয়ং সুফীবাদী অদ্বৈতবাদী, কিন্তু তাঁর পাঁচমিশালী চাটনিতে কি ছিল না? মার্টিনী ভালো-ভাবেই অবহিত ছিলেন যে রোশদ তাঁর অদ্বৈত-বিজ্ঞান (=ভাব)-বাদকে অ্যারিস্টটল নয় প্লেটোর থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

(৪) রেমণ্ড লিলি (১২২৪-১৩১৫ খৃঃ)—দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের ইসলামী ধর্মযুদ্ধের জবাবে যখন ভয়াবহ খৃষ্ট ধর্মযুদ্ধ চলছিল, সেই অগ্নিগর্ভ সময়েই ইতালীর এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে রেমণ্ড লিলির জন্ম হয়। তাঁর প্রথম জীবন ছিল বিলাস বৈভবে পূর্ণ, কিন্তু পরে তিনি ঐ জীবনকে সংশোধন করেন এবং ইসলামী দুনিয়াকে নাস্তানাবুদ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি ইউরোপের সমস্ত খৃষ্টানকে লড়াইয়ে একত্রিত দেখতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে পোপ হেনরিয়াসের দরবারে গিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করেন—ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে, ইসলামী দেশে কাজ করার যোগ্য বিদ্বান ব্যক্তি সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রোশদের পুস্তকসমূহকে ধর্মবিরোধী বলে ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু এখানে তাঁর আবেদন ব্যর্থ হওয়ায়, তিনি ফ্রান্স, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও দৌড়াদৌড়ি করেন। ১৩১১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত খৃষ্টান সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত হন। কিন্তু সর্বত্রই তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অতঃপর হতাশাগ্রস্ত লিলি ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পণ্ডিত রেমণ্ড লিলি রোশদ এবং অন্যান্য দার্শনিকগণের রচনা পাঠ করেন, নিজেও কিছু গ্রন্থ লেখেন, তাই তাঁর ইসলাম-বিরোধী মত ধরণীর বুকে লুক্কায়িত থেকে ভবিষ্যতে মহীরুহে পরিণত হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে।

§ ৩. ইসলামী দর্শন এবং বিশ্ববিদ্যালয়

১—প্যারিস এবং সোরবোন

ফ্রান্সিস্‌কান সম্প্রদায়ের কর্মক্ষেত্র, তাদের কেন্দ্র অক্সফোর্ড থেকে ইংলণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিম ইউরোপে ইসলাম ধর্মের প্রচারকেন্দ্র ছিল প্যারিস। এখানে প্রবাসী স্পেনীয় ইহুদীগণের একটি সুবৃহৎ অংশ বাস করায় সুবিধাও ছিল। এঁরা রোশদ এবং অন্যান্য দার্শনিকের গ্রন্থের আরবী অনুবাদে সক্রিয় ছিলেন।

রোশদ-দর্শনের সমর্থক বা বিরোধী সকলেরই চর্চাকেন্দ্র ছিল প্যারিস। সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধীগণের এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় সমর্থকগণের দুর্গ ছিল। প্যারিসের কলা বিভাগের অধ্যক্ষ সীজার ব্র্যাবন্ট (মৃত্যু ১২৮৪ খৃঃ) ছিলেন রোশদের দৃঢ় সমর্থক। এই প্রকার সিদ্ধান্ত পোষণের জন্য ধর্মবিরোধী হওয়ার অভিযোগে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং ওরবিতোর (Orbicto) জেলের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। এখনও প্যারিসে তাঁর দান করা আরবী দর্শন গ্রন্থ যথেষ্টা সংখ্যায় আছে।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সোরবোন ছিল ধর্মবাদীগণের কেন্দ্র —হয়ত তাই আজও প্যারিস নগরের অভ্যন্তরস্থ এই অংশকে লাতিনী এলাকা বলা হয়। সোরবোনের ওপর ছিল পোপের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি এবং সমর্থকদের দুর্গ হওয়ায় প্যারিসের ওপর ছিল অসন্তোষ। সোরবোন-এর চেষ্টায় পোপ প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ওপর (১২১৮ খৃঃ) এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেন যে, তারা এমন কোনে শাস্ত্রীয় বিতর্ক করবে না যাতে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে। বস্তুত এই ফর্মান আরবী দর্শন সম্বন্ধীয় বাদ-বিবাদকে রুদ্ধ করার একটা ছল মাত্র। পরবর্তীকালেও পোপগণ একইভাবে, আরবী দর্শন অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে ধর্মবিরুদ্ধ বলে প্রচার করেছিলেন। ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের চেষ্টায় একটি ধর্মপরিষদ আহ্বান করা হয় এবং সেখানে নিম্নোল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি যাঁরা মেনেছেন তাঁদেরই নামে নাস্তিকতার অভিযোগ করা হয়েছে—

(১) সমস্ত ব্যক্তির মধ্যেই একই ব্রহ্ম বর্তমান; (২) জগৎ অনাদি; (৩) কোনো আদি পিতা আদমই মানুষের প্রথম পূর্বপুরুষ নয়; (৪) আত্মা শরীরের সঙ্গেই বিনষ্ট হয়; (৫) ব্যক্তির যে জ্ঞান তা ঈশ্বরের মধ্যে নেই; (৬) মানুষের কর্মে ঈশ্বরের কোনো হাত নেই; (৭) নশ্বর বস্তুকে নিত্য বস্তুতে পরিণত করতে ঈশ্বর অক্ষম। এই সমস্ত ঘটনার পরেও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক দর্শনের পঠন-পাঠন বন্ধ হয়নি।

২—পাদুআ বিশ্ববিদ্যালয়

ইউরোপে সিসিলী দ্বীপ এবং স্পেন ছিল ইসলামের শাসনকেন্দ্র। অতএব এই রাস্তা দিয়েই ইসলামী বিচার সহজে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। সিসিলী ইতালীর দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ায়, ইসলামী দর্শন সিসিলী থেকে ইতালীতে পৌঁছে, স্পেন হয়ে ফ্রান্সে উপনীত হয়। ইতালীতেই পাদুআ বিদ্যাপীঠ, ইসলামিক দর্শনের অধ্যয়ন দ্বারা আপন কৃতিত্ব সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়। বিশেষত রোশদের দর্শন অধ্যয়নের জন্যই এই বিদ্যালয় খ্যাতি অর্জন করে। এখানে রোশদের ওপর কতকগুলি আলোচনা গ্রন্থ এবং ভাষ্য রচিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে রোশদ

দর্শনের অন্তিম আচার্য দে-ক্রিমোনীর (মৃত্যু ১৬৩১ খৃঃ) পর্যন্ত এখানে ইসলামিক দর্শন পড়ানো হতে থাকে। এখানকার ইসলামী দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপকগণ হলেন—

(i) পীতর-দ্য বানো; (ii) জাঁন দে-জাঁদন; (iii) ফ্রা অরবানো; (iv) পল দী-বেনিস (মৃত্যু-১৪২৯ খৃঃ); (v) গাইতনী (মৃত্যু-১৪৬৫ খৃঃ), (vi) ইলিয়াস মদীজু (১৪৭৭ খৃঃ); (vii) বেরোনা; (viii) জ্বাবীলা (১৫৩৪-১৫৮৯ খৃঃ); (ix) পন্দেসিয়ো; (x) সীজার ক্রিমোনী।

ষোড়শ শতাব্দীতে রোশদের গ্রন্থের যে নতুন লাতিনী অনুবাদ হয় তাতে পাদুআর বিশেষ দান ছিল। এই অনুবাদকগণের মধ্যে পাদুআর অধ্যাপক বেরোনাও ছিলেন, যিনি কতিপয় পুস্তক সরাসরি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন, পন্দেসিয়ো-কৃত ব্যাখ্যার কিছু প্রাচীন নোট, আজও পাদুআর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

ক্রিমোনী—জ্বাবীলার শিষ্য সীজার ক্রিমোনী ইসলামী দর্শনের একজন যোগ্য অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর লেকচারের কিছু নোট উত্তর ইতালীর অনেক গ্রন্থাগারেই এখনও পাওয়া যায়। জ্বাবীলার ন্যায় ক্রিমোনীও এই অভিমত পোষণ করতেন যে, গ্রহ নক্ষত্রের গতি ব্যতীত ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনোই প্রমাণ নেই। রোশদের মতো তিনিও মনে করতেন, ঈশ্বরের শুধু নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, ব্যক্তির জ্ঞান নয়। মানুষের চিন্তাশক্তি আসে কর্তা-বিজ্ঞান থেকে। এ ছিল এমনই একটা বিচার, যা খৃষ্টধর্মের বিচারে নাস্তিকতা। ক্রিমোনী কিভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন তার উদাহরণ: "আত্মা বিষয়ে আমার বিশ্বাস কি হওয়া উচিত এই গ্রন্থে তা আমি আলোচনা করতে চাইছি না, আত্মা সম্বন্ধে শুধু অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্তই আমার আলোচ্য বিষয়। আমি মনে করি যে দর্শনের আলোচনা আমার কাজ নয়, এ কাজ সেন্ট টমাস প্রভৃতি ভালোভাবে সম্পন্ন করেছেন।" (রোশদের 'কিতাবুন'-এর ব্যাখ্যার ভূমিকা)।

কিন্তু এরপরেও ৩রা জুলাই ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর নামে পাদুআর সরকারী অফিসারের হুকুমনামা আসে: "লিটারারী কাউন্সিল সব অধ্যাপককে সতর্ক করে দিয়েছেন যে দর্শনের যে সিদ্ধান্ত ধর্মবিরোধী, পড়াবার সময় তা খণ্ডন করতে হবে; আর কোনো বিষয়ের যদি উদ্ধৃতি দিতে হয় তাহলে এ কথা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীদের ওপর তার কোনো কুপ্রভাব না পড়ে। কিন্তু আপনি এই আদেশ স্মরণে রাখছেন না, এজন্য আমার কর্তব্য হিসেবে আমি বারবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"

ক্রিমোনী এর উত্তরে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন: "আমি শুধু অ্যারিস্টটলের দর্শনের অধ্যাপক হিসেবেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন পাই। যদি এই কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ আমার নিকট আশা করা হয়, তবে আমি পদত্যাগপত্র দিতে

প্রস্তুত, আপনারা স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন। যতদিন আমি অধ্যাপনা কর্মে লিপ্ত থাকব ততদিন পদের কর্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো কাজ আমি করতে অক্ষম।"

ক্রিমোনীর মৃত্যুতে (১৬৩১ খৃঃ) শুধু ইসলামী দর্শনের পঠন-পাঠনই স্তব্ধ হয়ে যায়নি, কালেরও পরিবর্তন সূচিত হয়। ক্রিমোনীর পরে ল্যাসিতো (মৃত্যু-১৬৫৬ খৃঃ) অধ্যাপক হন, যাঁর ওপর নব্য দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এঁর পরে, ব্রেগার্ড, প্রাচীন গ্রীক দর্শন পড়াতেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে কার্দেলার সঙ্গেও পাদুআর প্রাচীন বন্ধন ছিন্ন হয় এবং সেখানে পাঠ্য-তালিকায় দে-কার্তের দর্শন সংযোজিত হয়।

§ ৪. ইউরোপে ইসলামী দর্শনের সমাপ্তি

ডন স্কটস, রোশদের শিক্ষাকে মানবতা থেকে বিচ্যুত বলেছেন। এর ফলে রোশদের যেখানে ধর্মক্ষেত্রে বদনাম হয়েছিল, সেখানে সকল প্রকার —বিশেষত বুদ্ধি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যক্তিগণ রোশদের পতাকার নিচে দাঁড়াতে থাকলেন এবং কোথাও কোথাও রোশদের নামে দল গঠন করতে থাকেন। এই রকম একটি দলের নাম, 'স্বাতন্ত্র্যের পুত্র'। এঁরা বিশ্বকেই ঈশ্বর বলে মনে করতেন এবং তার বস্তুসমূহকে ঈশ্বরের অংশ। খৃষ্টান চার্চের বিচারালয় থেকে তাঁদের জীবন্ত দগ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁরা হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। 'স্বাতন্ত্র্যের পুত্র'-দলে বহু নারী সদস্য ছিলেন এবং তাঁরাও সসম্মানে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পাদরীগণ এই অধার্মিকতার জন্য ফ্রেডরিক এবং রোশদকেই দায়ী করেন। অবশ্য এই বিরোধ থেকে রোশদের দর্শন তথা প্রাচীন দর্শনের কোনো ক্ষতি হয়নি।

চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কীগণ বাইজান্টিয়ামের খৃষ্টরাজ্য আক্রমণ করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। এই ধরনের যুদ্ধ, তথা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কুস্তুন্তুনিয়ার (বর্তমান ইস্তাম্বুল) নামই তখন ছিল বাইজান্টিয়াম। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার ফলে বহির্জগতে এর যে সম্মান ছিল তার চেয়েও বেশী সম্মান ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যময় কেন্দ্র হিসেবে। ক্যাথলিক (উদারপন্থী) এবং অর্থোডক্স (সনাতনী) এই দুই খৃষ্ট সম্প্রদায়ের পেট্রিয়ার্ক (মহাপিতা বা ধর্মরাজ) ছিলেন এখানকার বাসিন্দা। ক্যাথলিক গীর্জার ধর্ম-ভাষা ছিল লাতিনী এবং প্রাচ্যের সনাতনী গীর্জার ধর্ম-ভাষা ছিল গ্রীক। তুর্কী আক্রমণের সময়ে পলায়মান ব্যক্তিগণের মধ্যে কিছু গ্রীক পণ্ডিতও ছিলেন। এঁরা বহুমূল্য প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থসমূহ সঙ্গে নিয়ে ইতালীতে এসে বাস করতে থাকেন। এই পুস্তকসমূহ দেখে সেখানকার পণ্ডিত-

গণের চোখ খুলে যায়। তিব্বতী, চীনা অনুবাদের অনুবাদ পড়তে অভ্যস্ত ভারতীয় বিদ্বানের হাতে মূল সংস্কৃতে লেখা অসঙ্গের, 'যোগচর্যা ভূমি', বসুবন্ধুর, 'বাদবিধি', দিগ্নাগের, 'প্রমাণ-সমুচ্চয়', ধর্মকীর্তির, 'প্রমাণ-বার্তিক' এবং 'প্রমাণ-বিনিশ্চয়' এসে পড়লে যেমন অবস্থা হয়, সেই রকম হয়েছিল তাঁদের। মূল গ্রীক গ্রন্থ ছেড়ে, গ্রীক না জানা লেখকের টীকা ও সংক্ষিপ্তসার পড়বার যে প্রয়োজন নেই —তা এঁরা বুঝতে পারেন।

পিদারক (১৩০৪-১৩৭৪ খৃঃ) —রেমণ্ড লিলির ইসলামের মূলোৎপাটনের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও, তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ইউরোপে ইসলামী দর্শনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার জন্যই যেন তাস্কেনীতে পিদারকের জন্ম হয়। তাঁর পিতা তাঁকে উকিল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এতে রাজী না হয়ে পাদুআ-তে চলে আসেন। পিদারক ছিলেন লাতিনী এবং গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর লেখা পুস্তক আজও পাওয়া যায়। 'জেহাদবাদ' ইউরোপের চিত্তকে যে কি পরিমাণ বিষাক্ত করে তুলেছিল তা পিদারকের এই ধারণা থেকেই বোঝা যায়: "আরবীরা শিল্প ও জ্ঞানের কোনো চর্চা করেনি, তারা কেবল গ্রীক শিল্প-সংস্কৃতির কিছু কিছু অংশ রক্ষা করে চলছিল।" পিদারকের বক্তব্য ছিল যে, যখন মূল গ্রীক শিল্প-সংস্কৃতির গ্রন্থ আমরা পেয়েই গেছি তখন আরবী উচ্ছিষ্ট ভোজন করার কোনো অর্থই নেই। আরবের প্রতি তাঁর তিক্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বন্ধুর নিকট লিখিত একটি পত্র থেকে: "আমি তোমার থেকে এটুকু কৃপা আশা করি যে, তুমি দেশবাসীর হৃদয় থেকে আরবের নাম এমনভাবে মুছে দেবে, যেন এর কোনো অস্তিত্বই কোনোদিন ছিল না। এই জাতকে আমি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি। এটা ভালোভাবে মনে রাখা চাই যে গ্রীস বহু দার্শনিক, কবি, চিকিৎসক এবং বক্তার জন্ম দিয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো বিষয় নেই যার ওপর গ্রীক পণ্ডিতগণের লিখিত পুস্তক না আছে। কিন্তু আরবের কি আছে? স্রেফ অন্যের উচ্ছিষ্ট থেকে সংগৃহীত কিছু পুঁজি। আমি এদের চিকিৎসক, দার্শনিক এবং কবিগণের সঙ্গে ভালোমতোই পরিচিত, এবং আমি বিশ্বাস করি আরবের নিকট ভালো কিছুই আশা করা যায় না। …গ্রীক ভাষার বক্তা ডিমোস্থেনিস-এর পর সিসেরো, কবি হোমারের পর ভার্জিল, ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের পর টাইটাস লেভির জন্ম পৃথিবীতে আর কোথায় হয়েছিল, তুমিই বলো? …আমার দেশ ও জাতি কাজে এবং কথায় দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। আজ এ কি রকম বুদ্ধিহীনতার কাজ করছ যে নিজেদের আরব অপেক্ষাও অধম বলে মনে করছ! এ কি পাগলামি, যে নিজেদের কৃতি বিস্মৃত হয়ে আরবের স্মৃতিচারণ ও প্রশংসার নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছ! হে ইতালীর বুদ্ধি ও প্রতিভা! তুমি কি ঐ গভীর নিদ্রা থেকে কখনও জাগবে না?"

পিদারকের পর 'ইতালীর প্রতিভা' জেগে ওঠে এবং প্রাচ্য দেশ থেকে পালিয়ে

আসা গ্রীক দর্শনের পণ্ডিতগণ স্থানে স্থানে এমন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে গ্রীক সাহিত্য এবং দর্শনের শিক্ষা সরাসরি মূল গ্রীক গ্রন্থ থেকেই দেওয়া হতো। প্রারম্ভিক গ্রীক অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন—

(i) গাজা (মৃত্যু-১৪৭৮ খৃঃ),

(ii) জর্জ-দে-ত্রেপারবিন্দ (মৃত্যু-১৪৮৪ খৃঃ);

(iii) জর্জ স্কোলারিয়াস।

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখটি পাদুআ এবং ইতালীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন প্রফেসর ল্যানিয়াস, পাদুআর বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে সেই ভাষায় অ্যারিস্টটলের দর্শন পড়ান, যে ভাষায় স্বয়ং অ্যারিস্টটল আঠারোশো বছর পূর্বে এথেন্সে তাঁর ছাত্রগণকে পড়াতেন। প্রাচীনপন্থীগণের গর্ব হলো যে তিনি কালের স্রোতকে পিছনের দিকে প্রবাহিত করলেন, কিন্তু এ কাজ যে তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়, ইতিহাস পরে তা প্রমাণ করেছিল।

ঐ দিনটির পরেও, রোশদের দর্শনের পঠন-পাঠন পাদুআতে বজায় ছিল। সপ্তদশ শতকে জেস্যুইটপন্থীগণ রোশদের পঠন-পাঠনের ওপরে আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা তীব্র আঘাত, যা নিঃশব্দে এসে লাগছিল তা আসছিল বিজ্ঞানের কাছ থেকে, গ্যালিলিওর দূরবীন, নিউটনের মহাকর্ষ এবং বাষ্পীয় ইঞ্জিনের রূপে।

দশম অধ্যায়

৩. ইউরোপীয় দর্শন

সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিক

(মুক্ত চিন্তার প্রবাহ)

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খৃঃ) —নব্য ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাবিদ এবং শিল্পীগণের মধ্যে একজন হলেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি —যাঁর চিত্রকলা এবং রচনার মধ্যে শোনা গিয়েছিল নবযুগের পদধ্বনি। কিন্তু সেই সময় তিনি গ্রন্থ প্রকাশিত করে পোপের বিরাগভাজন হতে চাননি। তাঁর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ তাই তখন প্রকাশিত হয়নি।

১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার জ্ঞানের জগতে এক বিরাট আলোড়ন আনে, ফলে জ্ঞানের প্রচারও ত্বরান্বিত হয়। পোপ বা পুরোহিতগণ বহু পরিশ্রমে হস্তলিখিত পুস্তকের দু-চারটি কপি অগ্নিদগ্ধ করতে সক্ষম হতেন, কিন্তু হাজার হাজার মুদ্রিত পুস্তক নষ্ট করা তো আর সম্ভব নয়।

প্রাচ্যে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী, সেণ্ট ও সুফীগণের মাধ্যমে জগতের তুচ্ছতা প্রচার করে দৈনন্দিন সমস্যাকে ভুলিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় ইউরোপে ধর্ম ও কৃচ্ছ্রসাধনের জটিলতা থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করার প্রযত্ন, খুবই ঝুঁকি নিয়ে করা হচ্ছিল। সমালোচকগণ বাক্‌সর্বস্ব ধর্মোপদেষ্টাগণের সমর্থক দার্শনিকগণের বিরুদ্ধে আঘাত করতে সরব হয়ে ওঠেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল অহেতুক বাক্যবিন্যাস ছেড়ে, বাস্তবের মধ্যেই সত্যের অনুসন্ধান কর। কলম্বাস (১৪৪৭-১৫০৬), ভাস্কো দা-গামা (১৪৬৯-১৫২৪ খৃঃ), আমেরিকা এবং ভারতের পথ খুলে দেন। প্যারাসেলসাস (১৪৯৩-১৫৪১ খৃঃ) এবং ফ্যান হেলমণ্ট [জোহান ব্যাপটিষ্টা ফন হেলমেণ্ট] (১৫৭৭-১৬৪৪ খৃঃ) শুধুমাত্র পুঁথির পাতায় ডুবে না থেকে প্রকৃতির নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেন। সেই যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল ধর্মীয় অনুশাসনের দখলে, কাজেই বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণার কোনো স্থান সেখানে ছিল না; সেইজন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পৃথক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। লেলেসিও (১৫৭৭-১৬৪৪ খৃঃ) এই প্রকার গবেষণার জন্য নেপল্‌স-এ প্রথম রসায়নাগার খোলেন। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ভেসালিয়াস শারীরবিদ্যার ওপর

বিজ্ঞানসম্মত ভঙ্গিতে গ্রন্থরচনা করেন, এখানে কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে সমস্ত বিষয়ের মূর্তরূপ দেখেই তিনি লেখার চেষ্টা করেন। ধর্মকে এমতাবস্থায় খুবই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছিল, নিশ্চিহ্ন হবার আশঙ্কায় সে তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে চাইল। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে সের্ভেটাস (মাইকেল সের্ভেটাস ১৫১১-১৫৫৩ খৃঃ) এবং ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জিওর্দানো ব্রুনো অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিয়ে বিজ্ঞান জগতের শহীদ হন। এই যুগেই ভারতে সম্রাট আকবর, উদারতাপূর্বক বৈজ্ঞানিকের রক্তপিপাসু এই খৃষ্টান পুরোহিতদের এবং অন্যান্য ধর্মের সারকথা শ্রবণ করে এক নতুন ধর্ম দ্বারা সবধর্মসমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। ষোড়শ শতকের পুঁথিগত বিদ্যার বিরোধী এবং প্রয়োগবাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে মনটেইন (Montaigne ১৫৫৬-১৫৯২ খৃঃ), টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০২ খৃঃ) এবং সানচেজ (Sanchez ১৫৬২-১৬৩২ খৃঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি এবং ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ কূপমণ্ডুকতাকে দূর করতে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিল এবং এরই ফল-স্বরূপ সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে কিছু মুক্ত বাতাসের সঞ্চলন অনুভূত হয়। এই যুগের দার্শনিকগণের মধ্যে দুই প্রকার সিদ্ধান্তের ধারা লক্ষ্য করা যায় : (১) এক দলের মতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং প্রয়োগই (অভিজ্ঞতা) জ্ঞানের একমাত্র উৎস, এঁদের বলা হয় প্রয়োগবাদী। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন —বেকন, হব্‌স, লক্, বার্কলে, হিউম প্রভৃতি। (২) দ্বিতীয় দল জ্ঞানকে ইন্দ্রিয় বা প্রয়োগগম্য নয় —বুদ্ধিগম্য মনে করেছেন, এঁদের বলা হয় বুদ্ধিবাদী। দে-কার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিৎজ প্রভৃতি হলেন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক।

§ ১. প্রয়োগবাদ (Empiricism বা অভিজ্ঞতাবাদ)

প্রয়োগবাদে (অভিজ্ঞতাবাদে) প্রয়োগকে (অভিজ্ঞতাকে) জ্ঞানের উৎস বলা হয়েছে। অভিজ্ঞতাবাদ দু'রকমের হতে পারে, বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ এবং ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদ। উভয়ক্ষেত্রেই এটি অদ্বৈতবাদী। আবার অভিজ্ঞতাবাদ বস্তুবাদ ও ভাববাদ উভয়কে স্বীকার করে দ্বৈতবাদীও হতে পারে। হব্‌স, টোল্যাণ্ড (অদ্বৈত) বস্তুবাদী ; স্পিনোজা (অদ্বৈত) ভাববাদী ; এবং দে-কার্ত, বেকন, লাইবনিৎজ দ্বৈতবাদী।

১. অদ্বৈতবাদ (বস্তুবাদ)

(১) হব্‌স (১৫৮৮-১৬৭৯ খৃঃ) —টমাস হব্‌স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। প্যারিসে দে-কার্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যে দেশ

উদ্যোগে এবং পুঁজিবাদে অগ্রণী হতে চলেছিল সেখানে তাঁদের প্রথম শ্রেণীর মুক্ত-বুদ্ধির চিন্তাবিদ হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্সিস বেকনের স্বাধীন চিন্তার প্রচার তথা মধ্যযুগীয়তার বিরোধিতা করা এবং হব্‌স, লকের মতো দার্শনিকগণকে প্রাধান্য দেওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। দার্শনিক বিচারে বেকন ছিলেন প্রগতিশীল, তবে দার্শনিক প্রগতিশীলতা যে রাজনীতি ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রতিফলিত হবে এমন কোনো কথা নেই। যখন ইংল্যাণ্ডে সামন্তবাদের প্রতিবাদে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে জনতা প্রগতিবাদের পতাকা তুলে ধরেছিল তখন হব্‌স ছিলেন এর বিরোধী দলে। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী শাহ্‌জাহানের সমসাময়িক রাজা প্রথম চার্লস-এর শিরশ্ছেদ করে জনতা সামন্তবাদীদের পরাজিত করে। হব্‌স-এর মতো কিছু লোক এতে মনঃক্ষুণ্ণ হন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হব্‌স ফ্রান্সে পলায়ন করেন, কিন্তু যে দিন চলে গেছে তা আর ফিরে আসতে পারে না, এ কথা বুঝতে তাঁর দেরী হয়নি। তাই ঐ বছরই ফিরে এসে তিনি অধিনায়ক অলিভার ক্রমওয়েলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেন।

হব্‌স ছিলেন লোকোত্তরবাদের বিরোধী। তাঁর মতে দর্শন কারণ হতে কার্য, এবং কার্য থেকে কারণের জ্ঞানের সন্ধান দেয়। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা যেমন বস্তুর জ্ঞান (সিদ্ধান্ত) পাই, তেমনই সিদ্ধান্ত থেকেও বস্তুর জ্ঞান প্রাপ্ত হই।

দর্শন হচ্ছে গতি ও ক্রিয়ার বিজ্ঞান। এই গতি প্রাকৃতিক বস্তুতে থাকতে পারে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। মানুষের স্বভাব, মানসিক জগৎ, রাজ্য, প্রাকৃতিক ঘটনা প্রভৃতি সবকিছুই ঐ গতিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মাত্র।

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ থেকেই জ্ঞানের উদ্গম হয় এবং অনুভূতি মস্তিষ্ক বা ঐ ধরনের কোনো আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের মধ্যে গতি ব্যতীত আর কিছু নয়। যাকে আমরা মন বা অন্তর বলি আসলে তা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে এই প্রকার কিছু ভৌতিক পদার্থের গতি মাত্র। সিদ্ধান্ত বা প্রতিবিম্ব হলো মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের, অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থের গতি। বস্তু এবং তার গতিই হলো মূল উপাদান যা জগতের সকল জড়-চেতন বস্তুকেই ব্যাখ্যা করার জন্য পর্যাপ্ত।

হব্‌স ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করেননি, তিনি শুধু বলেছেন— "মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই জানবার ক্ষমতা রাখে না।"

শুভ-অশুভ, পাপপুণ্য হব্‌সের নিকট ছিল আপেক্ষিক, পরমার্থত কেউই ভালো অথবা মন্দ নয়।

অ্যারিস্টটলের মতো হব্‌সও মানুষকে কেবলমাত্র সামাজিক প্রাণী নয়, 'মানব মেষ' আখ্যা দিয়েছেন। মানুষ সর্বদাই ধন, যশ, প্রভুত্ব এবং ক্ষমতার প্রতি-যোগিতায় লিপ্ত; তার দৃষ্টি সদাই অধিকতর লোভ, হিংসা এবং হানাহানির প্রতি। তার উন্নতির পথে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালে সে তাকে

আঘাত, বশীকরণ অথবা বিতাড়িত করে যে কোনো উপায়ে নিজের পথ নিষ্কণ্টক রাখার চেষ্টা করে।

(২) টোল্যাণ্ড (১৬৭০-১৭২৯ খৃঃ)—হব্‌স-এর মতো তাঁর দেশবাসী টোল্যাণ্ডও ছিলেন বস্তুবাদী, এবং বার্কলের ভাববাদের বিরোধী। তাঁর মতে বাস্তব উপাদান গতিশূন্য নয়, সক্রিয় দ্রব্য বা শক্তি। বাস্তব উপাদান হলো শক্তি—গতি, জীবন, মন প্রভৃতি সবই এই শক্তির ক্রিয়া। চিন্তনও সেইরকম মস্তিষ্কের ক্রিয়া, যেমন জিহ্বার ক্রিয়া আস্বাদ গ্রহণ।

২. (অদ্বৈত) ভাববাদ

স্পিনোজা (১৬৩৩-১৬৭৭ খৃঃ)—বারুচ স্পিনোজা হল্যাণ্ডে এক ধনী ইহুদী পরিবারে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি প্রথমে লাতিনী সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন, পরে ফরাসী দার্শনিক দে-কাতের গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর মন মুক্ত দার্শনিক চিন্তনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর ধর্মবিরোধী চিন্তার জন্য আমস্টারডামের ইহুদী সম্প্রদায় ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে স্পিনোজাকে সমাজচ্যুত করে। ফলে স্পিনোজা আমস্টারডাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। যত্র-তত্র আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে (আওরঙ্গজেবের শাসনকালের প্রারম্ভে) তিনি হাগ নগরে বসবাস শুরু করেন, এখানে তাঁর জীবিকার উপায় ছিল চশমার কাঁচ ঘষা। সারা শতাব্দী স্পিনোজাকে নাস্তিক মনে করা হয়েছিল এবং তিনি খৃষ্টান, ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই ঘৃণার পাত্র রূপে গণ্য হন।

স্পিনোজাই ছিলেন সর্বপ্রথম দার্শনিক, যিনি মধ্যযুগীয় লোকোত্তরবাদ তথা ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনাকে স্পষ্ট ভাষায় খণ্ডন করে বুদ্ধিবাদ ও প্রকৃতিবাদকে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় সমর্থন করেন। সমস্ত প্রকার শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা বুদ্ধি বা যুক্তি অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। ধর্মগ্রন্থকেও তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা দিতে হয়, যেমন ঐতিহাসিককেও ইতিহাস লিখতে গেলে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করতে হয়। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কি সম্পর্ক তা জানাই বুদ্ধির কাজ। প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। যদি তার ব্যাখ্যার জন্য প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তুকে গ্রহণ করা হয় তবে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং আমরা সত্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলি। এইভাবে স্পিনোজার দর্শনের মধ্যে আমরা যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদ তথা বস্তুবাদী প্রয়োগবাদ উভয়েরই সংমিশ্রণ দেখতে পাই। কিন্তু স্পিনোজার প্রকৃতিবাদ এবং হব্‌স-এর বস্তুবাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে। হব্‌স ছিলেন বিশুদ্ধ বস্তুবাদী, তিনি সবকিছুরই ব্যাখ্যা বস্তুতত্ত্বের শক্তি বা গতি দ্বারা করতেন; কিন্তু স্পিনোজা স্টোয়িক ও ব্রহ্ম-জগৎ-অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় বলেছেন : "এ সবই ঈশ্বর তথা ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই এই সমস্ত।" এইভাবে বস্তুবাদ নয় বরং ভাববাদের ওপরই তিনি বেশী জোর দিয়েছেন।

(পরমতত্ত্ব)—এক সান্ত বস্তু তার সত্তার জন্য অসংখ্য উপাদানের ওপর নির্ভরশীল, আবার এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটি আবার অন্যান্য বহু উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। এইভাবে একের আধার অন্য, তার আধার আবার আর একটি··· মেনে নিয়ে আমরা কোনো নিশ্চয়তায় উপনীত হতে পারি না। অতএব এমন এক উপাদান দরকার যা স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ম্ভূত, নিজেই নিজের আধার এবং অন্যের আধেয়, ঘটনাসমূহের অবলম্বন। অবশ্য ঐ স্বতঃসিদ্ধ কারণের অনুসন্ধানের জন্য আমাদের প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং প্রকৃতিই এই কর্ম তথা ঈশ্বরের কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে। এইভাবে, প্রকৃতি তথা ঈশ্বরই সর্বময়, অনন্ত এবং পূর্ণ কারণ; এর আগে বা পরে কোনো লোকোত্তর কারণ থাকতে পারে না। প্রকৃতিও গতিশূন্য নয়, সক্রিয় ও পরিবর্তনশীল এবং সবরকম শক্তিই হলো প্রকৃতি। প্রত্যেক অন্তিম শক্তিই ঈশ্বরের গুণ। মানুষ এই অনন্ত গুণের মাত্র দুটিকে জানে, বিস্তার (পরিমাণ) ও চিন্তন এবং এই দুটিই ভৌতিক তথা মানসিক শক্তি। সমস্ত বস্তুপিণ্ড এবং বাস্তব ঘটনা বিস্তার-গুণেরই বিভিন্ন অবস্থায় থাকে এবং সমস্ত মানসিক অনুভূতি থাকে চিন্তন-গুণের মধ্যে। বিস্তার ও চিন্তন উভয়েই এক পরম কারণের গুণ—অতএব ভৌতিক ও মানসিক পদার্থের সম্পর্কের মধ্যে কোনো জটিলতা থাকতে পারে না। যে সব সান্ত ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তা ভ্রম বা মায়া নয়—বাস্তব, ঘটিত হওয়ার সময় বা লুপ্ত হওয়ার সময় তার মধ্যে কোনো অত্যন্তাভাব লক্ষিত হয় না, কেন না তার মধ্যে যে পরম কারণ বর্তমান আছে তা সদাই পরিবর্তনশীল।

৩. দ্বৈতবাদ

লক্—(১৬৩২-১৭০৪ খৃঃ)—জন লক্ অক্সফোর্ডে দর্শন, প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বহু বৎসর পর্যন্ত (১৬৬৬-১৬৮৩ খৃঃ) তিনি ইংলণ্ডে আর্ল শ্যাফ্‌টসবেরী নামে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির সেক্রেটারী ছিলেন। প্রয়োগ বা অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর অস্তিত্বে লক্ বিশ্বাসী ছিলেন না। আমাদের জ্ঞান আমাদের উপলব্ধির বাইরে যেতে পারে না। জ্ঞান তখনই সত্য হয় যখন আমাদের সিদ্ধান্ত বস্তুর সত্যতাকে স্বীকার করে অর্থাৎ সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতা-বিরোধী না হয়।

(১) উপাদান—মানসিক ও ভৌতিক উপাদান—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসিদ্ধ—দুটি পদার্থ তো আছেই, এ ছাড়াও তৃতীয় এক কারণ হলো আত্মা বা ঈশ্বর। স্বীয় প্রাকৃতিক যোগ্যতার সঠিক প্রয়োগের দ্বারাই ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান হতে পারে।

নিজে কোনো মন্দ কাজ করলে নিজের যে মনোভাব হয়, যা আসে আমাদের

নীতিজ্ঞান থেকে তাকে আত্মার কণ্ঠস্বর বলা হয়, এ ছাড়া তা অন্য কিছু নয়। নীতিজ্ঞান স্বয়ম্ভু (স্বতঃসৃষ্ট) নয়, কারণ তা আপনা থেকে সৃষ্ট হয়েছে বলে দেখা যায় না এবং সর্বক্ষেত্রে তা সমান হয় না। ঈশ্বর-সম্বন্ধী ধারণাও স্বতঃস্ফূর্ত নয়, যদি তা হতো, তবে কয়েকটি জাতিকে ঈশ্বর-জ্ঞান-শূন্য আবার কয়েকটিকে ঈশ্বর-বিষয়ে কৌতূহলী হতে দেখা যেত না। এইভাবেই অগ্নি, সূর্য, আবহাওয়া প্রভৃতির জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে আসে —স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়।

(২) মন —মন প্রথমে থাকে যেন একটা পরিষ্কার স্লেটের মতো, তাতে না থাকে কোনো ধারণা, না কোনো ছাপ অর্থাৎ প্রতিবিম্ব (বাসনা)। জ্ঞানের সামগ্রীকে আমরা অভিজ্ঞতা (প্রয়োগ) থেকে প্রাপ্ত হই, অভিজ্ঞতার ওপরেই গড়ে ওঠে জ্ঞানের সৌধ।

লকের বক্তব্য, কারণ হলো সেই বস্তু যা অন্য কোনো বস্তুকে সৃষ্টি করে এবং কার্য হলো সেই বস্তু যার আরম্ভ অন্য কোনো পদার্থ থেকে হয়।

ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি বা তার ভিত্তিতে কৃত সিদ্ধান্ত আমাদের দেশ-কাল-বিস্তার, ভেদ-অভেদ, নীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান দান করে ও জ্ঞানের সামগ্রীকে প্রস্তুত করে।

লক্‌ দর্শনকে কল্পনার আকাশচারণ থেকে মুক্ত করে প্রকৃতি-অধ্যয়নের কাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। প্রশ্ন করবার আগে নিজের যোগ্যতা উপলব্ধি করা এবং দেখা দরকার যে কোন বিষয়ে কতটা আমরা বুঝতে সক্ষম। নিজের বুদ্ধির অতীত প্রশ্ন, অনেক নতুন প্রশ্ন সৃষ্টি করে, আরও কত বিতর্ক সৃষ্টি করে যার ফলে আমাদের সন্দেহও বেড়ে যায়।

§২. দ্বৈতবাদ (যুক্তিবাদ)

এইভাবে স্পিনোজার (অদ্বৈত) ভাববাদকেও যুক্তিবাদের (দ্বৈতবাদের) মধ্যে ধরা যেতে পারে, কারণ যদিও ভাববাদ বস্তুজগতের সত্তাকে কোনো গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু স্পিনোজার দর্শনে ভাববাদ এবং বস্তুবাদের এমন কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং প্রকৃতির বাস্তবিকতার ওপর তিনি এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে স্পিনোজার দর্শনকে শুধুমাত্র ভাববাদী মনে করলে ভুল হবে। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য দার্শনিকগণের মধ্যে আছেন দে-কার্ত এবং লাইবনিংজ। উভয়েই ছিলেন দ্বৈতবাদী।

১. দে-কার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খৃঃ)

রেনে দে-কার্তের জন্ম ফ্রান্সের এক সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন পরিবারে। দর্শন ছাড়াও কয়েকটি প্রাচীন ভাষাতে তিনি ছিলেন পণ্ডিত এবং প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞ, তাঁর জ্যামিতি আজও কার্তেসীয় জ্যামিতি নামে প্রসিদ্ধ।

ইউরোপে পুনর্জাগরণের সময়ে অন্যান্য সকল শিক্ষাসংস্কারকের মতো দে-কার্তও তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। একমাত্র গণিত শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকেই তিনি মোটামুটি সন্তোষজনক মনে করেছিলেন, কারণ তা একটা নিয়মবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিল। দে-কার্ত গণিতের নিয়মকে দর্শনেও ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। সেণ্ট অগাস্টিনের মতো তিনিও 'সন্দিগ্ধমনে চিন্তন' শুরু করেন —আমি সকল জাগতিক বস্তুকেই সন্দেহযোগ্য মনে করি, কিন্তু নিজেকে নয়, সন্দেহ নেই যে, "আমি চিন্তা করছি অতএব আমি আছি।" এই ভাবনাকে স্বীকার করা প্রয়োজন কেন না তা "স্পষ্ট এবং সন্দেহের ঊর্ধ্বে।" এইভাবেই আমরা সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, "যাকে আমরা স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত দেখি তাই-ই সত্য।" এই প্রকার স্পষ্ট, সন্দেহাতীত অতএব সত্য সিদ্ধান্ত হলো —ঈশ্বর, রেখাগণিতের স্বতঃসিদ্ধ এবং "যা নেই তার থেকে কিছু সৃষ্টি হতে পারে না" —এর মতোই অনাদি সত্য। যদিও দে-কার্ত ঈশ্বর স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত এই সিদ্ধান্ত থেকে ঈশ্বরের স্বয়ংসিদ্ধতাকে মেনে নিয়েছেন কিন্তু হাওয়ার গতি এতই প্রতিকূল ছিল যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য তাঁকে পৃথকভাবে চেষ্টা করতে হয়েছিল। দৃশ্য-জগতেরও স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত অংশকে তিনি সত্য বলেছেন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং স্ব-স্থিতি বজায় রাখার জন্য বিশ্ব ঈশ্বরের ওপরই নির্ভরশীল। ঈশ্বর-নির্মিত জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত —কায়া বা বিস্তারযুক্ত পদার্থ, এবং মন বা চিন্তনশীল পদার্থ। আত্মা বা শরীরকে তিনি অ্যাকুইনাসের মতো অভিন্ন তো নয়ই; বরং সেণ্ট অগাস্টিনের মতো সর্বথা ভিন্ন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলে মন্তব্য করেছেন। ভগবানের দিব্য সহায়তায় আত্মা শরীরে গতি উৎপাদন ও তাকে সঞ্চালন করে। এইভাবে দে-কার্ত লোকোত্তরবাদী তথা খৃষ্টধর্মের সহায়ক হয়েছিলেন। আত্মা এবং দেহের মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই; এই ধারণাই দে-কার্তকে মানতে বাধ্য করেছিল যে, এই দুটির মধ্যে কোনো একটির যখন কিছু পরিবর্তন হয় তখন ভগবান হস্তক্ষেপ করে অন্যটির মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করেন।

ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স ছিলেন দে-কার্তের পরিচিত, কিন্তু উভয়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে আমরা আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করি। দে-কার্ত ছিলেন পুরোপুরি লোকোত্তরবাদী, জগতের যাবতীয় জড-চেতন পদার্থ ঈশ্বরের ইঙ্গিতে যেন দক্ষ বাজিকরের অঙ্গুলীহেলনে নাচতে থাকে। কিন্তু হব্‌স ছিলেন লোকোত্তরবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, সমস্ত সমস্যাকে প্রকৃতির মধ্যেই অনুসন্ধান করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। স্পিনোজা দে-কার্তের গ্রন্থ থেকে খুবই উপকৃত হয়েছিলেন, এ থেকে তিনি 'বিস্তার' ও 'চিন্তন'-এর ধারণা এবং আত্মার স্বরূপকেও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দে-কার্তের দর্শনের 'ঐশ্বরিক যন্ত্রবাদ'-কে তিনি দুর্বল মনে করেছেন, তাই দে-কার্তের দ্বৈতবাদকে পরিত্যাগ করে তিনি প্রকৃতি-ঈশ্বর-অদ্বৈত বা ভাববাদকে হব্‌সীয় চিন্তা ও বিশ্লেষণের নিকটবর্তী করার চেষ্টা করেছেন।

দে-কার্তের মতে মানুষ তার আচার-আচরণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা-শিল্পের নব নব আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে যে পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারে তাকেই দর্শন বলে। দে-কার্তের পরিভাষায় দর্শনের মধ্যে লৌকিক-লোকোত্তর সমস্ত 'স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত' তথা অবিসংবাদী জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত।

ঈশ্বরের কর্ম সম্পর্কে দে-কার্ত বলেছেন—সৃষ্টির প্রারম্ভেই ভগবান গতি এবং বিরতি সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সঙ্গে বস্তু বা প্রকৃতিকে। প্রকৃতির গতিকে একই মাত্রায় অপ্রতিহত রাখার জন্য তার সহায়তা করা প্রয়োজন, অতএব ঈশ্বরকে সদা সজাগ এবং সক্রিয় থাকতে হয়।

আত্মা বা চিন্তাশীল বস্তু তাকেই বলা যায়, যার সন্দেহ ও অনুভব করার, গ্রহণ সমর্থন-অস্বীকার-ইচ্ছা-প্রতিষেধ করার ক্ষমতা আছে।

গভীর চিন্তাবিদ হয়েও দে-কার্ত নিজেকে মধ্যযুগীয় মানসিকতা থেকে মুক্ত করতে পারেননি। আবার নিজের দর্শনকে জনপ্রিয় রাখার জন্যও তিনি ধর্মযাজক বা ধার্মিকগণের বিরাগভাজন হতে চাননি। এ ব্যাপারে দে-কার্তের নিজের শ্রেণীস্বার্থ ছিল এই যে ধর্ম এবং তার সঙ্গে জড়িত প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা যেন অক্ষত থাকে।

২. লাইবনিৎজ (১৬৪৬-১৭১৬ খৃঃ)

গোটফ্রিড বিলহেলম্ লাইবনিৎজ জার্মানীর লাইপৎজিগে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন, দর্শন ও গণিত অধ্যয়ন করেছিলেন।

দর্শন—লাইব্‌নিৎজ ছিলেন (আত্ম-কণবাদ) মোনাড-তত্ত্ব (Monadism)-এর প্রবর্তক (মোনাড অবিভাজ্য অ-বস্তু সত্তা)। তাঁর দর্শনে ভৌতিক পদার্থ এবং দেশ (space) বাস্তবসত্য বা objective reality নয়, মন যা অনুভব করে তাকে দৃশ্যরূপ দান করে মাত্র। আত্ম-কণই (Monad) একমাত্র সত্য। সমস্ত আত্ম-কণের বিকাশধর্ম এক প্রকার নয়। কিছু আত্ম কণের বিকাশ হয় অত্যন্ত অল্প, এরা সুপ্ত; কিছুর বা বিকাশ পূর্ণ, জাগ্রত চেতনার ন্যায় তা বহু উচ্চ পর্যায়ের এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের চরম বিকাশ ঈশ্বরে। তার চেতনা পূর্ণ, গম্ভীর এবং সক্রিয়। আত্ম-কণিকার সংখ্যা যেমন অসংখ্য তেমন তার বিকাশের অনুক্রম-পরম্পরাও অনন্ত—এদের মধ্যে এত পার্থক্য যে দুটি আত্ম-কণ কোনোমতেই একপ্রকার হতে পারে না। অতএব এটা স্পষ্ট যে লাইবনিৎজ ছিলেন দ্বৈতবাদের সমর্থক।

আত্ম-কণসমূহ নিজেদের অস্তিত্বের জন্য নিজেরাই দায়ী, পরস্পরের মুখাপেক্ষীও নয়, পরস্পরকে প্রভাবিত করতেও অক্ষম। অবশ্য সর্বোচ্চ আত্ম-কণ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না—তিনি নিজের মধ্যে থেকেই আত্ম-কণসমূহ সৃষ্টি করেন,

ক্রিয়াশীল অবস্থায় এরা যে পারস্পরিক সহযোগিতা করে তা পূর্বস্থাপিত সমন্বয়েরই কারণ, সহযোগিতার উপযুক্ত করেই ভগবান এদের সৃষ্টি করেছেন।

দে-কার্তের সিদ্ধান্ত —ঈশ্বর বস্তুর মধ্যে একটা নির্ধারিত গতি দিয়েছেন—ঘড়িতে দম দেওয়ার মতো —লাইবনিৎজ-এর এই সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি ; যদিও ধর্ম, ঈশ্বর, দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তিনি তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। লাইবনিৎজ-এর বক্তব্য —গতি সৃষ্টিও হয়, বিনষ্টও হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রবাহ সিদ্ধান্তের বিরোধী। বিশ্বে ক্রিয়া-রহিত কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। লাইবনিৎজ-এর এই বক্তব্য হাজার বছর পূর্বের দার্শনিক ধর্মকীর্তির —"অর্থক্রিয়াসমর্থ যত্‌ তদত্রপরমার্থ সত্‌" (প্রমাণ বার্তিক) অর্থাৎ যিনি অর্থক্রিয়ায় সমর্থ তিনিই পরমার্থ —উক্তিরই যেন প্রতিধ্বনি।

শক্তি ব্যতীত বিস্তার সম্ভব নয়, তাই লাইবনিৎজ শক্তিকেই শরীরের প্রধান গুণ বলেছেন।

দেশ আপেক্ষিক পদার্থ, তার কোনো পরম সত্তা নেই। বস্তু যাতে স্থিত তাই-ই দেশ, তা বস্তুর সঙ্গেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু শক্তি দেশ-নির্ভর নয়, বরং দেশই তার সত্তার জন্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল। অতএব আত্ম-কণসমূহের মধ্যে বা তার বাইরে দেশ হতে পারে না, যেখানে শক্তি শেষ, দেশও সেখানেই বিনষ্ট। দেশ সম্পর্কিত এই কল্পনা আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতাবাদের কাছাকাছি।

(১) ঈশ্বর —লাইবনিৎজ-এর মতানুযায়ী দর্শন ঈশ্বর পর্যন্ত যায় ; কেন না দর্শন ভৌতিক এবং যান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করতে চায়, আর ঐ ব্যাখ্যা ব্যতীত চরম কারণ ভগবানকে আমরা মানতে পারি না। ঈশ্বর স্ব-নির্মিত গৌণ বা উপাদান-কারণ দ্বারা সব জিনিস সৃষ্টি করেন। তিনি তো বিশ্বকে সর্বাঙ্গসুন্দর করেননি! এর উত্তরে লাইবনিৎজ বলেছেন —"ভাই! ভগবান তাঁর সাধ্যমতো মনোরম করেই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। বৈচিত্র্য দান ও সমন্বয় সাধনও করেছেন। হয়ত তাতে পূর্ণতা নেই, কিছু ত্রুটিও থাকতে পারে। কিন্তু সীমিত গণ্ডির মধ্যে ভগবান আর কেমন করেই বা তাঁর স্বভাবকে ব্যক্ত করবেন? দোষ-ত্রুটিরও আবশ্যকতা আছে। কৃষ্ণবর্ণ পটভূমিতে চিত্র যেমন সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে তেমনই শুভকে ব্যক্ত করার জন্য অশুভের প্রয়োজনও তো আছে।" এখানে সামাজিক অত্যাচার উৎপীড়নের সমর্থনে তিনি কিভাবে একটা মেরুদণ্ডহীন যুক্তি দেখিয়েছেন!! যদি নিজের শুভত্ব প্রদর্শনের জন্য ভগবানকে কিছু ব্যক্তিকে নিজের কৃপাপাত্র আর ৯০ শতাংশকে দরিদ্র, নিপীড়িত, দুঃখী, জঘন্যতম করে রাখতে হয় তবে তেমন ভগবানের থেকে "ত্রাহি মাম্‌।"

(২) জীবাত্মা —আত্মা অসংখ্য আত্ম-কণের একটি। লাইবনিৎজ আত্মাকে অবিচল ঐকিক সত্তা বলে মনে করেছেন। —"আত্মা মোম নয় যে খুশী

মতো তার উপর ছাপ দেওয়া যাবে। যিনি এরূপ মনে করেন তিনি আত্মাকে বস্তুতে পরিণত করেন।" আত্মার মধ্যে সত্তা, দ্রব্য, ঐক্য, সাম্য, কারণ, প্রত্যক্ষ, কার্য-কারণ, পরিমাণ —এই সব জ্ঞানই আছে। অতএব আত্মা ইন্দ্রিয়ের মুখাপেক্ষী নয়।

(৩) জ্ঞান —বুদ্ধিসঙ্গত জ্ঞান তখনই সম্ভব যখন আমরা কোনো সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়ে তারই ভিত্তিতে নিজের যুক্তিকে ব্যবহার করতে পারি। এই স্বয়ম্ভু সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিচার্য বিষয়ের সাদৃশ্য বা বিরোধ থাকতে পারে। শুদ্ধ চিন্তনের ক্ষেত্রে সত্যের কষ্টিপাথর হলো এই সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য। প্রয়োগের ক্ষেত্রে সত্যনির্ণয়ের কষ্টিপাথর হলো পর্যাপ্ত যুক্তি। দর্শনের প্রধান কাজ হলো জ্ঞান ও সত্যের মৌলিক সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করা।

হব্‌স ও দে-কার্ত ছিলেন নিজ নিজ মতবাদে পরস্পরের বিপরীত মেরুর বাসিন্দা, একজন ছিলেন প্রকৃতিবাদী (বস্তুবাদী), অন্যজন লোকোত্তরবাদী। অনুভূতির ক্ষেত্রে স্পিনোজা সহমত ছিলেন দে-কার্তের সঙ্গে কিন্তু বুদ্ধির ক্ষেত্রে হব্‌সের সঙ্গে, যে জন্য তিনি দে-কার্তের মতকে পুষ্ট করতে পারেননি, বরং তাঁর দর্শন নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের পথ পরিষ্কার করেছিল। লাইবনিৎজ যদিও দর্শনকে বুদ্ধিসঙ্গত করার জন্য মধ্যযুগীয় মানসিকতা থেকে কিছুটা অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন কিন্তু ততটা নয় যাতে লোকে তাঁকে স্পিনোজার মতো বস্তুবাদী বলতে পারে। একই সঙ্গে ঈশ্বর, আত্মা, সৃষ্টি প্রভৃতি ধর্মীয় ধারণাকে তাঁর দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করতে চাওয়ায় লোকে তাঁকে একজন গতানুগতিক দার্শনিক বলেই বুঝেছিল। এই রকম চিন্তা করে তিনি স্পিনোজার সমন্বয়-প্রকৃতি-ঈশ্বর-অদ্বৈত তত্ত্ব না মেনে নিজের মোনাড-তত্ত্ব উপস্থিত করেন যার মধ্যে স্পিনোজার ভাববাদও ছিল, এবং দে-কার্তের দ্বৈতবাদী-ঈশ্বরবাদও ছিল।

একাদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক

নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭ খৃঃ) অভিকর্ষ আবিষ্কার (১৬৬৬ খৃঃ) এবং বিশ্বের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সপ্তদশ শতাব্দীর এবং তার পরবর্তী দার্শনিক বিচারধারার ওপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হার্সেল (১৭৩৮-১৮২২ খৃঃ) নিউটনের অভিকর্ষ সিদ্ধান্তের সাহায্যে শনি গ্রহের কক্ষপথ থেকে ইউরেনাস গ্রহ (১৭৮১ খৃঃ) এবং শনির দুই উপগ্রহ (১৭৮৯ খৃঃ) আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া তিনি ৮০০টি যুগ্ম তারকা আবিষ্কার করেন যারা পরস্পর বেষ্টিত হয়ে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে নিউটনের অভিকর্ষ সিদ্ধান্ত সৌরমণ্ডলেও প্রযোজ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লাপলাস তাঁর Celestial Mechanics (মহাকাশ বলবিদ্যা) গ্রন্থে ঐ সিদ্ধান্তকে আরও পুষ্ট করে তোলেন। এদিকে পদার্থবিদ্যাও তাপ, ধ্বনি, চুম্বক এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করে। রামফোর্ড আবিষ্কার করেন যে তাপও গতিরই একটি প্রকার ভেদ। হক্সবী ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণ করেন যে ধ্বনি বাতাসের ওপর নির্ভরশীল, বাতাস না থাকলে ধ্বনি সৃষ্টি হতে পারে না।

রসায়নশাস্ত্রে প্রীস্টলী (১৭৩৩-১৮০৪ খৃঃ) এবং শীল (Scheele) পরস্পর স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। ক্যাভেণ্ডিশ (১৭৩১-১৮১০ খৃঃ) আবিষ্কার করেন —হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণ হলো জল।

এই শতাব্দীতেই হুটন (১৭২৬-১৭৯৭ খৃঃ) তাঁর Theory of the Earth নিবন্ধে ভূগর্ভ-বিজ্ঞানের পরিচয় উদ্ঘাটন করেন এবং জেনার (১৭৪৯-১৮২৩ খৃঃ) বসন্তের টীকা আবিষ্কার করেন। ব্যাধি আক্রমণের পূর্বেই তাকে প্রতিরোধ করার এই অভিনব পন্থা চিকিৎসা জগতে এক নবদিগন্তের সূচনা করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে প্রগতি আমরা দেখলাম তার প্রভাব দর্শন-শাস্ত্রেও না পড়ে পারেনি। তাই দেখা যায় এই শতকের দার্শনিকগণ শুধু কল্পনা জগতে বিচরণকারী নন। সন্দেহবাদী হিউম, ভাববাদী বার্কলে এবং কাণ্টের ন্যায় প্রয়োগের সাহায্যে নিজ নিজ কল্পনা ও চিন্তনকে তাঁরা সমর্থন করতে চেয়েছেন।

§ ১. বিজ্ঞানবাদ বা ভাববাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ভাববাদী দার্শনিক হলেন বার্কলে এবং কাণ্ট।

(১) বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩ খৃঃ) —বার্কলের জন্ম হয় আয়ারল্যাণ্ডে এবং শিক্ষা ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কোলোশের প্রধান পাদ্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। কোনো নতুন তত্ত্বের অন্বেষণ তাঁর দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল বস্তুবাদ এবং নিরীশ্বরবাদ থেকে খৃষ্টধর্মকে রক্ষা করা। এদিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সেণ্ট অগাস্টিন ও সঙ্কীর্ণ অর্থে খৃষ্টানদের অ্যাকুইনাস বলা চলে। হব্‌সের বস্তুবাদী দর্শন তথা মুক্তবুদ্ধির শিক্ষা ধীরে ধীরে বুদ্ধিবাদী শিক্ষিত মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করে খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে জনমত গঠন তথা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সূচনা করেছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বিজ্ঞান যেভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল তাতে ধর্ম অধিকতর দুর্বল এবং ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিল; প্রমাণিত হয়েছিল যে প্রকৃতি ও তার নিয়মসমূহ সর্বপ্রকার বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য পর্যাপ্ত। যদিও এই উত্তাল তরঙ্গকে দে-কার্ত, স্পিনোজা এবং লাইবনিৎজ-এর দর্শনের সাহায্যে অবদমন করা সম্ভব ছিল, কিন্তু বস্তুর অস্তিত্বকে তো এঁরাও কোনো না কোনোভাবে স্বীকার করেছিলেন। বিশপ বার্কলে তাঁর দর্শনের দ্বারা বস্তুর অস্তিত্বকেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বস্তুও থাকবে না, বস্তুবাদীগণেরও কিছু বলার থাকবে না।

মুখ্য অথবা গৌণ গুণ সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি বা ধারণা বার্কলের মতে কোনো বাস্তব জিনিসের প্রতিবিম্ব নয়, কেবলমাত্র মানসিক ভাব বা অনুভূতি, তার বেশী কিছু নয়। মন কেবল মনের ভাবকেই জানতে পারে, বাস্তব পদার্থ এবং তার আকৃতি, রঙ, গুণ প্রভৃতির সঙ্গে এই মানস প্রতিবিম্বের কোনো সাদৃশ্যই সম্ভব নয়। অতএব বস্তুপিণ্ডের অস্তিত্বকে স্বীকার করার কোনো প্রমাণ নেই। জ্ঞান আমাদের মনের ধারণা মাত্র, মনের বাইরের কোনো বস্তুর (অ-মনীয় সত্তার) তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয়। "মনের বাইরে স্বর্গের সুখ সঙ্গীত অথবা পার্থিব জিনিস থাকতে পারে, কিন্তু তা মনের ভাব ছাড়া অন্য কিছু নয়। মন যখন তাদের সম্পর্কে সচেতন হয় তখনই তারা অস্তিত্বশীল হয়। মানুষের কাছে যা অজ্ঞাত, ধরতে হবে তার অস্তিত্ব নেই, যদিও বা থাকে তবে তা হয়ত কোনো অবিনাশী আত্মার মধ্যে আছে।" বস্তুপিণ্ড নিজ নিজ গুণানুযায়ী নিয়মিত প্রভাব —উত্তাপ, শীতলতা প্রভৃতি —সৃষ্টি করে। অতএব যদি বস্তু অস্তিত্বহীন হয় তবে এগুলি কোথা থেকে উৎপন্ন হলো? বার্কলের উত্তর হলো —"বিধাতা নিজের ইচ্ছায় প্রকৃতিকে যেভাবে সৃষ্টি" করেছেন এটা তারই ফল —এতে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি বা ধারণার সূত্র রাখা

হয়েছে। বার্কলের মতানুযায়ী সত্য হলো —ভগবান, তাঁর সৃষ্ট আত্মা এবং বিভিন্ন ধারণা, যা ঈশ্বরের নির্দেশে বিশেষ অবস্থার মধ্যে সৃষ্ট হয়।

(২) কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪ খৃঃ) —ইমানুয়েল কাণ্ট জার্মানীর কোইনিগ্‌স-বার্গ শহরে এক সাধারণ শিল্পীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একটা ধার্মিক পরিবেশে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল। প্রায় সারাজীবনই তিনি জন্মভূমিতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন, তাই এদিক দিয়ে বিচার করলে দেশভ্রমণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কূপমণ্ডূক।

কাণ্টের সময় বিজ্ঞানের বিকাশ এবং তার প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি প্রকৃতিকে অবহেলা করে কেবল ভাববাদের ওপরেই তাঁর সমস্ত সমর্থন আরোপ করতে সক্ষম হননি —যদিও ঘুরে ফিরে তাঁকেও সেখানেই উপনীত হতে হয়েছিল—আর বস্তুবাদের বিরোধী তো তিনি ছিলেনই। হিউমের মতো সন্দেহবাদ দ্বারা ঐ উভয়বাদের ওপর নিজস্ব মত গঠন তাঁর পছন্দ হয়নি। তাঁর দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল —হিউমের সন্দেহবাদ ও প্রাচীন দার্শনিকগণের কৃচ্ছ্রতাকে সীমিত করে বস্তুবাদ এবং নিরীশ্বরবাদকে নষ্ট করা। নিজেকে যুক্তিবাদী বলে প্রমাণ করার জন্য তিনি ভাবুকতা, মিথ্যা বিশ্বাস তথা কুসংস্কারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কাণ্টের সময়ে ইউরোপের চিন্তাশীল সমাজ শুধু মধ্যযুগীয় মানসিকতা থেকে মুক্তই হয়নি এমনকি ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এই দুটি প্রতিনিধি দেশ মধ্যযুগীয় আর্থিক কাঠামো, সামন্তবাদকে বিদায় করে পুঁজিবাদের দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু করেছিল। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম চার্লস্-এর সঙ্গেই ইংরেজী সামন্তবাদের প্রাধান্য শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। রাজমুকুটকে ধূলায় নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন মর্যাদার প্রতিও মানুষের আস্থা হারিয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে এল ফ্রান্সের পালা। সামন্তবাদের অত্যাচারে মানুষ ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাদের এই অসন্তোষকে ব্যক্ত করার জন্যেই যেন ফ্রান্সে দু'জন শক্তিশালী লেখক ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খৃঃ) এবং রুসো (১৭১২-১৭৭৮ খৃঃ)-র আবির্ভাব হয়। ভলতেয়ার বলেছেন ধর্ম হলো অজ্ঞতা এবং শঠতার দ্বারা সৃষ্ট। ধর্মীয় সম্প্রদায় তথা ধর্ম তাঁর মতে একটা জাল, যা মানুষের অজ্ঞতা, সারল্য এবং পক্ষপাতিত্বকে ব্যবহার করে তাদের ওপর শাসন চালাবার জন্য চতুর পুরোহিতগণ দ্বারা সৃষ্ট একটা নতুন কৌশল। রুসো ভলতেয়ারকেও অতিক্রম করে শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানকেও আলস্য ও শৌখিনতার ফসল বলে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে এটাই নৈতিক পতনের কারণ। "স্বাভাবিক নিয়মে সব মানুষই সমান। আমাদের যে সমাজ তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা প্রচলিত করে সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছে —তাই সেখানে আজ আমরা প্রভু-ভৃত্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে এক মর্মান্তিক পার্থক্য লক্ষ্য করি।" আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ব্যারণ দো'লবাশ (১৭২৩-১৭৮৯ খৃঃ) বলেছিলেন: "আত্মা কোনো বস্তু নয়, চিন্তন মস্তিষ্কের ক্রিয়া, বস্তুই একমাত্র অমর বস্তু।"

এইরকম পরিস্থিতিতে কাণ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউরোপের মুক্ত বিচার-ধারাকে খৃষ্টধর্ম ধাঁচের চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা যাবে না, তার জন্য ঐ চার দেওয়ালের গণ্ডিকে কিছুটা বাড়িয়ে ঈশ্বর, কর্মের স্বাধীনতা ও আত্মার অমরত্ব এই তিনটি মৌলিক সিদ্ধান্তকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। এই সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে নিজের প্রখর তর্কের মিশ্রণে কাণ্ট এক জটিল জাল সৃষ্টি করেন। তিনি বলে-ছেন যে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে মানুষ বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারলেও অনন্ত পর্যন্ত যেতে পারে না। তার দৌড়ের একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। ঈশ্বর, পরলোক মানুষের অভিজ্ঞতার সীমার বাইরে —এক অসীম বস্তু; অতএব সে সম্পর্কে কোনো তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে না, তর্কের দ্বারা তা খণ্ডনও করা যায় না, প্রমাণও করা যায় না। একমাত্র শ্রদ্ধা দ্বারাই তাকে স্বীকার করা যেতে পারে। সিদ্ধান্তের দিক থেকে এই শ্রদ্ধা বেশ দুর্বল কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রবল। অর্থাৎ ঈশ্বর, তথা পরজন্মে বিশ্বাস, সমাজ ও ব্যক্তির নিকট শান্তি ও সংযম প্রচার করে। ঈশ্বর এবং ঐ পরজন্মকে মানুষের মেনে নেওয়ার এটাই যথেষ্ট কারণ।

(১) জ্ঞান —যথার্থ জ্ঞান তাকেই বলে যা সর্বদেশীয় এবং আবশ্যক। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপকরণ জোগাড় করে এবং মন স্বভাবানুযায়ী সেগুলিকে ক্রমবদ্ধ (সূত্রবদ্ধ) করে। অতএব আমরা যা জানি তা ঐ বস্তুর নিজের ভিতর কি আছে তা নয় (বস্তু যেমন আছে তাকে তেমনভাবে নয়), বস্তুর বা সত্তার সূত্রমাধ্যম সর্বদেশীয় আবশ্যিক প্রকাশকেই জানি। এই হলো কাণ্টের সন্দেহবাদ। আবার যা কিছু আমরা জানি তার ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতা, এই মতের জন্য তাঁকে অভিজ্ঞতাবাদীও বলা চলে। কিন্তু মন বাহ্যিক উক্তিকে গ্রাহ্য করে না, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিন্তা করে তাকে নিজের স্বভাবানুযায়ী গ্রহণ করে —এই অসম্বদ্ধ মনের যে নির্ণয় কর্ম তাকেই বলে বুদ্ধিবাদ। শুধু নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কাণ্ট প্রয়োগবাদ (অভিজ্ঞাতাবাদ), সন্দেহবাদ এবং বুদ্ধিবাদ তিনটিকেই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এইভাবে তিনি দার্শনিক বিচারকে একটা বৃহৎ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন।

(২) নিশ্চয় —জ্ঞান সব সময় নিশ্চিতরূপে প্রকাশিত হয়। ইচ্ছে করলে আমরা কোনো বিষয়কে স্বীকৃতি দিতে (বিধি করে নিতে) পারি অথবা নিষিদ্ধও করতে পারি। তবুও সব 'নিশ্চিত'ই জ্ঞান নয়। যে নিশ্চিত সর্বদেশীয় এবং আবশ্যক নয় তা সায়েন্স-সম্মত নয়। যদি তার কোনো ব্যতিক্রম থাকে তবে তা সর্বদেশীয় নয়। বৈপরীত্য থাকলে আবশ্যক নয়।

(৩) প্রত্যক্ষ —কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে হলে সেখানে বস্তু অর্থাৎ তার গুণ এবং আকার থাকা প্রয়োজন। বুদ্ধি একে এক রূপে অর্থাৎ দেশকালগত কাঠামোতে ক্রমবদ্ধ করে এবং তখনই আমরা কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি। আত্মা (=মন)-এর কেবল অনুভূতি হয়, তা প্রত্যক্ষভাবে পদার্থ বা বিষয়ে উপস্থিত

হতে পারে না, আবার বিষয়ও সরাসরি মন (আত্মা) পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। অবশেষে নিজের এক বিশেষ শক্তি —আত্মানুভূতি (intuition) —দ্বারা আত্মা বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে। তখন সে তা নিজের বাইরের দেশ-কালের রূপ দেখে, শব্দ শোনে।

দেশ, কাল—মনের গঠন এমনই যে দৃষ্টির সামনে ঐ রকম কোনো বস্তুর অস্তিত্ব না থাকলেও দেশ-কালকে সে প্রত্যক্ষ করে, অর্থাৎ, বস্তুকে দেশ-কালের সঙ্গে যুক্ত করে প্রত্যক্ষ করে না, বরং দেশ-কালকে স্বতন্ত্র বস্তুর পটে প্রত্যক্ষ করে। আমাদের মানস-ক্রিয়া কালের সীমার মধ্যে ঘটে, অর্থাৎ ক্রম-পর্যায়ে ঘটে এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দেশের সীমার মধ্যে ঘটে। অর্থাৎ আমরা সেই জিনিসই প্রত্যক্ষ করি যা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হয়। দেশ ও কাল বাস্তব সত্য নয় অর্থাৎ তাদের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ সত্তা নেই, এবং দেশ কাল বস্তুর কোনো গুণ বা সম্বন্ধ নয়। বিষয়কে যে রূপে বা যেভাবে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে তা ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়া বা নিজস্ব রূপ। দেশ ও কালের অনুভূতি জন্মে গূঢ়-চেতনা (intuition) থেকে, এটা বাহ্যিন্দ্রিয়ের বিষয় নয়। অর্থাৎ যদি দেশ-কালকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য আত্মানুভূতি (intuition বা গূঢ়-চেতনা)-বিশিষ্ট কোনো শক্তি না থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জগৎ দেশ-কাল-বিশিষ্ট হতো না। দেশ ব্যতীত কোনো বস্তুর ধারণা করা অসম্ভব আবার বস্তুহীন দেশও কল্পনা করা যায় না। অতএব বস্তু বা বাহ্য জগতের ধারণার জন্য দেশের অস্তিত্ব প্রয়োজন। কালের সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

(৪) লোকোত্তর (Transcendental—অতীন্দ্রিয়) —এইভাবে দেশ-কাল ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যা সম্পর্কহীন, তা অনুভব বা প্রয়োগ-যোগ্য বস্তু নয়; তা ঐসবের অর্থাৎ দেশ-কাল-ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে —সীমাপারী জিনিস। সীমাপারী বা ইন্দ্রিয়-অগোচর হলেও বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্ক আছে।

(৫) বস্তুর নিজত্ব (বস্তুত্ব Thing-in-itself) —বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। ইন্দ্রিয় তার সূচনাটি মনকে দেয়, মন নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বয়ং তার ব্যাখ্যা করে। ইন্দ্রিয়সমূহের সংযোগ হয় বস্তুর বাহ্যিক রূপের সঙ্গে। আবার মন বস্তু সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করে তা এই প্রত্যক্ষীকৃত রূপের ভিত্তিতে করে। অতএব বস্তু-সত্তার মধ্যে কি আছে সে জ্ঞান ইন্দ্রিয় বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করা যায় না, এটা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়। প্রত্যক্ষীকরণের দ্বারা বস্তুর আভাস আমরা পাই, বস্তুর সঙ্গে সেগুলির সম্বন্ধ আমরা জানতে পারি। কিন্তু বস্তুর নিজ সত্তার (বস্তুত্বের) জ্ঞান, আভাস বা সম্বন্ধ থেকে লাভ করা যায় না। বস্তু-সার অজ্ঞেয়; ইন্দ্রিয় তা জানতে পারে না। অবশ্য তার অস্তিত্বের সন্ধান অন্যভাবে পাওয়া যেতে পারে; তা হলো আত্মানুভূতি, যা ইন্দ্রিয়কে বলে: "তোমার গতির সীমা এই পর্যন্তই, এর বাইরে যাওয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই।"

(আত্মা) —আমরা আত্মার সাক্ষাৎকার করতে অক্ষম, কিন্তু তার সম্বন্ধে মনন করতে পারি। আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে যদি ধারণাসমূহকে স্মৃতির সঙ্গে সংযুক্তকারী এক স্বয়ংচেতন আত্মা না থাকত তবে জ্ঞান সম্ভব হতো না। কিন্তু আত্মাকে সরাসরি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ করা যায় না, কারণ তা লোকোত্তর এবং ইন্দ্রিয়-অগোচর।

এইভাবে লোকোত্তর পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব, বস্তু-সারও (Nomena) অজ্ঞেয়, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে তা আছে, অন্যথায় ইন্দ্রিয় তথা বিষয়-সম্বন্ধে যে অনুভূতি তা আধারশূন্য হবে —শেষ পর্যন্ত বহির্জগৎ এবং বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের পশ্চাতে কোনো বস্তু-সার অবশ্যই আছে যা অ-মনীয়, যা আমাদের ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে এবং আমাদের জ্ঞানের উপাদান প্রস্তুত করে। বস্তু-সারের আধার ব্যতীত সেই দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায় না যার ভিত্তির ওপর আমাদের সমস্ত জ্ঞান নির্ভরশীল।

কাণ্ট বুদ্ধি ও বোধের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। বোধ ইন্দ্রিয়-প্রাপ্ত অনুভূতিতে আশ্রিত। কিন্তু বুদ্ধি বোধের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং ইন্দ্রিয়-অগোচর জ্ঞান —যে জ্ঞানের এমন কোনো প্রত্যক্ষ বিষয় নেই যাকে শুদ্ধ বোধ রূপেই দেখা যায় —উপলব্ধি করতে চায়। বুদ্ধি বা মনের সাধারণ ক্রিয়াকে বোধ বলে। এটা আমাদের অভিজ্ঞতাকে সম্যক রূপে অর্থাৎ নিয়ম ও সিদ্ধান্ত অনুসারে একটিকে অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত করায় এবং আমাদের নিশ্চয়তা দান করে।

এই নিশ্চয়তাকে কাণ্ট ১২টি অংশে ভাগ করেছেন—

(i) সামান্য নিশ্চয় —যেমন, সমস্ত ধাতুতত্ত্ব,

(ii) বিশেষ নিশ্চয় —যেমন, কোনো গাছ, আম গাছ ;

(iii) একত্ব নিশ্চয় —যেমন, আকবর ভারতের সম্রাট ছিলেন।

এই তিনটি নিশ্চয়ের মধ্যে বস্তুসমূহকে গুণ-বিভাগ-যোগ, বহুত্ব, একত্বের রূপে দেখা যায়।

(iv) স্বীকারাত্মক নিশ্চয় —যেমন, উত্তাপ এক প্রকার গতি ;

(v) নকারাত্মক নিশ্চয় —যেমন, মনের বিস্তারের পরিমাণ নেই ;

(vi) অসীম নিশ্চয় —যেমন, মন অ-বিস্তৃত।

এই তিনটি নিশ্চয়ে বাস্তবিকতা (ভাব), অভাব এবং সীমার রূপের মধ্যে গুণ-বিভাগ দেখানো হয়।

(vii) স্পষ্ট নিশ্চয় —যেমন, দেহ ভারী,

(viii) অশংসাত্মক নিশ্চয় —যেমন, বাতাস গরম থাকলে তাপমান বাড়বে ;

(ix) বিকল্পাত্মক নিশ্চয় —যেমন, দ্রব্য ঘন, তরল এবং গ্যাসীয় হয়।

এই তিনটি নিশ্চয় নিত্য-সম্বন্ধ, আধার-সম্বন্ধ এবং কার্য-কারণ ও সমুদয়-সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করে।

(x) সন্দেহাত্মক নিশ্চয় —যেমন, "হতে পারে এটা বিষ ;"

(xi) আগ্রহাত্মক নিশ্চয় —যেমন, "এটা অবশ্যই বিষ ;"

(xii) সুপরীক্ষিত নিশ্চয় —যেমন, প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে।

এই তিনটি নিশ্চয় সম্ভব-অসম্ভব, সত্তা-অসত্তা, আবশ্যকতা-সংযোগ প্রভৃতি স্থিতির ব্যাখ্যা করে। এগুলি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, অতিক্রমী নয়।

বস্তু-সার, অমর আত্মা, স্বাধীন ইচ্ছা, ঈশ্বর যদি আমাদের বোধের বিষয় নাও হয়, তবু তা থেকে প্রমাণ করা যায় না যে এগুলি নেই। আসলে আমাদের বুদ্ধি এগুলির ব্যাখ্যা করতে অক্ষম, কারণ তা তুরীয় পদার্থ। তবু আমাদের নৈতিকতাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করে, নতুবা অহিংসা, সত্যভাষণ, চুরি না করা প্রভৃতি নীতি পালন করাবার জন্য কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, কাণ্টও বিশপ বার্কলের মতো কাজই করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য বার্কলে যেখানে 'বোধ'-কে অবলম্বন করে বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন তথা ভাববাদের সমর্থন করেছেন কাণ্ট সেখানে বাস্তব জ্ঞানের সত্যতার ওপর সন্দেহ করে তার অস্তিত্বকে বিপদগ্রস্ত করেছেন ; এবং ঈশ্বর, আত্মা, মন তথা বস্তু-সারকে লোকোত্তরে স্থান দিয়ে ঈশ্বর-আত্মা-ধর্ম-আচার (এবং বর্তমান সামাজিক কাঠামো)-কে শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা 'সিদ্ধ' করতে চেয়েছেন।

কিন্তু বুদ্ধি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাকে গৌণ করে কাণ্ট কি তাঁর অভিপ্রায়ে সফল হতে পেরেছিলেন ? সম্ভবত যুক্তি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যার কোনো যোগাযোগ নেই সে এ রকম বুঝতে ভুল করে ; কিন্তু কাণ্টের তীক্ষ্ণ তর্কের কি পরিণাম হয়েছিল, তা মার্কসের সমকালীন জার্মান কবি হেনরিখ হাইনের কথাতেই শুনুন—

"তখন (কাণ্টের পরে) থেকেই চিন্তাশীল জগৎ থেকে ঈশ্বর নির্বাসিত হয়ে যান। তাঁর মৃত্যু সংবাদ জনসাধারণের নিকট পৌছাতে সম্ভবত কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা তো এখানে দেরীতে শোক প্রকাশ করছি। আপনারা হয়ত ভাবছেন এখন আর শোক প্রকাশের কিছু নেই, সেই জন্যই কি আপনারা নিজের নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছেন ?

"দোহাই, এখনই যাবেন না ! এখন এক অতীত বিষয়ের অভিনয় হচ্ছে। বিয়োগান্ত নাটকের শেষে এক প্রহসন প্রদর্শিত হবে।

"এখন পর্যন্ত ইমানুয়েল কাণ্ট এক গম্ভীর, নিষ্ঠুর দার্শনিকের ভূমিকায় সামনে এসেছেন। তিনি স্বর্গের দুর্গ ভেঙে ফেলে সমস্ত সৈন্যের অসির ফলকের তীক্ষ্ণতা নষ্ট করে দিয়েছেন। বিশ্বের শাসক (ঈশ্বর) অচেতন হয়ে স্বীয় রুধির স্রোতেই ভাসমান। সেখানে দয়ার নামও নেই। পিতৃতুল্য শুভত্ব এবং বর্তমানের দুঃখকষ্টের জন্য ভবিষ্যতে যে সুফল মিলবে তার অবস্থা ঐ রকমই। আত্মার অমরত্বও ঐ-ভাবেই নিজের প্রহর গুণছে ! তারও কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণা ! আর বৃদ্ধ ভগবানদাস পার্শ্বেই দণ্ডায়মান। তাঁর ছাতা তাঁর হাতে, তিনি এক শোকার্ত দর্শক, ব্যথাজনিত স্বেদে তাঁর মুখমণ্ডল সিক্ত, গণ্ডে অশ্রুর ধারা।

"তবে কাণ্টের অন্তরও দ্বিধাগ্রস্ত ; নিজেকে একজন মহান্ দার্শনিক ও সৎ ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য তিনি কিছুটা নির্লিপ্ততা এবং কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে চিন্তা করেছেন—

"বৃদ্ধ ভগবানদাসের জন্য একজন দেবতা প্রয়োজন, নয়ত বেচারী সুখী হতে পারবেন না, বস্তুত মানুষকেও তো এই পৃথিবীতে সুখী করা দরকার। সাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধির চাহিদাও এই।

"ভালো কথা, উদ্বেগ শুধু এইটুকুই! ব্যবহারিক বুদ্ধিকে কোনো ঈশ্বর বা দ্বিতীয় কোনো অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে দিলেই তো হয়।

"পরিণাম স্বরূপ কাণ্ট সৈদ্ধান্তিক এবং ব্যবহারিক বুদ্ধির ভেদের ওপর তর্ক-বিতর্ক করেছেন এবং ব্যবহারিক বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরের ওপর একটা মসৃণতা দান করেছেন, সৈদ্ধান্তিক বুদ্ধি যাকে একটা শবদেহে পরিণত করেছিল।" (Heine : *Works* ; vol. V.)

'শুদ্ধ-বুদ্ধি' লেখার পর 'ব্যবহারিক বুদ্ধি' লিখে কাণ্ট যে মসৃণতা দান করতে চেয়েছিলেন, হাইনে এখানে তার সত্য-স্বরূপকে উদ্ঘাটন করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে।

§২. সন্দেহবাদ

হিউম (১৭১১-১৭৭৬ খৃঃ)—ডেভিড হিউম স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায় কাণ্টের ১৩ বৎসর পূর্বে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে। হিউম আইন অধ্যয়ন করেন। প্রথমে তিনি জেনারেল সেণ্ট ক্লেয়ার এবং পরে লর্ড হার্টফোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন এবং অবশেষে ১৭৬৭-১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডের উপমন্ত্রী বা আণ্ডার-সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। হিউম শুধু শাসক শ্রেণীর সদস্যই নয়, নিজেই ছিলেন একজন শাসক এবং বিত্তবান শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত। মধ্য তথা উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত লেখক সর্বদাই দেখাতে চান যে, তিনি ছিলেন শ্রেণী এবং শ্রেণীস্বার্থের অনেক ঊর্ধ্বে, অবশ্য এর ব্যতিক্রমও কিছু আছেন। কোনো কোনো লেখক সব জেনেশুনে কখনো বা অজ্ঞাতসারেও সেই শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি করেন যাতে তাঁর 'ডাল-ভাত' জোগাড় হয়। আমরা দেখেছি যে বিশপ বার্কলে কিভাবে যুক্তিবাদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রত্যক্ষ—অনুমেয়—বুদ্ধি-গম্য—বস্তু অস্বীকার করে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিয়ে ভাববাদকে সমর্থন এবং আকর্ষণীয় করেছিলেন। মানুষ যখন বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কল্পনাশ্রিত ভাববাদকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নিয়ে চোখ বুজে ঝিমোতে শুরু করেছিল, তখন ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, দেবতা ইত্যাদিকে আবার নিঃশব্দে সামনে এনে বসিয়েছিল, বার্কলের এই চেষ্টা কাণ্টের নিকট কিছুটা দুর্বল এবং পরিত্যাজ্য বলে মনে হয়েছিল।

তিনি একে আরও উর্ধ্বে উঠিয়েছেন। বস্তুবাদ সাধারণের বুদ্ধিগম্য ও আংশিক সত্য, কিন্তু বস্তু-সারই আসল সত্য, যার সত্তাকে একমাত্র 'শুদ্ধ-বুদ্ধি' দ্বারাই প্রমাণ করা যায়। (বোধের দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু থেকে অধিক সত্য হলো শুদ্ধ বুদ্ধিগম্য বস্তু সার।) তর্ক, অভিজ্ঞতা, বোধ প্রভৃতি সাধারণ বুদ্ধির ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারিত করে, তার গতি রোধ করে, কাণ্ট বোধের ওপরে এক সুরক্ষিত ক্ষেত্র নির্মাণ করেছেন এবং এই প্রশান্ত দ্বন্দ্ব-বিরোধ-রহিত স্থানে ঈশ্বর-আত্মা-ধর্ম-নীতি (ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রাচীন সামাজিক-ব্যবস্থা) প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই-ই হলো কাণ্টের বিস্ময়কর প্রতিভা।

আসুন, এখন আমরা ইংলণ্ডের টোরী শাসক (আণ্ডার-সেক্রেটারী) হিউমকেও পর্যালোচনা করি। কাণ্টের পূর্বে বিজ্ঞানের জন্য মুক্ত বুদ্ধির বিচার প্রবাহ থেকে প্রাচীন মূল্য-বোধকে রক্ষা করার জন্য দার্শনিকগণের প্রচেষ্টা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং এও বুঝেছিলেন যে বস্তু-জগৎ এবং তার থেকে প্রাপ্ত সত্য এত প্রবল যে তার মোকাবিলা দেকার্ত, লাইবনিৎজ, বার্কলে যেভাবে করেছিলেন সেভাবে করা যাবে না। বস্তুবাদকে ভুল বলে প্রমাণ করতে হিউমও একমত ছিলেন, কিন্তু দৃশ্যমান বস্তুকে অস্বীকার করা তথা ইন্দ্রিয়ানুভবের ওপরে কোনো বস্তু—ভাবকে প্রমাণিত করার দায় গ্রহণ করা তিনি অনাবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। হিউম পুঁজিবাদী যুগের রাজনীতিজ্ঞদের একজন বিচক্ষণ পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি বললেন—বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবেন না, ভাববাদকে প্রতিষ্ঠিত করে যে ঈশ্বর বা ধর্মকে নিয়ে আসতে চান—সমাজ কাঠামোকে বিপ্লবের ঝড় থেকে বাঁচাবার জন্য তার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু মানুষ তো সেই ভাববাদের প্রেক্ষাপটেই আমাদের সততায় সন্দেহ করতে পারে, তাই নিজেদের সৎ প্রমাণ করাব জন্য ভাববাদের ওপরও সামান্য আঘাত হানা দরকার; এইভাবে নিজেকে নিরপেক্ষ রেখে উভয় বাদের মধ্যস্থতা করতে হবে। একবার যদি আমি বস্তুবাদের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করে দিতে পারি এবং তার বাহ্যিক প্রকাশকে আটকে দিতে পারি তাহলে পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন জনতা হয়ে পড়বে ভাগ্যনির্ভর। আর এই সন্দেহবাদ আমাদের কি-বা ক্ষতি করবে? —তাতে আমাদের ক্লাইভ (= ক্ষমতা)-ও মিথ্যা হয়ে যাবে না, মাখন-রুটি-শ্যাম্পেনও নয়।

এখন এই দুধকে দুধ, জলকে জল প্রতিপন্নকারী রাজমন্ত্রীর দার্শনিক কল্পনা বিলাস লক্ষ্য করুন।

(১) **দর্শন**—যা কিছু আমরা জ্ঞাত হই তা আমাদের মানসিক ছাপ—সংস্কার। বস্তু বা অবস্তুকে সিদ্ধ করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় যেটুকু গ্রহণ করে ততটুকুই আমরা জানতে পারি, আবার সেখানেও মাত্র সম্ভাবনা সম্বন্ধেই আমরা বলতে পারি। জ্ঞান অর্জনের জন্য এই অনুভব (প্রত্যক্ষ অনুমান)-এর অতিরিক্ত কোনো উপায় আমাদের নেই।

(২) **স্পর্শ** (Impressions)—জ্ঞানের সব জিনিসই বাইরে ও ভিতরে বস্তুর স্পর্শ—ছাপ থেকে প্রাপ্ত হই। দেখা, অনুভব করা, প্রেম বা শত্রুতা, সংকল্প প্রভৃতি আসক্তি বা মনোভাব যখন আত্মার মধ্যে প্রথম প্রকটিত হয় তখনই আমরা সর্বাপেক্ষা সজীব সংযোগের স্পর্শ পাই। বাহ্যিক স্পর্শ বা অনুভূতি আত্মার মধ্যে অজ্ঞাত কারণেই উৎপন্ন হয়। আভ্যন্তরীণ স্পর্শ হয় প্রধানত বিচার থেকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ওপর স্পর্শের একটা প্রতিবেদন সৃষ্টি হয় এবং আমরা গরম-ঠাণ্ডা, সুখ-দুঃখ অনুভব করি।

(৩) **বিচার**—স্পর্শের পরে জ্ঞানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো ধারণার। আমাদের ধারণা কোনো অসম্বদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণ নয়। পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার সময় তার মধ্যে এক বিশেষ নিয়ম ও ব্যবস্থার শৃঙ্খলা দেখা যায়। সেই ঐক্যের সূত্রকেই ধারণা-সম্বন্ধ বলা যায়।

(৪) **কার্য-কারণ**—কারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু হলো কার্য। কার্যের মধ্যে কারণকে কখনও পাওয়া যায় না। নিরীক্ষণ এবং অনুভব থেকে আমাদের কার্য-কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। কার্য-কারণ সম্বন্ধে একটির পর দ্বিতীয়টি আসে, কারণ সর্বদাই কার্যের পূর্ববর্তী এবং কার্য সর্বদাই কারণের পশ্চাদ্‌বর্তী—এখানে আমরা একটি ঘটনার পর অন্যটি ঘটতে দেখি।

(৫) **জ্ঞান**—আমরা শুধু প্রত্যক্ষই করি; কোনো বস্তু সম্বন্ধে এর থেকে বেশী—সম্পূর্ণ জ্ঞানার্জন করেছি এ ধারণা ভুল। যে বস্তু প্রত্যক্ষ করি তার কোনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নেই। বস্তুর বাহ্যিক আকারের এক অংশ মাত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। দার্শনিক বিচার বা আত্মানুভূতির দ্বারা তার থেকে জ্ঞান লাভের আশা করা যায় না, কারণ দার্শনিক নির্ণয় সাধারণ অভিজ্ঞতার সংশোধিত বা নিয়মবদ্ধ প্রতিবিম্ব মাত্র। আমাদের জ্ঞান আসলে এত অগভীর, ভাসা-ভাসা যে তাতে কোনো জিনিসের যথার্থ রূপ নির্ধারণ করা যায় না।

(৬) **আত্মা**—"যখন আমি খুব নিকট থেকে যাকে 'নিজের আত্মা' বলা হয় তাকে বুঝবার চেষ্টা করি তখন তার সমতুল্য অন্য অনুভূতি হয়। সেখানে কখনও নিজের আত্মাকে ধরতে পারি না।" চিন্তনের ফলে ঠাণ্ডা-গরম, আলো-আঁধার, রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির অনুভব হয়, এ ছাড়া অন্য কোনো শুদ্ধ অনুভব মেলে না। কাজেই এইভাবে আত্মাকে প্রমাণ করা যায় না।

(৭) **ঈশ্বর**—ঈশ্বরকে যখন প্রত্যক্ষ করা যায় না তখন তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ কি? তাঁর গুণাদি। কিন্তু তাঁর স্বভাব, আজ্ঞা, গুণাদি ব্যাপারে কিছু বলার কোনো উপায় আমাদের নেই। কার্য থেকে কারণের অনুমান দ্বারা তাকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। মিস্ত্রীকে গৃহনির্মাণ করতে দেখি। তাই সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা যে কোনো সৌধ দেখে বলতে পারি যে এটা কোনো মিস্ত্রীর সৃষ্টি। কিন্তু আমরা তো স্ব-চক্ষে বিশ্বরূপ কার্যকে ঈশ্বর-রূপ কারণ দ্বারা সৃষ্টি হতে দেখিনি,

কাজেই গৃহ এবং মিস্ত্রীর উপমা দিয়ে ঈশ্বরকে প্রমাণ করা অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত যেরূপ কার্যকে যে জাতীয় কারণ থেকে উৎপন্ন হতে দেখি, তার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ঈশ্বর পূর্ণ, অচল, অনন্ত হওয়ায় নিরন্তর পরিবর্তনশীল —মরণ ও সৃজনশীল —মন কেমন করে জানবে যে ঈশ্বরের অমুক গুণ পূর্বে ছিল। কাজেই মানুষ তার সীমিত জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে অনুমান করতে পারে না ; যদি নিজের অজ্ঞাতসারে এই অনুমান করার আগ্রহ জাগেও তবে তাকে দর্শন বলা যায় না!

বিশ্বের স্বভাব থেকে ঈশ্বরের স্বভাব অনুমান করা বিরাট পণ্ডশ্রমই হবে। কার্যের গুণানুসারে আমরা কারণের গুণ অনুমান করতে পারি। কার্য-জগৎ অনন্ত নয়, সান্ত, অনাদি নয়, স-আদি (এর আরম্ভ আছে), অতএব ঈশ্বরকেও সান্ত এবং স-আদি বলেই মেনে নেওয়া উচিত। জগৎ অপূর্ণ, সংঘাত, ক্রূরতা এবং বৈষম্যে ভরা। অথচ ঈশ্বর অনন্তকাল সাধনা করে অপেক্ষাকৃত সুন্দর এক বিশ্ব সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছিলেন। অতএব তর্কের খাতিরে বলা যায় এ রকম জগতের কারণ ঐ ঈশ্বর নিজেই নিষ্ঠুর, অপূর্ণ, বৈষম্য-প্রেমিক।

আরও বলা যায় যে মানুষের শারীরিক, মানসিক অবস্থার জন্য কোনো সদাচার-দুরাচার নয় ভগবানই দায়ী।

(৮) ধর্ম —অনুমান-নির্ভরতা, কৌতূহল, অর্থাৎ সত্যতার প্রতি শুদ্ধ আকর্ষণ যদিও ধর্ম এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্ম দেয়, কিন্তু এর প্রধান প্রধান উৎস হলো, সুখ-চিন্তা, ভয়, প্রতিশোধ-লিপ্সা, পানাহার এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় উপাদান সংগ্রহের বাসনা।

হিউম যদিও বার্কলে, কাণ্ট প্রভৃতির তর্কের ওপর যথেষ্ট আঘাত হেনেছেন এবং দর্শনকে ধর্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু অন্যদিকে জ্ঞানকে অসম্ভব বলে মেনে তিনি কোনো ইতিবাচক দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেননি। দর্শনের প্রয়োজন কেবলমাত্র সন্দেহ সৃষ্টির জন্য হওয়া উচিত নয়, কেন না জীবনের বিকাশে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। (সাধু শান্তিনাথও তাঁর *Critical Examination of the Philosophy of Religion* গ্রন্থে হিউমকেই অনুসরণ করেছেন।)

§ ৩. বস্তুবাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্তুবাদী দার্শনিকের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন —হার্টলি (১৭০৪-১৭৫৭ খৃঃ), লা মেট্রি (১৭০৯-১৭৫১ খৃঃ), হেলভেসিয়াস (১৭১৫-১৭৭১ খৃঃ), দ্য এ্যালেমবার্ট (১৭১৭-১৭৮৩ খৃঃ), দ্য হোলবাস (১৭২৩-১৭৮৯ খৃঃ), দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪ খৃঃ), প্রিস্টলি (১৭৩৩-১৮০৪ খৃঃ), ক্যাবানিস (১৭৫৭-১৮০৮ খৃঃ)।

কেবলমাত্র দার্শনিকেরাই বস্তুবাদের সমর্থক ছিলেন না, বিজ্ঞানীরাও এগিয়ে

এসেছিলেন বস্তুবাদের সমর্থনে। ফলে এই বস্তুবাদী অস্ত্র দার্শনিকগণের সহস্র বুদ্ধিবাদী তর্ককে খণ্ডন করতে সমর্থ হয়েছিল। এই জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্তুবাদের অগ্রগতি দার্শনিকদের সংখ্যা বা কতজন শিক্ষিত মানুষ এর সমর্থক তার ওপর নির্ভর করেনি।

হার্টলি মনকে শরীরেরই একটা অংশ বলে মেনেছেন; দে-কার্ত যদিও ছিলেন দ্বৈতবাদী, ঈশ্বর-বিশ্বাসী গোঁড়া ক্যাথলিক খৃষ্টান, কিন্তু তাঁর দর্শন অজ্ঞাতভাবেই ফ্রান্সে বস্তুবাদী চিন্তার প্রসারে সহায়তা করেছিল। নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীর দেহ-সঞ্চলন যান্ত্রিক বলে দে-কার্ত মন্তব্য করেন। যদি প্রাণীর প্রত্যঙ্গগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় থাকে তাহলে আত্মা ছাড়াই শুধু ইন্দ্রিয়জাত উত্তেজনা দ্বারাই সে অঙ্গ-সঞ্চলন করতে পারবে। এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে লা মেট্রি এবং আরও কয়েকজন ফরাসী দার্শনিক আত্মার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করেন এবং বলেন যে বাস্তব উপাদানে তৈরী সমস্ত সজীব বস্তু চলতে-ফিরতে সক্ষম স্বয়ং এক যন্ত্র। "দার্শনিক দে-কার্তের মতে যখন অন্যান্য প্রাণীমাত্রেই আত্মা ব্যতীতই চলতে-ফিরতে, ভাবতে বুঝতে সক্ষম, তখন মানুষের ক্ষেত্রেও আত্মার কি প্রয়োজন? সমস্ত প্রাণী একই বিকাশের নিয়ম অনুসরণ করে, পার্থক্য শুধু তাদের বিকাশের মাত্রাতে।" (লা মেট্রি) ক্যাবানিসের গ্রন্থ ফ্রান্সে বস্তুবাদের প্রচারে সহায়তা করেছিল। তাঁর কিছু উক্তি খুব বিখ্যাত —"শরীর ও আত্মা একই পদার্থ।" "মানুষ জ্ঞানরূপ দড়ির গ্রন্থি-স্বরূপ।" "পিত্ত থেকে যেমন রসক্ষরণ হয়, তেমনি বুদ্ধিও বিচার-রূপ রস নিঃসরণ করে।" "বস্তু-জগতের নিয়ম, মানসিক এবং নৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।"

বস্তুবাদ সম্পর্কে একটা অভিযোগ ছিল যে এই মতানুসারে ঈশ্বর ও পরলোকের ভয় না থাকায় পৃথিবীতে দুরাচার বৃদ্ধি পাবে, মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে অন্যের ধন-সম্পত্তি লুঠ করতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী এর জবাব বস্তুবাদীগণের আচার-বিচার দ্বারাই দিয়েছিল। এই বস্তুবাদীগন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সামাজিক অসাম্যের সব থেকে বেশী বিরোধী ছিলেন, ব্যক্তি নয় সারা সমাজের কল্যাণের ওপরেই তাঁরা সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। হেলভেসিয়াস বলেছেন, "প্রবোধপূর্ণ আত্মস্বার্থ নৈতিকতার সব থেকে দৃঢ় ভিত্তি হতে পারে।"

দ্বাদশ অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক

অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল বিজ্ঞানের প্রারম্ভিক যুগ, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্বেকার সঙ্গে তার বিকাশের বিস্তার এবং উন্নতির কোনো তুলনা চলে না। বিজ্ঞান (Science) এখন আর ক্ষীণ ঝর্ণাধারা নয় —এখন তা এক মহানদীর রূপ ধারণ করেছিল। বিজ্ঞান এখন আর দর্শনের মুখাপেক্ষী নয়, বরং দর্শনের নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন ছিল এবং এই সহায়তা ছাড়া তার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার ক্ষমতা দর্শনের ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর জ্যোতিষ কেবলমাত্র গ্রহ-উপগ্রহের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্ণতর করেনি, সূর্যের দূরত্ব আরও শুদ্ধভাবে নির্ণয় করেছিল। স্পেকট্রোস্কোপের সাহায্যে সূর্য ও নক্ষত্রগুলির সাংগঠনিক উপাদান, তাদের তাপ, ঘনত্ব এবং সেগুলির দূরত্ব জানা সম্ভব হয় এবং নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রচলিত কতকগুলি ভুল ধারণা ও মিথ্যা বিশ্বাস দূর হয়ে যায়।

গণিতের ক্ষেত্রে লোভাচেবসকি, রীমান প্রভৃতি গণিতজ্ঞ অনিউক্লিডীয় (Non-Euclidean) তথা বাস্তব জ্যামিতি আবিষ্কার করেন।

পদার্থ-বিজ্ঞানে ইউল, হেলমহোলংজ, কেলভিন, এডিংটন নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। বৈজ্ঞানিকগণ শুধু পরমাণুকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, এমনকি টমসন পরমাণুকে ভেঙে ফেলে ইলেকট্রন পর্যন্তও পৌঁছেছেন। বিদ্যুতের সঙ্গে পরিচয়ই শুধু নয়, এই শতাব্দীর শেষে পথঘাট ও গৃহসমূহও বিজলী বাতিতে আলোকিত করা হয়।

রসায়ন-শাস্ত্রে পরমাণুর ওজন পরিমাপ করা হতে থাকে এবং হাইড্রোজেনকে একক ধরে নিয়ে পরমাণুর ভর পাওয়া গেলো। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে Friedrich Wohler (ফ্রেডরিস ভোলার) শুধুমাত্র প্রাণীদেহেই প্রাপ্য ইউরিয়া (urea)-কে কৃত্রিম রূপে প্রস্তুত করে প্রমাণ করে দিলেন যে, বস্তুতত্ত্ব প্রাণী, অ-প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আনুমানিক ৩০টির মতো মৌল রাসায়নিক উপাদান জ্ঞাত হয়েছিল, পরে তা ৮০টি পর্যন্ত বর্ধিত হয়। (বর্তমানে মৌল উপাদানের সংখ্যা ১০৫ —সম্পাদক।)

প্রাণীশাস্ত্রে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) এবং অন্যান্য জীবাণুর

সন্ধান এবং তাদের গুণাদি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে বর্ধিত করে এবং এ বিষয়ে লুই পাস্তুরের গবেষণা, ক্ষত চিকিৎসায় তথা খাদ্যবস্তু সংরক্ষণে সাহায্য করে। ডেভি অচৈতন্য করার ঔষধ আবিষ্কার করে অস্ত্রোপচার সহজসাধ্য করেন। শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইনের বিবর্তনবাদ (প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশের তত্ত্ব) চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করে এবং জড় ও চেতনের সীমাকে নিকটতর করে।

এইভাবেই উনবিংশ শতাব্দী বিশ্বমানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দেয়। যা থেকে একদিকে বস্তুবাদের পিছনে প্রবল সমর্থন সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে দার্শনিকগণের অসুবিধা বেড়ে যায় বহু পরিমাণে। ফিকটে, হেগেল, শোপেনহারের মতো ভাববাদীগণ বস্তুবাদেরও পরে ভাববাদে পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। শেলিঙ, নীৎশে, দ্বৈতবাদী যুক্তিবাদের আশ্রয় নিয়ে বস্তুবাদের প্রসার রোধ করতে চান। স্পেন্সার, হিউমের মিশনকে সমর্থন করেন ও নিজের অজ্ঞেয়তাবাদ দ্বারা সমাজের আর্থিক-সামাজিক কাঠামোকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই শতাব্দীই মার্কসের ন্যায় প্রখর দার্শনিকের জন্ম দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, যিনি ভাববাদ নয়, বিজ্ঞানের (Science) সাহায্যে নিজের দর্শনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তার দ্বারা দর্শনকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

§ ১. ভাববাদ

১. ফিকটে (১৭৬৫-১৮১৪ খৃঃ)

যোহান গণ্টলীপ ফিক্‌টে (Fichte) জার্মানীর স্যাক্সনীতে এক দরিদ্র তন্তুবায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পরমতত্ত্ব ---কাণ্ট অনেক চেষ্টায় বস্তু-সারকে (thing-in itself) বুদ্ধির অগম্য পদার্থ বলে প্রমাণ করেন। ফিকটে বলেছেন, বস্তু-সারও মনের বাইরের কোনো বস্তু নয়, মনেরই সৃষ্টি। কেবলমাত্র সব অভিজ্ঞতা বা মনের আকারই "পরম-আত্মা (Absolute Self) থেকে উৎপন্ন হয় না, সেই উৎপত্তিতে ব্যক্তিগত মননেও তা অংশ গ্রহণ করে।" পরমাত্মা নিজেকে জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞেয় (বিষয়), এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন ; কেন না আত্মার নৈতিক বিকাশের জন্য এমন বাধাসৃষ্টিকারী পদার্থের প্রয়োজন, যাকে আত্মা নিজের নৈতিক প্রযত্ন দ্বারাই অতিক্রম করতে পারে। এই কারণেই পরমাত্মাকে বহু আত্মায় বিভক্ত হতে হয় ; তা না হলে তারা তাদের কর্তব্য পূর্ণ করার সুযোগ পায় না। আত্মা বহু হলেও সেগুলি একটি নৈতিক বিধানকে প্রকাশ করে, যাকে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলে। ফিকটের 'পরম' (Absolute) স্থির নয়, সজীব এবং গতিশীল।

ঈশ্বরকে নিজের মনের মতো করে সব দার্শনিক গড়ে নিতে চান, কিন্তু সকলেরই প্রচেষ্টা বেচারা ভগবানকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা।

(১) শ্রদ্ধাতত্ত্ব —কাণ্ট নৈতিক বিধি (যে আচরণ তোমাকে অবশ্যই করতে হবে [ক্যাটেগরিকাল ইমপারেটিভ]) সম্পর্কে বলেছেন —ঐ তত্ত্বে বিশ্বাস করলে (Determinism) আমরা সন্দেহবাদ, বস্তুবাদ এবং নিয়তিবাদ থেকে রক্ষা পাই। আমরা নৈতিক বিধানে বিশ্বাস করি বলেই তা আমরা জানাতে পারি। সেই আচরণই সত্য যা আমাদের স্বাধীন করে এবং আমাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করে। কাণ্ট ও ফিকটের এই দর্শনানুযায়ী আমি তো এখন জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করে শুধু দৃঢ় বিশ্বাসেই স্বাতন্ত্র্য পেতে পারি। কারণ বিশ্বাস করা না করাও তো আমার স্বাধীনতা! অথচ দু-তিন হাজার বছর আগে কিছু মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নিয়মসমূহ, যা তারা মূলত আত্মস্বার্থরক্ষার জন্যই করেছিল, তাকে না মেনে নিলে কিন্তু নিজের স্বাধীনতাকে হারিয়ে ফেলি!! আর যে সন্দেহবাদ, বস্তুবাদ আমাদের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু, স্বাধীনতার শ্রদ্ধার ওপর কুঠারাঘাত করে, সেইগুলিই কিন্তু বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা নির্দেশিত পথে আমাদের চলতে শেখায়!!!

আত্মার আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু তাকে আশ্রয় দেওয়াই নয়, দর্শনের উদ্দেশ্য তাকে গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে বসিয়ে দেওয়া। এবং তাকে বাস্তব পৃথিবী ও সেখানকার অভিজ্ঞাতার ক্ষেত্র ত্যাগ করানো যাতে দার্শনিক নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হন।

(২) যুক্তিবাদ —বিজ্ঞানের (Science-এর) যুগে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করলে নিজের দর্শন উপহাসের বস্তু হয়ে পড়বে; এই জন্য ফিকটের পরিভাষায় দর্শন তাই সার্বভৌম বিজ্ঞান, সায়েন্সের সায়েন্স। প্রথমেই প্রয়োগ এবং যুক্তিবাদের ওপর আঘাত করে তিনি ক্রমাগত বলে চলেছেন দর্শন যদি প্রয়োগের (অভিজ্ঞতার) সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তা মিথ্যা; কারণ দর্শনের কাজই হলো অনুভবকে আকৃতি দান এবং বুদ্ধির আবশ্যক ক্রিয়া দ্বারা তাকে ব্যাখ্যা করা। যিনি পরম-আত্মাকেই পরমার্থ এবং নৈতিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকেই আত্মিক স্বাধীনতার একমাত্র পথ বলে মনে করেন, তাঁর প্রয়োগ এবং বিজ্ঞানের প্রতি এই মৌখিক সমর্থন লোক-দেখানো বাহাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) আত্মা —আত্মা, পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত, তারই ক্রিয়ার প্রকাশ এবং নির্দিষ্ট সীমায় বদ্ধ। বিচার করে দেখলে তা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং মননের বাইরে যেতে অক্ষম এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সে বিশ্ব-প্রয়োজন তথা ঈশ্বরকে অতিক্রম করে যেতে পারে না।

(৪) ঈশ্বর —ফিকটে নৈতিক বিধানের ওপর কাণ্টের মতোই গুরুত্ব দিয়েছিলেন এ কথা আগেই বলেছি। নৈতিক বিধানের কাঠামো বজায় রাখবার জন্য একটি বিশ্ব-প্রয়োজন বা ঈশ্বর দরকার। আসলে, নৈতিক বিধান হলো বিত্তবান

শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র এবং এর সমর্থন যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে করা যায় না; সেইজন্য ঈশ্বরের অবলম্বন দরকার। ফিকটে তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন, নৈতিক বিধানের জন্য ধর্ম-বিশ্বাসেরও দরকার। বিশ্বব্যাপী নৈতিক বিধান (ধর্ম-নিয়ম) এবং ঐ বিধানের পরিণাম সম্বন্ধে বিশ্বাস ছাড়া আচরণ-বিধি সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। সব বিশ্বাস এবং সততার কষ্টিপাথর হলো অন্তরাত্মার নির্দেশ। এই নির্দেশ অভ্রান্ত। অন্তরাত্মার নির্দেশ হলো আমাদের অন্তরে স্থিত ভগবানের নির্দেশ। আধ্যাত্মিক জগৎ এবং আমরা এই দুইয়ের মধ্যে ঈশ্বর বিচরণ করেন এবং অন্তরাত্মার নির্দেশের রূপে ঈশ্বর নিজেরই বাণী পাঠান।

২. হেগেল (১৭৭০-১৮৩১ খৃঃ)

জর্জ উইলহেলম ফ্রেডরিস হেগেল জার্মানীর স্টুটগার্টে জন্মগ্রহণ করেন। টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধর্মশাস্ত্র এবং দর্শন অধ্যয়ন করেন। প্রথমে তিনি জেনায় দর্শনের অধ্যাপক হন পরে ১৮০৬ থেকে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বুমবের্গ-এর একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। এরপর আবার তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন, প্রথমে হাইডেলবার্গে এবং পরে বার্লিনে প্রফেসর ছিলেন। ৬১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

[বিকাশ]—আধুনিক যুগে যে অ-বস্তুবাদী দর্শনের নতুন ধারা আরম্ভ হয়, হেগেলের দর্শনে তা চরম সীমায় পৌঁছেছিল। তাঁর দর্শনের বিকাশে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, স্পিনোজা এবং কাণ্টের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। মন (= বিজ্ঞান) সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা —এই তত্ত্ব তিনি কাণ্টের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের ব্যক্তিগত মন বিশ্ব-মনের অংশ। ঐ বিশ্ব-মন বিশ্বকে অস্তিত্বে আনবার জন্য আমাদের দিয়ে মনন (অভিজ্ঞান) করায়। আত্মা এবং বস্তু এক অনাদি পদার্থের দুই রূপ —এই তত্ত্ব তিনি স্পিনোজার থেকে নিয়েছেন। আবার প্লেটোর দর্শন থেকে নিয়েছেন : (১) বিজ্ঞান, সামান্য বিজ্ঞান, নৈতিক মূল্য এবং পূর্ণতার জগৎই একমাত্র বাস্তব। ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য জগৎও সেই লোকোত্তর অসীম জগৎ থেকে উদ্ভূত। (২) আত্মিক জগৎ তথা পরমাত্মা স্বেচ্ছাপূর্বক সীমিত হওয়ার পরিণাম হলো বস্তু-জগৎ, অর্থাৎ আত্মিক জগতের উচ্চস্থান থেকে নিম্নে পতন। কিন্তু এই ভাববাদী পতনের সঙ্গে সঙ্গে হেগেল অ্যারিস্টটলের আত্মিক বিকাশকেও নিতে চেয়েছেন, যা বিশ্বের প্রতিটি পদক্ষেপকে আরও উচ্চতর বিকাশের দিকে নিয়ে গিয়েছে। হেগেলের নিজের সব থেকে বড় দান হলো এই 'দ্বন্দ্বাত্মক-বিকাশ' (Dialectical evolution)।

(১) দর্শন এবং তার প্রয়োজন —হেগেলের মতে দর্শনের কাজ হলো প্রকৃতি ও প্রয়োগ-মাধ্যমে (অভিজ্ঞতার মাধ্যমে) সারা জগতের স্বরূপ জানা;

তার আভ্যন্তর কারণ অনুধাবন করা এবং কেবলমাত্র দৃশ্যত ঘটমান তথা সংযোগ থেকে উৎপন্ন রূপ নয়, প্রকৃতির ভিতর যে অনাদি সত্তা, সমন্বয়ী ব্যবস্থা আছে, তা-ও বোঝা। সমস্ত জাগতিক বস্তুরই কিছু অর্থ আছে, জগতের সব ঘটনার পিছনে বুদ্ধি আছে। গ্রহ-উপগ্রহ —সৌরমণ্ডল বুদ্ধিসংগত নিয়মের অধীন; প্রাণীদেহ প্রয়োজনীয়, অর্থপূর্ণ এবং বুদ্ধিসংগত। বাস্তবিকতাও, নিজের গণ্ডির মধ্যে বুদ্ধিসংগত, এতএব নিজের চিন্তন ও জ্ঞানের প্রক্রিয়াকেও আমরা বুদ্ধিসংগত ঘটনা রূপেই পেয়ে থাকি। দর্শনের কাজ প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা, কাজেই প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের বিকাশও উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উঠছে।

(২) পরম উপাদান —হেগেল কান্টের অজ্ঞাত বস্তু-সার (সত্তার সত্তা) তথা পরমাত্মাকে অস্বীকার করে বলেছেন মন এবং প্রকৃতি (বস্তু)-ই পরম উপাদান, প্রকৃতি কোনো অজ্ঞাত পরম-আত্মার বাহ্যিক আভাস বা আড়ম্বর নয়, বরং তা স্বয়ংই পরম উপাদান। মন এবং বস্তু পৃথক পৃথক জিনিস নয়, পরম উপাদানের আত্মপ্রকাশের এক প্রবাহেরই দুটি অভিন্ন অঙ্গ। মনের জন্য একটি বস্তু-জগতের প্রয়োজন যার ওপর সে নিজের প্রভাব প্রতিফলিত করতে পারবে, কিন্তু বস্তু-জগৎও মনোময় বা যুক্তিসিদ্ধ। "বাস্তবিক হলো যা যুক্তিসিদ্ধ (Rational) এবং যা যুক্তিসিদ্ধ তা-ই বাস্তবিক।"

(৩) দ্বন্দ্বাত্মক পরমতত্ত্ব —পরম উপাদান বস্তু এবং মানসিক জগৎ থেকে অভিন্ন। একে হেগেল অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। পরম উপাদান স্থির নয় গতিশীল। জগৎ প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয়; বিচার-বুদ্ধি, বোধ বা সত্যজ্ঞান হলো সক্রিয়, প্রবাহিত ঘটনা, বিকাশের ধারা। বিকাশ নিচে থেকে ওপরের দিকে ক্রমশ উন্নত হয়। সমস্ত সজীব বা নির্জীব প্রাণীই প্রথমে থাকে অবিকাশিত, বৈশিষ্ট্যহীন; ধীরে ধীরে তা বিকাশিত ও বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করে। গর্ভজাত ভ্রূণের ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়ম দেখেছি। এই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রথমে অবিকাশিত অবস্থায়, অভিন্ন বৈশিষ্ট্যহীন থাকলেও, পরে বিকাশের ধারায় একটি অপরটির সঙ্গে কেবলমাত্র স্বরূপ ও স্থিতিতেই পার্থক্য বজায় রাখে না, তারা পরস্পর বিরোধীও হয়। এই বিরোধী গুণ ও ক্রিয়ার জন্যই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে কিন্তু যে পূর্ণের তারা অংশ তার মধ্যে তারা এক হয়ে যায়। অর্থাৎ অস্তিত্বের মধ্যে নিরন্তর 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর দ্বন্দ্ব থাকে। আরও উচ্চস্তরে বিকাশিত হওয়া বস্তুর স্বাভাবিক 'রুচি' (চরিত্র)। এইভাবে বিকাশ-নিম্ন অবস্থার প্রয়োজন, তা সত্য এবং অর্থবহ। নিম্নে যা গুপ্ত এবং অস্পষ্ট, উচ্চাবস্থায় তা-ই স্পষ্ট ও প্রকাশিত হয়। বিকাশের ধারা তার প্রত্যেক অবস্থায় তার পূর্বাবস্থাকে বহন করে ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। উচ্চাবস্থায় পৌছানোর পর নিম্নাবস্থার অবসান ঘটে (Negated)। অর্থাৎ তখন পূর্বাবস্থা বা সেটা আগে যা ছিল তা

আর থাকে না। কিন্তু পরবর্তী অবস্থা উচ্চাবস্থা রূপে সংরক্ষিত হয়। ঐ অবস্থায় পৌঁছাবার পর আবার তারও উচ্চস্তরে পৌঁছাবার জন্য সেখানে এক নতুন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দুটি রাস্তা একই জায়গা থেকে নির্গত হতে পারে কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর একটি রাস্তা অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হতে পারে। যেমন জলের গতিই তাকে বরফের কাঠিন্য থেকে তারল্যে পরিবর্তিত করে। এই যে প্রথম অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পরিণত হওয়া, হেগেল একেই বলেছেন দ্বন্দ্বাত্মক ঘটনা।

[**দ্বন্দ্বাত্মকতা**] —সকল প্রকার জীবন ও গতির মূল হলো দ্বন্দ্ব। বস্তু মাত্রেই দ্বন্দ্বাত্মক। দ্বন্দ্ব বা বিরোধের পরিণতি দ্বারাই জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক বস্তুই পরিবর্তিত হতে চায় এবং পরিবর্তিত হয়ে পূর্বাবস্থার বিরোধী হতে চায়। এটা বস্তুর চরিত্র। দ্বন্দ্ব না থাকলে জগৎ হতো প্রাণহীন, গতিহীন, বৃদ্ধিহীন এবং সব জিনিসই হতো মৃত এবং স্থির। কিন্তু বিরোধেই (দ্বন্দ্বে) প্রকৃতির কাজ শেষ নয়, সে চায় একে আয়ত্ত করতে ; বস্তু নিজের বিরোধী রূপে পরিণত হলেও সেখানে তার গতি থেমে যায় না ; গতি সামনের দিকে এগিয়ে চলে এবং সামনের বিরোধকে সংযত করে ও তার সমন্বয় সাধন করে। এই ধরনের পরস্পর বিরোধী সত্তা এক পূর্ণের অংশ হয়ে যায়। পরস্পর বিরোধী দুটি সত্তার বিরোধ, আপসে বিরোধ। যখন তারা কোনো পূর্ণ সত্তার মধ্যে মিলিত হয় তখন আর তারা পরস্পর বিরোধী থাকে না। কারণ তখন তো তারা মিলিত হয়েই একটি পূর্ণাবয়ব নির্মাণ করে। বিশ্ব নিরন্তর বিকাশের প্রবাহ ; এবং তার জন্য প্রয়োজন এক বিশ্ব-বুদ্ধির। পরম আত্মা বস্তুত বিশ্বের বিকাশের পরিণতি। কিন্তু বিকাশ যা হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয়। পরিণতি বা পরম-আত্মা এবং বিকাশের সমগ্র প্রবাহ হলো প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ। বস্তু (বা সত্তা) তার প্রয়োজনের সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না, সে যা হয়ে ওঠে তার মধ্যেই তার সমাপ্তি ঘটে। অতএব দর্শনের লক্ষ্য পরিণাম দেখানো নয়। দর্শনের লক্ষ্য এক পরিণাম থেকে কিভাবে অন্য পরিণাম সৃষ্টি হয় এবং কেমন করে একটির অন্যটিতে পরিণত হওয়া অবশ্যম্ভাবী তাই দেখানো।

বাস্তবিকতা (পরমসত্তা বা Absolute) মানস-কল্পিত এক নিরাকার ধারণা মাত্রই নয়, বরং এক চলমান প্রবাহ, এক দ্বন্দ্বাত্মক সন্তান। আমাদের নিরাকার ধারণা তাকে পুরোপুরি ব্যক্ত করতে পারে না। নিরাকার ধারণা শুধু একটি অংশ এবং তার থেকে জাত একটি ক্ষুদ্রাংশ সম্বন্ধেই জ্ঞান দান করে। বাস্তবিকতার রূপ প্রতি মুহূর্তে এক-এক রকম। এই অর্থে তা অভাব, বিরোধ এবং দ্বন্দ্বে পূর্ণ। ফুলের চারা অঙ্কুরিত হয়, পুষ্পিত হয়, শেষে শুকিয়ে মরে যায়। মানুষও বালক থাকে, ক্রমে তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হয়ে মারা যায়।

(৪) **দ্বন্দ্ববাদ** —বস্তু বিকাশিত হতে হতে নিজের বিরোধী রূপে পরিবর্তিত হয়। আমি আগেই বলেছি যে, সম্পূর্ণ (অবয়বী) হলো পরস্পর-বিরোধী অবয়বের

যোগ। দুটি বিরোধীর সমাগম কেমন করে হয় তা হেগেল এইভাবে বুঝিয়েছেন: আমাদের সামনে একটি বস্তু এবং তার বিরোধী অন্য বস্তুও উপস্থিত। এখন উভয়ের দ্বন্দ্ব চলছে এবং আমরা তৃতীয় কোনো বস্তু দ্বারা প্রথম দুটির সমন্বয় করছি। এর মধ্যে প্রথমটি হলো বাদ (Thesis), দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি হলো প্রতিবাদ (Anti-Thesis) ও সংবাদ (Synthesis)। উদাহরণ স্বরূপ পার্মেনিডিস বলেছেন: মূল সত্তা হলো স্থির, নিত্য, একে বলে বাদ। হেরাক্লিটাস বলেছেন: এ নিরন্তর পরিবর্তনশীল, একে বলে প্রতিবাদ। পরমাণুবাদীগণ বলেছেন যে: এ তো না-স্থির, না-পরিবর্তনশীল, বরং উভয় প্রকার গুণসম্পন্ন, তাই একে বলা যেতে পারে সংবাদ।

(৫) **ঈশ্বর**—হেগেলের দর্শন স্পিনোজার সঙ্গে তুলনায় অধিক প্রগতিশীল, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর মোহ অপেক্ষাকৃত বেশী। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য তিনি বেশ বড় ভূমিকা করে বলেছেন: বিশ্ব এক উন্মত্ত প্রবাহ, বা অর্থহীন বল্গাছাড়া ঘটনা নয়; বরং এর মধ্যে এক নিয়মবদ্ধ বিকাশ ও প্রগতি দেখা যায়। আমরা বাস্তবিকতাকে আভাস ও সার, বাহ্য এবং অন্তর, দ্রব্য ও গুণ, শক্তি এবং তার প্রকাশ, সান্ত এবং অনন্ত, মন (=ভাব) ও বস্তু, মানুষ ও ঈশ্বরে বিভক্ত করতে চাই। কিন্তু এর থেকে আমরা মিথ্যা বিভেদ এবং মস্তিষ্কজাত কল্পনা ছাড়া আর কিছুই পাই না ("Natur hat weder kern noch schale")। "সারই আভাস, অন্তরই বাহ্য, মনই শরীর এবং ঈশ্বরই বিশ্ব।"

হেগেল ঈশ্বরকে ভাব বলে প্রচার করেছেন। বিশ্ব যেমনই হোক, তাই-ই ঈশ্বর। অনন্তকালের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনাসমূহ তাঁরই যোগ। মন হলো সেই ভাব, যা আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে গেছে।

জগৎ নিরন্তর সৃষ্টি হচ্ছে। বিকাশ সাময়িক নয়, নিরন্তর প্রবাহিত। বিকাশের প্রবাহ কোনো সময়েই অচল ছিল না। পরমসত্তা সেই সনাতন যার দিকে সমস্ত বিকাশ ধাবমান। বিকাশ কখনও অসৎ থেকে সতের দিকে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বিকাশ অবশ্যই ক্রমশ ঘটেছে, তার মধ্যে কোনোটি অন্য আর একটির কারণ বা তার পূর্ববর্তী।

(৬) **আত্মা**—বিশ্ব-বুদ্ধি (Idea) প্রাণীদেহের মধ্যে রূপ লাভ করে হয় আত্মা। নিজেকে সে কায়াবদ্ধ করে, নিজের জন্যে একটি কায়া গঠন করে, এক বিশেষ ব্যক্তিতে রূপায়িত হয়। এই উৎপাদন হয় অজ্ঞাতভাবে। কিন্তু আত্মা নিজের জন্য যে প্রাণীদেহ সৃষ্টি করে তাতে সে মগ্ন হয় অথচ নিজেকে, দেহ থেকে ভিন্ন মনে করে। চেতনা সেই সত্তার বিকাশ যার একটা প্রকাশ শরীরও। বস্তুত আত্মা যাকে সৃষ্টি করে, মাত্র তাকেই জানে। আমাদের জ্ঞানের বিষয় আমাদেরই সৃষ্টি, তাই তা জ্ঞানময়।

(৭) **সত্য এবং ভ্রম**—সত্য এবং ভ্রম সম্বন্ধে হেগেলের বিচার বড়ই অদ্ভুত। তাঁর মতে পরমসত্যকে প্রকট করার জন্য ভ্রম আবশ্যক, নচেৎ যাকে আমরা

ভুলবশত এক সময় সত্য বলি তার থেকে বিচ্যুত হতে পারি না। সম্পূর্ণ সত্য সমস্ত সম্ভাবিত ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টির মিলিত রূপ। ভ্রমের এই ক্রমাগত অবস্থা প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য সত্যের সার হলো পিছনে ফেলে আসা সমস্ত ভ্রমের সত্য যার খোঁজে তাকে আবার সেই ভ্রমের সত্যেই ফিরে আসতে হবে। এই কারণে পরমসত্তা নিম্ন এবং সাপেক্ষ সত্যের রূপেই বর্তমান থাকে। অনন্তকে কেবলমাত্র সান্ত সত্যের পটভূমিতেই পাওয়া যায়। সত্য তখনই পূর্ণ হতে পারে, যখন কি-না অপূর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে জানবার চেষ্টা পূরণ হয়।

(৮) হেগেলের দর্শনের দুর্বলতা—(১) হেগেলের দর্শনে বিশ্বকে ভাব (Idea) রূপে মানা হয়েছে। এখানে বার্কলের ভাববাদের সঙ্গে হেগেলের তুলনা করা চলে। উভয়েই বস্তুর পূর্বে মন এবং শুদ্ধ-চেতনাকে মেনেছেন।

(২) বিশ্বের পরিবর্তন বা প্রবাহের কথা বললেও বস্তুত হেগেল পরিবর্তনকে একদিক দিয়ে অস্বীকার করেছেন। "যা ভবিষ্যতে ঘটবে তা প্রথম থেকেই আছে", এই উক্তিতেই তা প্রকাশ পায় এবং বিশ্বকে ভাগ্যচক্রে আবদ্ধ এক নিরীহ বস্তুতে পরিণত করেছেন হেগেল। পরমসত্তার ঐক্যের মধ্যে বিশ্বের বৈচিত্র্যকে তিনি সঁপে দিতে চেয়েছেন। এইভাবে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুময় জগতের বৈশিষ্ট্য এক মূল সত্তা থেকে উদ্ভূত অতএব 'কিছু নয়' বলেছেন এবং পরিবর্তন তথা বিকাশের সমস্ত মহত্ত্বকে শেষ করে দিয়েছেন।

(৩) হেগেল বলেছেন যে সমস্ত সত্তার ঐক্য, অশুভরূপে জ্ঞাত ঘটনাসমূহও বস্তুত শুভ-(=শিব)। উচ্চস্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি অশুভকেও উচিত রূপে দেখতে চেয়েছেন, আর অশুভকে ভ্রান্তি আখ্যা দিয়ে তার উর্ধ্বে উঠতে চেয়েছেন। দর্শনক্ষেত্রে এই ঔচিত্যের ব্যবহার বিপজ্জনক ; এর দ্বারা রাজনৈতিক সামাজিক অত্যাচার, বৈষম্য, সবই তো উচিত বলে মনে হতে পারে।

৩. শোপেনহার (১৭৮৮-১৮৬০ খৃঃ)

আর্থার শোপেনহার, ড্যানজিগের এক ধনী বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন একজন খ্যাতনামা উপন্যাস লেখিকা। গোটিঙ্গেন (১৮০৯-১৮১১ খৃঃ) এবং বার্লিন (১৮১১-১৮১৩ খৃঃ) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। কয়েক বছর ধরে যত্রতত্র প্রবঞ্চিত হওয়ার পর তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পান। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এই কাজ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে অবসর জীবন যাপন করতে থাকেন।

[**ইচ্ছাশক্তিবাদ** (will)]—কান্টের দর্শন 'সত্তার সত্তা' (thing-in-itself) তত্ত্বের চারপাশে ঘুরেছে, আর শোপেনহারের দর্শন ঘুরেছে সর্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তিকে

কেন্দ্র করে। বস্তু বা ইচ্ছাসমূহ ব্যক্তিক নয়, ব্যক্তি কেবল ভ্রম। ইচ্ছাশক্তির পরে কোনো বস্তু-সার নেই ; ইচ্ছাশক্তি কালাতীত, দেশাতীত, মূল পদার্থ এবং কারণহীন ক্রিয়া। এই ক্রিয়াই আমাদের মধ্যে উত্তেজনা, পশুপ্রবৃত্তি, উদ্যম, ইচ্ছা ও ক্ষুধা রূপে প্রকটিত হয়। প্রকৃতির এক অংশের ধারায়, তার আভাসের পটভূমিতে আমরা নিজেকে অবগত হই, বিস্তৃত প্রাণীদেহ বলে আমরা নিজেকে বুঝতে পারি। বস্তুত এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের আত্মা, শরীর তার আভাস।

নিজের অন্তরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা সেই ইচ্ছাশক্তিকেই দেখতে পাব। যখন তাকে বাইরে থেকে দেখি, তখন নিজের আন্তরিক ইচ্ছা (যশের, খাদ্যগ্রহণের, বাঁচা-মরার ইচ্ছা)-কে দৈহিক বলে তুচ্ছ করি। অন্যের শরীরেও আমার মতোই ইচ্ছার প্রকাশ বর্তমান। প্রস্তরের মধ্যে যে ইচ্ছাকে দেখা যায়, অন্ধ শক্তি রূপে মানুষের মধ্যে তাই-ই চেতনাযুক্ত। চুম্বক সবসময় উত্তরমুখী ; বস্তু পড়বার সময় সোজাসুজি এবং সরলরেখায় নিচের দিকে নামে। এক উপাদানকে অন্য আর এক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত করলে সৃষ্টি হয় স্ফটিকের। এই সমস্তই বলে যে প্রকৃতির সর্বত্রই ইচ্ছাজাতীয় শক্তিই কাজ করে চলেছে। বৃক্ষ-জগতেও এই ধরনের অজ্ঞাত উত্তেজনা বা প্রযত্ন দেখা যায়—বৃক্ষ প্রকাশের ইচ্ছা রাখে এবং উর্ধ্বে মাথা তোলার প্রচেষ্টা করে ; স্নিগ্ধতার ইচ্ছায় সে নিজেকে জড় মৃত্তিকার ওপর রেখে শিকড়সমূহ গভীরে চালিত করে। অর্থাৎ ইচ্ছাই প্রাণীগণের বুদ্ধি এবং ক্রিয়াসমূহকে সঞ্চালিত করে। হিংস্র পশু তার শিকারকে ভক্ষণের ইচ্ছা পোষণ করে, এরই ফলে তার উপযুক্ত দন্ত, নখর এবং পেশীসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। ইচ্ছা তার চাহিদা পূরণের যোগ্য শরীর সৃষ্টি করে। প্রহার করার ইচ্ছা থেকেই পশুর শিঙ গজায়। জীবনের ইচ্ছাই জীবনের মূল আধার।

জড়-চেতন, ধাতু-মানুষ ইত্যাদিব প্রকাশমান এই মৌল ইচ্ছা কোনো মানুষও নয়, নয় কোনো জ্ঞানী ঈশ্বরও। তা এক অন্ধ চেতনা-রহিত শক্তি যা শুধু অস্তিত্বের তৃষ্ণা বা চাহিদা রাখে। এ শক্তি কোনো দেশ-কালে সীমিত নয় কিন্তু ব্যক্তিগণের মধ্যে দেশ-কালের সীমার মধ্যে প্রকট হয়।

অস্তিত্বের ইচ্ছা, জয়ের ইচ্ছা ইত্যাদি জগতের সমস্ত সংঘর্ষ, দুঃখ এবং অশুভের মূল। স্বভাবত মন্দ এই ইচ্ছাকে কখনও পরিতৃপ্ত করা যায় না ; নিরন্তর যুধ্যমান এই বিশ্বে, বিভিন্ন ধরনের অন্ধ ইচ্ছা পরস্পরের সঙ্গে সব সময় সংঘর্ষে লিপ্ত ; যেখানে মাৎস্যন্যায় প্রচলিত সেই দুনিয়া ভালো তো নয়ই বরং মন্দ এবং চূড়ান্ত-ভাবেই মন্দ। জীবন অন্ধ চাহিদা ছাড়া কিছুই নয়। নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা পীড়াদায়ক, আবার তৃপ্তি হওয়ার পরেও নতুন প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়। প্রবৃত্তিকে কখনও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করা যায় না। প্রত্যেক ফুলেই কাঁটা থাকে। এই দুঃখ থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হলো লোভ বর্জন এবং তপস্যা।

শোপেনহারের দর্শনের ওপর বৌদ্ধ দর্শনের গূঢ় প্রভাব পড়েছে। বৌদ্ধ

দর্শনের মতো তাঁর দর্শনেও একই রকম তৃষ্ণার ব্যাখ্যা ও প্রাধান্য দেখা যায়। বুদ্ধ তৃষ্ণা নিবারণের ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

§ ২. দ্বৈতবাদ

নীৎশে (১৮৪৪-১৯০০ খৃঃ) —ফ্রেডরিস নীৎশে ছিলেন একজন জার্মান দার্শনিক। তিনি কাণ্টের থেকে জ্ঞানের অসম্ভবনীয়তা এবং শোপেনহারের থেকে তৃষ্ণাবাদ (ইচ্ছাশক্তি-বাদ)-কে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু নীৎশের তৃষ্ণা জীবন ধারণের জন্য নয়, প্রভুত্বের জন্য। শোপেনহার তৃষ্ণাকে ত্যাজ্য বলেছেন, কিন্তু নীৎশে তাকে গ্রাহ্য, স্বীয় উদ্দেশ্য --শক্তি প্রাপ্তির উপায় বলে মন্তব্য করেছেন। "যোগ্যতমই বাঁচার অধিকারী" —ডারউইনের এই সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করে তিনি মহান্ পুরুষ হওয়াকেই মানবতার উদ্দেশ্য বলেছেন।

(১) দর্শন—চিন্তা বস্তুত অস্পষ্ট সাক্ষাৎকার। চিন্তার মাধ্যমে আমরা শুধু সামান্যের ওপর দৃষ্টি দিই, কিন্তু অ-সামান্যের কথা মনে রাখি না; এরই ফলে বাস্তবিকতার ধারণা হয় ত্রুটিপূর্ণ। কোনো বস্তুই —কাল, সামান্য, কারণ-সম্বন্ধ —নিত্য স্থির নয়। প্রকৃতির মধ্যে কোনো প্রয়োজন নেই, নেই কোনো নিশ্চিত লক্ষ্য। বিশ্ব আমাদের সুখ বা আচরণকে গ্রাহ্য করে না। প্রকৃতির ওপর এমন কোনো দৈবী শক্তি নেই যা আমাদের সাহায্য করতে পারে। জ্ঞান ও শক্তি প্রভুত্ব প্রাপ্তির অস্ত্র। জ্ঞান অর্জনের অভিপ্রায় হলো, আত্মরক্ষার জন্য তাকে ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন। দার্শনিকগণ জগৎকে বাস্তবিক এবং দৃশ্য, এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যে জগতে মানুষের জীবন, যার মধ্যে মানুষ তার বুদ্ধিকে আবিষ্কার করেছে, সেই পরিবর্তনশীল, টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, দ্বৈত বিরোধ, সংঘর্ষের বিশ্ব অস্বীকৃত হয়ে গেছে। বাস্তব জগৎকে লোক-দেখানো জগৎ, মায়া ও মিথ্যা বলা হয়েছে। এবং দার্শনিকগণ তাঁদের মস্তিষ্কপ্রসূত যে কাল্পনিক জগৎ আবিষ্কার করেছেন তাকে বলা হয়েছে নিত্য, অপরিবর্তনীয়, ইন্দ্রিয়-সামাতিক্রান্ত। খাঁটি বাস্তব জগতের জায়গায় এক মিথ্যা দুনিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সত্যকে অনুসন্ধান করেই পাওয়া যায়, সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু দার্শনিকগণ তাঁদের কর্তব্য —সত্যের অনুসন্ধান ছেড়ে তাকে সৃষ্টি করতে শুরু করেন।

(২) মহামানবের (supermen) **জাতি**—নীৎশে, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতির দর্শন যে কতটা বিভ্রান্তিকর তা বোঝা গেছে। তাঁরা বাস্তববাদী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু দর্শনের প্রচুর বিপজ্জনক উপযোগও তৈরী করেছিলেন। প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে জ্ঞান এক অস্ত্র, তার দ্বারা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পূরণ করা হয়। তৃষ্ণা বা সঙ্কল্প বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। বিশ্বাস মিথ্যা না সত্য তা দেখা নয়, সার্থক না নিরর্থক সেটাই আমাদের দেখা দরকার। তার যোগ্যতা-অযোগ্যতাকে বিচার

করা প্রয়োজন। নীৎশের নিকট প্রভুত্ব-প্রেমই ছিল সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য এবং মহামানব সৃষ্টি হলো সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ —শুধু একজন মহামানবই নয়, মহান্ পুরুষের জাতি, উচ্চপর্যায়ের বীরের জাতি। নীৎশের এই দর্শনানুযায়ী সেদিন পর্যন্ত হিটলার জার্মানদের 'মহান্ পুরুষের জাতি'-তে পরিণত করছিলেন; এমন জাতি সৃষ্টি করছিলেন, যারা দুনিয়াকে জয় করবে, শাসন করবে এবং বিশ্বাস করবে যে শাসন ও বিজয় করার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে। এর জন্য কোনো কাজই নীৎশের নিকট অনুচিত মনে হয়নি। যুদ্ধ, দমন-পীড়ন, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার অন্যায় নয়। শান্তি অপেক্ষা যুদ্ধই শ্রেয় —এমনকি শান্তিকে মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ মনে করতে হবে। আমি এই জগতে নিজের সুখ এবং আনন্দের জন্য আসিনি। আমাদের জীবনের একটিই উদ্দেশ্য, হয় জয় করব নয়ত মৃত্যু বরণ করব ; এর থেকে আমরা এক আঙুলও পিছু হঠব না। দয়া অত্যন্ত মন্দ জিনিস, যারা নিজ লক্ষ্য থেকে বিচলিত হয়ে দয়া দেখায়, যেমন তাদের পক্ষে তেমনি যারা নিজেদের অপরের দয়ার লক্ষ্যবস্তু করে তোলে, তাদের পক্ষেও। এ দয়া দুর্বল এবং বলবান উভয়কেই দুর্বল করে জাতির জীবনরস শুষে নেয়।

জন্মগতভাবে উচ্চবর্গের মানুষদের বেশী সুবিধার প্রয়োজন। কারণ, সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষদের অপেক্ষা তাঁদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বেশী এবং ভারী। সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদেরই শাসন করার অধিকার থাকা উচিত এবং তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যাঁরা দয়া-মায়ার উর্ধ্বে, নিজেকে বিপদে জড়াতে এবং অন্যকেও বিপজ্জনক কাজের মধ্যে ফেলতে সর্বদা প্রস্তুত। হিটলার, গোয়েরিং প্রভৃতি ছিলেন এই ধরনের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

নীৎশে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, অরাজকতাবাদ সবকিছুকেই অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্ভব বলেছেন। তাঁর মতে এই জীবন, যোগ্যতমের বেঁচে থাকার নিয়মের ওপর নির্ভরশীল। যে এটা স্বীকার করে না, সে আদর্শ-বিরোধী। সবল ব্যক্তিগণের বিকাশের পথে এরা বাধা সৃষ্টি করে। "আজ আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো এই সাম্যবাদের হাওয়া —শান্তি, সুখ, দয়া, আত্মত্যাগ, জগৎ থেকে ঘৃণা ও ঈর্ষা দূর করা, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, সাম্য, ধর্ম, দর্শন, সায়েন্স সবই জীবন-সিদ্ধান্তের বিরোধী, অতএব এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অনুচিত।"

নীৎশে বলেছেন যে, মানুষ যেমন বনমানুষকে অতিক্রম করেছে, মহামানবও তেমন সাধারণ মানুষকে পরাস্ত করে এগিয়ে যাবে।

§ ৩. অজ্ঞেয়তাবাদ

হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩ খৃঃ) —ইনি ইংলণ্ডের ডার্বিতে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

দর্শন—স্পেন্সার মানবজ্ঞানকে ইন্দ্রিয় জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন ; কিন্তু এরও পিছনে এক অজ্ঞেয় জগৎ আছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে —আমি সান্ত এবং সীমিত বস্তুকেই জানতে পারি ; পরমসত্তা আদি-কারণ, অনন্তকে জানা আমাদের ক্ষমতার অতীত। জ্ঞান সাপেক্ষ, এবং পরমসত্তাকে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা বা ভেদ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। যদি পরম সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান সৃষ্টি নাও করতে পারি, তবু মাত্র এই কারণেই তার সত্তা অস্বীকারও করতে পারি না। বিজ্ঞান (Science) ও ধর্ম উভয়েই এই বিষয়ে একমত হতে পারে যে সমস্ত-দৃশ্য-জগতের পিছনেই আছে একটা সত্তা, পরমসত্তা। শক্তি দুই প্রকার, একটি দ্বারা প্রকৃতি আমাদের নিকট তার সত্তার পরিচয় দেয়, আর একটি শক্তি কাজের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়—অর্থাৎ সত্তার এবং ক্রিয়ার পরিচায়ক শক্তি।

(১) পরমসত্তা—নিজেকে প্রকাশ করে দুটি পরস্পরবিরোধী বৃহৎ বিভাগে ; এগুলি হলো অন্তর ও বাহ্য, আত্মা এবং অনাত্মা, মন ও বস্তু।

(২) বিকাশবাদ—আমাদের জ্ঞান পরমসত্তার আভ্যন্তর রূপ (মন) এবং বাহ্য রূপ (বস্তু) প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দার্শনিকগণের কাজ হলো তার মধ্যে যে সাধারণ প্রবৃত্তি আছে, সমস্ত বস্তুর যে সর্বদেশীয় নিয়ম আছে তারই অনুসন্ধান করা, এই নিয়মই বিকাশের নিয়ম। বিকাশের প্রবাহের মধ্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখতে পাই—

(১) একীকরণ (Concentration) যেমন মেঘ, বালির স্তূপ, শরীর বা সমাজের নির্মাণ ;

(২) বিভাজন (Differentiation) অর্থাৎ পিণ্ড থেকে পৃথক করে নিয়ে এক আলাদা অংশ সৃষ্টি করা তথা তাকে সংগঠিত করে এমনভাবে সৃজন করা যার অবয়ব পৃথক হলেও একটির সঙ্গে অপরটির সম্বন্ধ থাকে। বিকাশ এবং বিনাশের মধ্যে তফাৎ আছে। বিনাশের মধ্যে বিভাজন হয়, কিন্তু সংগঠন থাকে না। বিকাশ হলো বস্তুকে একত্রিত করা এবং গতি দান করা ; বিপরীত দিকে বিনাশ গতিকে নিশ্চিহ্ন করে বস্তুকে বিশৃঙ্খল (এলোমেলো) করে দেয়। বাহ্যিক সম্বন্ধের সঙ্গে আন্তর সম্পর্কের সদা সমন্বয় সাধনই জীবন। পরিপূর্ণ জীবন হলো তাই যার মধ্যে বাহ্যিক সম্বন্ধের সঙ্গে আন্তর সম্বন্ধের পূর্ণ সমন্বয় হয়।

(৩) সামাজিক বিচার—স্পেন্সারের মতে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর সামাজিক অবস্থার মধ্যেই সর্বশক্তিমান সমাজবাদী রাষ্ট্র হতে পারে। সমাজে যখন সর্বোচ্চ বিকাশ হয়ে যায়, তখন এই ধরনের রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে না, বরং তা প্রগতির পথে বাধাই সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের কাজ হলো অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা এবং বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। যখন সমাজবাদী রাষ্ট্র আরও অগ্রসর হয়ে মানুষের আর্থিক এবং সামাজিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তখন সে ন্যায়কে হত্যা

করে এবং বিকাশে অগ্রবর্তী ব্যক্তিদের স্বাতন্ত্র্যে আঘাত করে। স্পেন্সার সমাজ-বাদের কঠোর বিরোধিতা করে বলেছেন —সমাজবাদ আসছে, কিন্তু তা হবে জাতির পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং তা অবশ্যই বেশী দিন টিকে থাকবে না।

§ ৪. বস্তুবাদ

উনবিংশ শতাব্দীর দর্শনে ভাববাদের খুব প্রাধান্য ছিল কিন্তু ইউল, হেলম্‌হোলৎজ, শ্বান (T. Schwann) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধান পরোক্ষভাবে বস্তুবাদকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল।

১. বুখনের (১৮২৪-১৮৯৯ খৃঃ)

বুখনেরের 'শক্তি এবং বস্তুতত্ত্ব' একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুবাদী গ্রন্থ। তিনি লিখেছেন যে সমস্ত শক্তিই হলো গতি, এবং সমস্ত বস্তুই সৃষ্টি হয় গতি ও বস্তুর সংযোগে। গতি এবং বস্তুকে আমরা পৃথক মনে করতে পারি, কিন্তু পৃথক করতে পারি না। আত্মা বা মন কোনো বস্তু নয়, বিশেষ পরিস্থিতিতে বস্তুর দ্বারাই জীবন সৃষ্টি হয়। মনের ক্রিয়া হলো —"বহিরাগত উত্তেজনা দ্বারা মস্তিষ্ক মধ্যস্থ মজ্জার কোষের গতি।"

মোল্‌শোট্ (১৮২২-১৮৯৩ খৃঃ), ফোগট (১৮১৭-১৮৯৫ খৃঃ), কৃজোল্বে (১৮১৯-১৮৭৩ খৃঃ) ছিলেন এই শতাব্দীর বস্তুবাদী দার্শনিক। বিরোধীগণও স্বীকার করেন যে এই শতকের সমস্ত বস্তুবাদী দার্শনিক এবং সায়েন্টিষ্টগণই ছিলেন মানবতা এবং প্রগতির শক্তিশালী প্রচারক।

২. লুডভিগ ফয়ারবাখ (১৮০৪-১৮৭২ খৃঃ)

কাণ্ট তাঁর বিশুদ্ধ যুক্তির সম্যক বিচারে (critique of pure reason) ধর্ম, সংস্কার, ঈশ্বরকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ভালোমানুষ' হওয়ার খেয়াল —অথবা মহান্ দার্শনিকগণের পঙ্‌ক্তি থেকে বহিষ্কৃত হবার ভয় তাঁকে কিভাবে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল তা আমি আগেই বলেছি। হেগেল শুদ্ধ যুক্তি, বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁর দর্শন—দ্বন্দ্বাত্মক ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যদিও তিনি বস্তুকে ভাবের বিকাশ বলে বিপরীত স্থানে বিপরীত পরিণামে পৌঁছেছেন। হেগেলের পর তাঁর মতানুগামী দার্শনিকগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, একদল হলেন ড্যারিস্ত-এর লোক, যাঁরা ছিলেন বস্তুবাদের কঠোর শত্রু এবং হেগেলের ভাববাদকে বিকাশিত করা

দূরে থাকুক বরং তাকে রুখে দিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন ; এবং দ্বিতীয় দল হলো প্রগতিশীলদের, যাঁরা হেগেলের দর্শনকে রহস্য এবং ভাববাদ থেকে মুক্ত করে তার সঠিক লক্ষ্য দ্বন্দ্বমূলক (ক্ষণিক) বস্তুবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ফয়ারবাখ ছিলেন এই প্রগতিপন্থী হেগেলীয় দলের অগ্রগামী। পরে এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন মার্কস্ এবং এঙ্গেলস।

স্থিতস্বার্থ ধনিক এবং ধর্মবাদী, বস্তুবাদকে তাঁদের পরম শত্রু মনে করতেন, কারণ তাঁরা বুঝতেন যে পরলোকের আশা এবং ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতার প্রতি যদি বিশ্বাস স্খলিত হয়, তবে মেহনত করতে করতে অভুক্ত মৃত্যু-পথগামী জনতা তাঁদের আক্রমণ করবে এবং বস্তুবাদী দার্শনিকদের মতানুযায়ী পৃথিবীতেই স্বর্গ এবং মানবন্যায় স্থাপনে তৎপর হবে। তাই পুরোহিতবর্গ বলতে শুরু করলেন যে বস্তুবাদীগণ নোংরা, ইন্দ্রিয়-লোলুপ, অধর্ম-পরায়ণ, মিথ্যাচারী, অবিশ্বাসী, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"-বাদী। তাঁদের বিপরীতে ভাববাদীগণ সংযমী, ধর্মাত্মা, স্বার্থত্যাগী, বৈরাগী এবং আদর্শবাদী।

ফয়ারবাখের প্রধান গ্রন্থ, *The Essence of Christianity* বা 'খৃষ্টধর্ম সার'-এ তিনি খৃষ্টধর্মের কাঠামো বিশ্লেষণ করে ধর্মসমূহের বাস্তবিকতা দেখিয়েছেন। পুস্তকটির দুটি অংশ। প্রথমাংশের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : "ধর্মের সত্যতা বা মানবশাস্ত্রীয় সার।" দ্বিতীয়াংশে আছে : "ধর্মের ভণ্ডামি বা ধর্মান্ধতা সার।" ভূমিকায় মানব এবং ধর্মের মুখ্য স্বভাবকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মানুষের প্রধান স্বভাব হলো তার স্বাজাত্য-চেতনা (মানবতা-বোধ) ; একেই বলে মানব স্বভাব। এই চেতনা কতটা গভীর তা বোঝা যায় তার চিন্তাশীল ভাব এবং সংবেদন থেকে।...

"তবে যাকে মানুষ উপলব্ধি করে সেই মানব-স্বভাব কি ? অথবা মানুষের যথার্থ মানবতার বৈশিষ্ট্য কি ? বুদ্ধি, ইচ্ছা, স্নেহ।...

"মানব-অস্তিত্বের আধার হলো তার মানবতার ওপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা —বোধ বা বুদ্ধির ক্রিয়া, ইচ্ছা করা এবং প্রেম। মানুষ হয়ে জন্মানো বুঝবার জন্য, ভালোবাসার জন্য এবং ইচ্ছা করবার জন্য।...

"কেবল তাই সত্য, পূর্ণ এবং দিব্য যা নিজের জন্য অস্তিত্ব বজায় রাখে। কিন্তু প্রেমও এই রকম এবং ইচ্ছাও এই রকম। ব্যক্তিমানুষের মধ্যে মানবের এই তিন দিব্যগুণের সমাগম হয়। কিন্তু প্রেম, বুদ্ধি, ইচ্ছা এই দিব্য-ত্রয়ী এমন শক্তি নয় যার ওপর মানুষের অধিকার আছে। এগুলি ব্যতীত মানুষ মানুষই নয়। মানুষ যা কিছু হয় তা ঐ ত্রয়ীর কারণেই হয়, এই-ই হলো মানব-স্বভাবের ভিত্তি। এ যেমন তাকে রক্ষা করে না, তেমনি তাকে সজীব, নিশ্চিত, নিয়ামক (দিব্য পরম শক্তির) রূপে পরিণত করে না।" (*The Essence of Christianity* ; p. 32)

ফয়ারবাখ বলেছেন : "মানুষের কাছে পরমতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠতম বস্তু হলো তার

স্বভাব।" "মনোভাব দ্বারা যে দিব্যস্বভাবের সন্ধান পাওয়া যায় তা বস্তুত আত্ম-বিভোরতা-জনিত প্রসন্ন ভাবনা, স্বীয়-প্রকৃতির আনন্দময়তা ব্যতীত আর কিছুই নয়।" ধর্মসার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "যেখানে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মধ্যে বিষয় (= বস্তু) সম্বন্ধী চেতনাকে নিজ আত্মার চেতনা থেকে পৃথক করা যায়; ধর্মের মধ্যে বিষয়-চেতনা এবং আত্মিক চেতনাকে একীভূত করে দেওয়া যায়।" "বস্তুত মানুষের আত্ম চেতনাকে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভিত্তিতে আকাশে ওঠানোই হলো ধর্ম। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে পূজার বস্তু।" এটাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে ফয়ারবাথ বলেছেন: "যে মানুষের যেমন বিচার, যেমন প্রবৃত্তি, তার ঈশ্বরও তেমন; যার যেমন মূল্য, তার ঈশ্বরের মূল্যও তার অধিক নয়। মানুষের ঈশ্বর-সন্ধানী চিন্তন হলো আত্ম-চেতনা (নিজের চেতনা), ঈশ্বর-সন্ধানী গুণ তার আত্ম-জ্ঞান (নিজের জ্ঞান)। তার ঈশ্বর থেকেই তুমি সেই মানুষটিকে এবং সেই মানুষটি থেকেই তার ঈশ্বরকে তুমি চিনতে পারবে। মানুষ এবং তার ঈশ্বর উভয়েই এক।" (প্রাগুক্ত; পৃঃ. ১২)

দিব্যতত্ত্ব মানবীয়, এর আলোচনা করার পর তিনি আবার বলেছেন: "ধর্মীয় ধারণার বিকাশ …প্রধানত এইভাবে ঘটে। মানুষ ক্রমেই বেশী করে ঈশ্বর-কল্পনা করতে থাকে আর নিজেকে বেশী করে তার অধীন করে ফেলে। ভগবদ্‌বাণী সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ স্পষ্ট। পরবর্তী যুগের সভ্য জনতার কাছে যে সব উক্তি প্রকৃতি বা বুদ্ধি থেকে পাওয়া যায় সেগুলিই পূর্ববর্তী যুগের প্রাকৃতজনের কাছে ছিল ঈশ্বরের বাণী।

"ইহুদীদের মতে খৃষ্ট ছিলেন ধর্মীয় সংস্কার-মুক্ত। মতামতে এই ধরনের পরিবর্তন হয়। যা কালকেও ছিল ধর্ম আজ আর তা নেই; আবার আজ যা নাস্তিকবাদ কাল হয়ত তাই-ই ধর্ম বলে পরিগণিত হবে।" (*Atheism.*)

ধর্মের বাস্তবিক সার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হলো: "ধর্ম মানুষকে তার নিজের থেকে পৃথক করে ফেলে; এর কারণ মানুষ নিজের সামনে নিজের প্রতিবাদীর ভূমিকায় ঈশ্বরকে রাখে। ঈশ্বর ঐ রকম যা কি-না মানুষ নয়—মানুষ এই রকম যা কি-না ঈশ্বর নয়।…

"ঈশ্বর ও মানুষ দুই বিরোধী মেরু; ঈশ্বর পরিপূর্ণ ভাবরূপ, বাস্তবিকতার যোগ; মানুষ পরিপূর্ণ অ-ভাবরূপ, সমস্ত অ-ভাবের সংযোগ।

"পরন্তু ধর্মের মাধ্যমে মানুষ নিজের অন্তর্হিত স্বভাবের প্রতিই মনঃসংযোগ করে। তাই এটা দেখাতে হবে যে এই প্রতিবাদ, এই ঈশ্বর এবং মানুষের বিভাজন—যাকে অবলম্বন করে ধর্ম তার কাজ শুরু করে—মূলত মানুষকে তার স্বভাব থেকেই বিভাজিত করে।" (প্রাগুক্ত; পৃঃ. ৩৩)

ফয়ারবাথ তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে ধর্মের ভ্রান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: "ধর্মের জন্য প্রকৃতির সেই অংশই সম্পূর্ণ মানুষ, যাঁরা ব্যবহারিক,

বিচারশীল, জেনে এবং বুঝে লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করেন ···যাঁরা জগৎকে শুধু জগতের মধ্যেই চিন্তা করেন না, বরং চিন্তা করেন তার লক্ষ্য এবং আশা সম্বন্ধে। এর ফল এই হয় যে, যা কিছু ব্যবহারিক চেতনার মধ্যে গুপ্ত অথচ সিদ্ধান্তের আবশ্যিক বিষয়, তাকে মানুষ এবং প্রকৃতির বাইরে এক বিশেষ ব্যক্তি-সত্তার ভিতরে নিয়ে যায়। —সিদ্ধান্ত এখানে গভীর, মৌলিক এবং ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে একত্রিত হয়েছে বাস্তব চিন্তন (=জগৎ-সম্বন্ধী) এবং অনুভবের (=প্রয়োগ) সিদ্ধান্ত, তথা (বুদ্ধি=) যুক্তি এবং সায়েন্স।" (প্রাগুক্ত ; পৃঃ. ১৮৭)

এইসব কারণ দেখিয়ে ফয়ারবাখ জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি খৃষ্টধর্মের ওপরে উঠেছেন। ধর্ম মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথে মানুষ এবং তার আবশ্যক সত্তার মধ্যেকার সম্বন্ধের বিরোধিতা করে তাকে উল্টে দেয়, এবং মানুষকে তার নিজেরই মানবীয় স্বভাবের সারকে পূজো এবং বিশ্বাস করার জন্য পরামর্শ দেয়। এইরূপ প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে ফয়ারবাখ বলেছেন যে : "মানুষের উচ্চতম সত্তা নিজেই নিজের ঈশ্বর।" ফয়ারবাখ এখানে ধর্মকে মানবতা-ধর্ম এই বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন—

"ধর্ম আত্মিক-চেতনার প্রথম স্বরূপ এবং পবিত্র বস্তু কেন না তা হলো প্রাথমিক চেতনা। কিন্তু যে বস্তু ধর্মের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী —অর্থাৎ ঈশ্বর ···তিনি স্বয়ং এবং সত্যানুযায়ী অন্য এক পর্যায়ের কারণ, তিনি বস্তুরূপে চিন্তিত মনুষ্য স্বভাব মাত্র ; আবার ধর্মের নিকট যে বস্তু অন্য পর্যায়ের —অর্থাৎ মানব —তাকেই প্রথম বলে মনে করতে এবং ঘোষণা করতে হবে। মানবপ্রেম উপধারা হওয়া উচিত নয়, মূল ধারা হওয়া উচিত। যদি মানবীয় স্বভাব মানুষের শ্রেষ্ঠ স্বভাব বলে গণ্য হয় তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমকেও উচ্চতম এবং প্রথম নিয়ম বলে গণ্য করা উচিত। মহান্ ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত হলো মানুষ মানুষের নিকট ঈশ্বর ; একে কেন্দ্র করেই বিশ্বের ইতিহাস আবর্তিত হয়।" (প্রাগুক্ত ; পৃঃ. ২৭০-২৭১)

এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় যে ফয়ারবাখ যদিও ধর্মের কঠোর সমালোচনা করেছেন তবু সেই সঙ্গে চেয়েছেন আজকের নাস্তিকতাবাদকে ভবিষ্যতের ধর্ম রূপে দেখতে এবং বস্তুবাদকে ধর্মের সিংহাসনে বসাতে। "ধর্মের ভূমি হলো মানুষ ও পশুর মধ্যে যথার্থ ভেদ। পশুর মধ্যে ধর্ম নেই।" (প্রাগুক্ত ; পৃঃ. ১) এই উক্তিও ঐ মনোভাবই প্রকট করে।

ফয়ারবাখ যদিও ধর্ম শব্দটি বাতিল করতে চাননি, কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল ধর্ম-বিরোধী এবং বস্তুবাদের অনুকূল। বিশেষ করে ধর্মের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে বসেই তিনি কাজ করতে চেয়েছেন। এটা ধর্ম তথা সম্পত্তিবানদের সমর্থকগণের কখনই বা পছন্দ করা সম্ভব ? অধ্যাপক ড্যুরিঙ ফয়ারবাখের বিরুদ্ধে

লেখনী ধারণ করেন, যার উত্তর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এঙ্গেলস তাঁর 'লুডভিগ ফয়ারবাখ' গ্রন্থে দিয়েছেন।

৩. মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খৃঃ)

কার্ল মার্কসের জন্ম হয় রাইনল্যাণ্ডের ট্রেবেক্স নগরে। তিনি বন্, বার্লিন এবং জেনার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি জেনায় 'ডিমোক্রিটাস এবং এপিকিউরাসের প্রাকৃতিক দর্শন'-এর ওপর নিবন্ধ রচনা করে পি-এইচ. ডি. উপাধি পান। বস্তুবাদী হওয়ার আগে মার্কস ছিলেন হেগেলের দর্শনের অনুসারী। গোড়া থেকেই তাঁর রাজনৈতিক এবং সামাজিক মতামত ছিল উগ্র, অতএব কেনই বা জার্মানীর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করবে! মার্কস পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনাকে অবলম্বন করে ২৪ বছর বয়সে 'রাইনিস সাইটুঙ' পত্রিকার সম্পাদক হন কিন্তু প্রুশিয়ান সরকার তাঁকে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করেন, ফলে মার্কসকে দেশ ছেড়ে অনেক কষ্ট করে বিদেশে ঘুরতে হয়। প্রথমে তিনি ছিলেন প্যারিসে, পরে বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্‌-এ। কিন্তু সেখানকার সরকারও প্রুশিয়ার অসন্তুষ্টির ভয়ে মার্কসকে চলে যেতে বলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন চলে যান এবং বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনেরই ছাত্র ছিলেন, এবং নিজে ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক। কিন্তু তাঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এত উগ্র, দৃঢ় এবং মৌলিক যে সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি এবং রাজনীতির একজন মহান্ চিন্তাবিদ্ হিসাবে তিনি যতটা খ্যাত, দার্শনিক হিসাবে ততটা নয়। অবশ্য তার আরও একটি কারণ আছে। শিল্পের ন্যায় দর্শনও বিত্তশালী অবসরভোগী ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জনের বিষয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যে ধরনের দর্শন চান মার্কসের দর্শন সে রকম নয়, সুতরাং কেনই বা তাঁরা মার্কসকে একজন দার্শনিক বলে গণ্য করবেন?

মার্কসের দর্শন সম্বন্ধে আমি 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' গ্রন্থে বিশেষভাবে লিখেছি; অতএব তার আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

(১) মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ —আধুনিক যুগের অ-বস্তুবাদী ইউ-রোপীয় দর্শনের চরম বিকাশ ঘটেছিল হেগেলের দর্শনে। আর সমগ্র মান-বেতিহাসের বস্তুবাদী দর্শনের চরম বিকাশ ঘটেছিল মার্কসের দর্শনে।

প্রাচীন (আয়োনীয়) গ্রীক দার্শনিকরা বস্তুকে সকল পদার্থের মূল এবং চেতনার জন্য পর্যাপ্ত মনে করতেন, তাই তাঁদের ভূতাত্মবাদী (Hylozoist—Hylo=ভূত, বস্তু; Zoi=জীবন, আত্মা) বলা হতো। স্টোয়িকগণও বস্তুকে অস্বীকার করতেন না, কিন্তু বস্তুবাদের অধিক বিকাশ সাধন করেছিলেন ডিমো-ক্রিটাস এবং এপিকিউরাস, যাঁদের ওপর মার্কস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণা নিবন্ধ

রচনা করেছিলেন। রোমের লুক্রেসিয়াস তাঁর সময়ে বস্তুবাদের পতাকা নীচে পড়ে যেতে দেননি। মধ্যযুগে যেমন মুক্তচিন্তার কোনো নিয়ম ছিল না, তেমনই বস্তুবাদের চর্চারও সুযোগ ছিল না। মধ্যযুগ অতিক্রম করেই আমরা ইউরোপে বারুচ স্পিনোজাকে দেখেছি, যিনি ভাববাদী হলেও তাঁর সিদ্ধান্ত বেশী মাত্রায় আয়োনীয় ভূতাত্মবাদীদের মতো। ইংলণ্ডে টমাস হব্‌স (১৫৮৮-১৬৭৯ খৃঃ) বস্তুবাদের সূচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের (১৭৯২ খৃঃ) পূর্বে যে মুক্তচিন্তার প্লাবন এসেছিল তা দিদেরো, হেলভেসিয়াস দ্য' হোলবাস, লা'মেত্রি ইত্যাদির মতো দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লুডভিগ ফয়ারবাখ বস্তুবাদের ওপর কলম ধরেন, এবং তাঁর প্রভাব মার্কসের ওপরেও পড়েছিল। মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্বাত্মক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বস্তুবাদকে মিলিয়ে বস্তুবাদের একটি পূর্ণ রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং সেই সঙ্গে দর্শনকে কল্পনার ক্ষেত্রে বুদ্ধির কসরতে পরিণত না করে তাকে পরিণত করলেন ব্যবহারিক প্রয়োগিক সমাজবিদ্যায়।

ভাববাদী ধারা সমাজবিদ্যায় বিভ্রান্তি এবং রহস্যবাদ ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করেনি; তা কেবল ঈশ্বর, পরমসত্তা, অজ্ঞেয়র ওপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা শিক্ষা দেওয়া ছাড়া সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো রকম বুৎপত্তি দেখাতে পারেনি। কিন্তু মার্কসীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মানবজাতির মতোই মানব-সমাজ তার আত্মিক এবং ধার্মিক ব্যবস্থাসহ এই প্রকৃতিরই অবদান। মানবজাতি এবং সমাজ প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতি তার আবশ্যকতাকে যতদূর পর্যন্ত পূরণ করে ততদূরই সে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। বাস্তব সৃষ্টি—খাদ্য বস্ত্রাদি —তথা সেই বস্তুসমূহের উৎপাদনের ওপরেই মানব-সমাজ নির্ভরশীল।

'মহান্ মানসিক সংস্কৃতি', 'ভব্য বিচার,' 'দিব্যচিন্তন' প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ শব্দের ব্যবহার যত ইচ্ছা করুন; এ সবই বাস্তব সৃষ্টির দান।

"না কুছ দেখা ভাব-ভজনমে
না কুছ দেখা পোথিমে
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সন্তো
জো দেখা সো রোটিমে॥"

(ভজন-পূজন-গ্রন্থাদিতে কিছু দেখা যায় না। শোনো সাধুগণ, সব কিছুই দেখা যায় রুটিতে)।

অথবা: "ভূখে ভজন না হোয় গোপালা।
লে লে অপনী কণ্ঠীমালা॥"

দর্শন চর্চার অবসর কখন পাওয়া যায়? যখন প্রকৃতির ওপর মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তার শ্রমের ফসল অধিক হয়, খাদ্য-বস্ত্র উৎপাদন তথা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করার পরেও যখন তার কিছুটা সময় উদ্‌বৃত্ত থাকে, তখন এই কর্মমুক্ত

অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চিন্তনকর্মে, সংস্কৃতির বিকাশে, ব্রহ্মজ্ঞানদানে সমর্থ হন। এবং সমাজেও বস্তু বা প্রকৃতিই মনের জননী, মন প্রকৃতির জনক নয়।

বস্তুবাদ যতটা ভালোভাবে 'মানস-জীবনের' বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে, ভাববাদ ততটা পারে না। কারণ ভাববাদে ধারণা বা ভাবের কোনো সম্বন্ধ পৃথিবী এবং তার বস্তুর সঙ্গে নেই। ভাব নিজের ভেতর থেকেই উৎপন্ন হয়। হেগেল তার 'দর্শন-ইতিহাস'-এ কি রকম বিক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "ইনিই শিব (শুভ), ইনি বোধ ...ঈশ্বর। ঈশ্বর বিশ্ব-শাসন করেন। তাঁর সংস্কারের স্বরূপ, যোজনার পূর্তি হলো বিশ্ব-ইতিহাস।" বৃদ্ধ ঈশ্বর একই সঙ্গে বাবা আদম, বিবি ইভ, অথবা ঋষি-মুনি, বেশ্যা, খুনী, কুষ্ঠরোগী সৃষ্টি করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, যৌনরোগ প্রভৃতি পাপীর দণ্ডদানের নিমিত্ত সৃষ্টি করেছেন; যাতে মানুষ পাপও করবে, এবং একই সঙ্গে ন্যায় বিচারের নাটকও চলবে। আর তিনি নেপথ্যে থেকে দণ্ডবিধান করবেন। পাপ সৃষ্টি এবং দণ্ডবিধান একই সঙ্গে! কি নির্মম তামাসা !!! আবার তা এক দিনের জন্য নয়, অনাদি কাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এই প্রহসন লীলা চলতেই থাকবে। এই তো ঈশ্বর, যাঁকে কি-না ভাববাদী দার্শনিক সদর দরজা দিয়ে নয় পিছনের দরজা দিয়ে যোগ-প্রাণায়ামের দ্বারা আমাদের সামনে উপস্থিত করতে চেয়েছেন।

ইলিয়েটিক দার্শনিকদের নেতা (আয়োনীয়) গ্রীক দার্শনিক পার্মেনিডিসের মত ছিল যে, প্রতিটি বস্তু অচল-অনাদি, অনন্ত, ঐকিক, অপরিবর্তনীয়, অবিভাজ্য, অবিনাশী। জেনো (৩৩৬-২৪৬ খৃঃ পূঃ) বল্লার দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে বল্লা প্রতিক্ষণে কোনো না কোনো স্থানে স্থিত থাকে, তাই তার গতি ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। এইভাবে যার গতি মানুষের দৃষ্টিতে স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে তাকেও অস্বীকার করে তিনি স্থিরবাদকেই দৃঢ় করতে চেয়েছেন। এর বিরুদ্ধে আমরা হেরাক্লিটাসকে বলতে শুনেছি যে, সংসারে এমন কোনো পদার্থ নেই যা গতিশীল নয়। "প্রতিটি বস্তুই বহমান, কেউই স্থির নয়।" "একই স্রোতে দুইবার অবগাহন করা যায় না।" তাঁর বন্ধু ক্রাতিলাসও এই একই কথা বলেছেন। পরমাণুবাদী ডিমোক্রিটাস বলেছেন, গতি, বিশেষত পরমাণুর সকল বস্তুর মূল। হেগেল গতি তথা হওয়া (অ-বর্তমানের বর্তমান হওয়া)-কে সমর্থন করেছেন।

(২) **দর্শন** —হেগেলের দর্শনের ভিত্তি হলো গতি এবং পরিবর্তনবাদ। হেগেলের এই গতিতত্ত্বকে আরও পরিমার্জিত করে মার্কস তাঁর দর্শনের স্থাপনা করেন। বিশ্ব এবং তার সজীব-নির্জীব পদার্থসমূহ এবং সমাজকেও দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতো; প্রথমত, পার্মেনিডিস বা জেনোর মতো এগুলিকে স্থির-অচল মনে করা বা স্থিরবাদ; দ্বিতীয়ত, হেরাক্লিটাস ও হেগেলের গতিবাদ —ক্ষণিকবাদ। প্রকৃতি স্থিরবাদের বিরোধী, একে তুলনা করা যায় সাধারণ পথযাত্রীর সঙ্গে, এই রকম উক্তি আইনস্টাইনেরও। আকাশের যে নক্ষত্রকে কোনো সময় স্থির অচল

মনে করা হতো, আজ জানা গেছে যে তার গতি ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল। পিণ্ডের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অংশ যে পরমাণু, সেও গতিশীল, আবার আরও ক্ষুদ্রতম অংশ ইলেকট্রন পরমাণুর ভেতর চক্রাকারে ঘুরছে এবং কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যায়। বৃক্ষ বা পশুকে 'ঈশ্বর' একদা যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন, আজ আর তারা তেমন নেই। বর্তমানের প্রাণী, বনস্পতি সবই যে অন্যরকম, তা তো প্রত্নবিদ্যা থেকেই জানতে পারবেন। আজ কোথায় সেই 'মহান্' সরীসৃপদের সন্ধান পাওয়া যাবে যারা ত্রিতল অট্টালিকার মতো উঁচু কিংবা একটা মালগাড়ীর মতো লম্বা। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে এই পৃথিবী যাদের বিচরণ ভূমি ছিল, আজ তাদের অস্তিত্বটুকুও পাওয়া যায় না। সে সময় আম বা দেবদারু গাছের অথবা জঙ্গলে হরিণ, ভেড়া, ছাগল, গরু বা নীলগাইয়ের সন্ধান পাওয়া যেত না। বানর, নরবানর এবং নর তো বহুকাল পরে জন্মেছে। সর্বশক্তিমান ভগবান বেচারা সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এদের উৎপাদন করতে অসমর্থ ছিলেন। আজ মানুষ তার প্রয়োগ দক্ষতায় ইয়র্কশায়ারের শূকর, আনারস, স্ট্রবেরী, কৃষ্ণবর্ণ গোলাপ পর্যন্ত সৃষ্টি করে সেগুলির বংশপরম্পরাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম।

এতে কোনো সন্দেহ থাকল না যে, বিশ্বে স্থির-বস্তু বলে কিছু নেই। এখন যে কাঠের বাক্সকে টেবিল করে নিয়ে আমি লিখছি, তাতেও প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু তা পরমাণু ও ইলেকট্রনের রূপে, ফলে তাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। যদি আমার দৃষ্টিশক্তি কোটিগুণ বেশী হতো তবে এই টেবিলটির সূক্ষ্মতম বস্তু-সমূহকে আমি দেখতে পেতাম। এই কণা খুব ধীরে ধীরে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে টেবিলের সীমা অতিক্রম করছে, তাই এর জীর্ণ শীর্ণ হয়ে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হতে বিলম্ব হবে, হয়ত সেই বিলম্ব এত অধিক যে ততদিন এতে বসে লেখার প্রয়োজন আমার থাকবে না।

নিরন্তর গতিশীল বস্তু বিশ্বের মূল উপাদান। কোনো বাহ্যিক দৃশ্য দেখার সময় তার বাহ্যত দৃশ্যমান স্থিরতাকে গ্রহণ না করে অভ্যন্তরীণ অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। তবেই আমরা জানতে পারব যে গতিবাদই (গতিবাদকে দ্বন্দ্ববাদও বলা হয়) বিশ্বের নিজস্ব দর্শন।

(ক) দ্বন্দ্ববাদ (Dialectic) —হেরাক্লিটাস এবং হেগেল —সেই সঙ্গে বুদ্ধকেও গ্রহণ করুন —ছিলেন গতিবাদ, অনিত্যবাদ এবং ক্ষণিকবাদের আচার্য; দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা দ্বন্দ্ববাদে উপনীত হয়েছিলেন। হেরাক্লিটাস বলেছেন: "বিরোধিতা (দ্বন্দ্ব) সমস্ত সুখের জননী।" হেগেল বলেছেন: "বিরোধী শক্তি হলো সেই, যে বস্তুকে পরিচালনা করে।" বিরোধ কি? প্রথম স্থিতির মধ্যে বৈপরীত্যের উদ্গম। একেই দ্বন্দ্ববাদ বলে, কারণ এই বাদ-এ বস্তু ও সমাজে পরিবর্তনের কারণ হিসাবে বিরোধ বা দ্বন্দ্বকে মানা হয়। হেগেল দ্বন্দ্ববাদকে মাত্র চিন্তার ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমিত রেখেছেন, কিন্তু মার্কস একে সমাজ ও

তার সংস্থাগুলিতে অর্থাৎ অন্যত্রও প্রসারিত করেছেন। বাদ, প্রতিবাদ, সংবাদের দৃষ্টান্ত আমি 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে' দিয়েছি। দ্বন্দ্ববাদের এই অবয়বের উপযোগ প্রাণী বিকাশের মধ্যে দেখুন : ল্যাঙ্কাশায়ারে এক প্রকার সাদা রঙের ফড়িং জাতীয় পতঙ্গ ছিল। সেখানে কল-কারখানার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ধোঁয়ায় ঘরবাড়ি, গাছ, মাটি এবং সবই কালো হয়ে যেতে লাগল। এখন ঐ সাদা ফড়িংগুলি কালো মাটির ওপর থাকবার ফলে দূরে থেকেই পতঙ্গভুক পাখিরা তাদের দেখতে পেয়ে খেতে শুরু করল। মনে হলো যে-ক'টি অবশিষ্ট আছে তারাও লুপ্ত হবে। সেই সময় ঐ ধোঁয়ায় এমন এক রাসায়নিক প্রভাব পড়েছিল যে তাতে জাতি পরিবর্তন হয়ে স্থায়িভাবে সাদা ফড়িংগুলি কালো হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে তাদের বংশ-বৃদ্ধিও হতে থাকে। দশ বছর পরে লোক প্রশ্ন করে : "আগে তো এখানে অনেক সাদা ফড়িং ছিল, সেগুলো কোথায় গেলো, আর এই কালোগুলোই বা কোথা থেকে এল ?" এখানেও দ্বন্দ্ববাদ আমাদের কাজে আসে।—(১) সাদা পতঙ্গ ছিল ; (২) প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হলো (সমস্ত বস্তুই কালো হওয়া) এবং তার সঙ্গে পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব চলল ; (৩) শেষে বিবর্তনের দ্বারা কালো পতঙ্গের উদ্ভব হলো, বর্ণ পরিবর্তন হওয়ার ফলে ভক্ষক প্রাণীগণকে তাদের খুঁজতে যথেষ্ট সময় এবং শ্রম ব্যয় করতে হলো। এইজন্য তারা বেঁচে থাকতে এবং বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলো। এখানে প্রথম অবস্থা বাদ, দ্বিতীয় বিরোধী অবস্থা প্রতিবাদ এবং তৃতীয় যে নতুন অবস্থার উদ্ভব হলো তা সংবাদ। সংবাদ অবস্থায় যে কালো পতঙ্গকে আমরা পেলাম তা সেই সাদা নয়—তার ভিন্ন পর্যায়সমূহই হলো ঐ কালো পতঙ্গ, সে এক নতুন বস্তু, নতুন জাতি। এটা শুধু বাহ্যিক আবরণ বা চামড়ার পরিবর্তন নয়, আনুবংশিকতার পরিবর্তন। এই বিবর্তনকেই বলে দ্বন্দ্বাত্মক পরিবর্তন (Dialectical change)।

আমরা দেখলাম যে গতি বা ক্ষণিকবাদকে মেনেই আমরা দ্বন্দ্ব বা বিরোধে পৌছাই। উপরোক্ত পতঙ্গের দৃষ্টান্তে আমরা পতঙ্গ এবং পরিস্থিতিকে একই সময়ে দেখেছি যাদের বিরোধী সমাগম হয়েছে দ্বন্দ্ব রূপে। অতএব দ্বন্দ্ববাদ আমাদের পক্ষান্তরে বিরোধী সমাগমে পৌঁছে দেয় (Union of opposites)। বাদ-প্রতিবাদের কলহান্ত হয় সংবাদে। এই দ্বন্দ্বাত্মক পরিবর্তনই মৌলিক। বস্তু এখানে রূপাত্মক নয়, গুণাত্মকভাবে পরিবর্তিত হয়। যা পরবর্তী বংশ ধারায় সঞ্চারিত হয়। বাদকে মেটাতে চায় প্রতিবাদ আবার তার প্রতিকার করে সংবাদ ; অর্থাৎ প্রতিবাদ থেকে হয় বাদের অভাব এবং প্রতিবাদের অভাব হয় সংবাদ থেকে। অতএব সংবাদ হলো অভাবের অভাব বা প্রতিষেধের প্রতিষেধ (Negation of negation)। শিশু বৃশ্চিক মাকে হত্যা করে জন্মে, এই প্রবাদ ভুল, কিন্তু প্রতিষেধের প্রতিষেধকে বোঝার জন্য এ একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথমে ছিল মাতামহী বৃশ্চিক, তাকে হত্যা করে (প্রতিষেধ) জন্মাল মা বৃশ্চিক,

আবার তাকে প্রতিষেধ করে এল কন্যা বৃশ্চিক। এইভাবে প্রথম পর্যায়ের প্রতিষেধ দ্বিতীয়, তা থেকে তৃতীয় হলো প্রতিষেধের প্রতিষেধ। ধারণা বা প্রাণী যারই বিকাশ হোক না কেন সর্বত্রই এই প্রতিষেধের প্রতিষেধ দেখা যায়।

বিরোধী সমাগম, গুণাত্মক পরিবর্তন তথা প্রতিষেধের প্রতিষেধ সম্পর্কে আমি আমার 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছি এখানে তাই আর তা দীর্ঘ করলাম না।

(খ) ভাববাদের আলোচনা—ভাববাদীগণের মধ্যে কাণ্ট বা বার্কলে, যাকেই গ্রহণ করুন না কেন, সকলেই এই মতের ওপর জোর দিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিক (সায়েন্টিষ্ট) যে জগৎকে অবলম্বন করে তা মিথ্যা। বৈজ্ঞানিকের বাস্তবিক জগৎ কি তাই সে জানে না, মন, বিজ্ঞান জগৎ বা বাস্তব জগতের যে আভাস উৎপন্ন করে সে শুধু সেইটুকুই জানে। কার্য-কারণকে চিহ্নিত করতে পারে না। উত্তপ্ত লোহাতে আপনার হাতে ছ্যাকা লাগল। এতে আপনি কি জানলেন? লোহার লাল রঙ এবং উত্তাপের বেশী কিছু আপনি জানলেন না। আবার এই জানা-টুকুও আপনার মনের কল্পনা, এইভাবে সায়েন্সের নিয়ম বা সম্ভাবনাসমূহ মনের কল্পনা মাত্র।

মার্কসবাদের বক্তব্য—আপনি যে বস্তুকে জানেন, তার ধারণাও আপনার আছে; এর মানে আপনি শুধু লাল এবং তাপকেই জানেন না। যদি বস্তুর সত্তাকে আপনি অস্বীকার করেন তবে জ্ঞানোন্মেষই অসম্ভব হয়ে যাবে। জ্ঞানের অস্তিত্বকে স্বীকার করার সঙ্গে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়কেও স্বীকার করছেন; জ্ঞাতা না থাকলে এবং জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) না থাকলে বস্তুকে জানা যাবে কিভাবে? জ্ঞাত ও জ্ঞেয়র সম্বন্ধ ব্যতীত মাত্র ধারণার সাহায্যে বিশ্বের অস্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় না। তাহলে কি করে মানা যাবে যে আপনি মাত্র নিজের ধারণাকেই জানেন। ইন্দ্রিয় এবং কোনো বিষয়ের বস্তুর সংযোগ যখন হয় তখন প্রথমে ঐ বস্তুর অস্তিত্বমাত্র আমাদের জ্ঞাত হয়—প্রত্যক্ষকে দিগ্নাগ এবং ধর্মকীর্তিও কল্পনা-রহিত বলে মেনেছেন। লাল রঙ ও উত্তাপ তো পরবর্তী ধারণা যাকে বস্তুত প্রত্যক্ষের মধ্যে ধরাই চলে না; প্রত্যক্ষ—সমস্ত জ্ঞানের জনক—সর্ব প্রথমে বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দান করে। এটা ঠিক যে আমরা বিষয়কে পরিপূর্ণ-ভাবে জানি না, কিন্তু তার অস্তিত্বকে ভালোভাবেই জানি। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আমাদের সামান্য কিছু বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দেয় যা সাপেক্ষ। ভাববাদে যদি কিছু সত্যতা থাকে তবে তা সাপেক্ষতা যা সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রকৃতি নিশ্চিতই বাহ্য পদার্থের মধ্যে আছে, কিন্তু তার পূর্ণরূপ রহস্যাবৃত এবং এই আবরণ উন্মোচন করা তার স্বভাবও নয়, যে পরিস্থিতি-রূপে আমরা প্রকৃতিকে দেখি, তার কথাই বলি। সমস্ত প্রত্যক্ষই বিশেষ বা ব্যক্তিগত এবং পরিস্থিতি থেকে জাত। বিশেষ বিষয় এবং পরিস্থিতি বাদ দিয়ে, শুদ্ধ প্রত্যক্ষ কখনও হয়

না। আমরা বস্তুকে সব সময় একটা বিশেষ রূপে দেখি। একটা সরল দণ্ডকে জলে ডুবিয়ে দিলে তাকে যে ক্ষুদ্র বা বক্র রূপে দেখি তা ঐ জলের পরিস্থিতিতে দেখবার রূপ। অতএব জ্ঞান হলো বাস্তবিকতার আভাস, কিন্তু আভাসমাত্র নয়। তা জ্ঞাতার প্রয়োজন এবং দৃষ্টিকোণ —অতএব ঐতিহাসিক বিকাশের বিশেষ অবস্থার সম্পূর্ণ সাপেক্ষ। দেশ-কালের পরিস্থিতিকে সরিয়ে রেখে বস্তুর জ্ঞান সম্ভব নয়। "প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না" এবং "তা সদাই সাপেক্ষ" এই দুটি উক্তির মধ্যে এতই পার্থক্য যে তা 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর মধ্যে ব্যবধানের তুল্য। মার্কসবাদ, সাপেক্ষ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ সম্ভব বলে মানে, যার দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমর্থন হয়। ভাববাদ বস্তুর সত্তাই অস্বীকার করে জ্ঞানকে অসম্ভবে পরিণত করে; ফলে সায়েন্সকেও তা ত্যাজ্য মনে করে।

(গ) বস্তুবাদ এবং মন —যখন আমরা ভাববাদের গন্ধর্ব লোক থেকে নেমে এসে কিছুটা বাস্তবিক জগতে প্রবেশ করি তখন দেখি যে বস্তুজগৎ মনের সৃষ্টি নয় বরং মনই প্রকৃতি তথা বস্তুর অবদান। পৃথিবীর বয়স প্রায় দু'শ কোটি বছর, জীব মাত্র কয়েক কোটি বছরের পুরনো। কিন্তু তাদের 'জগৎ সৃষ্টিকারী মন ছিল না।' মানুষের উৎপত্তি বড়জোর দশ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু জাভা, চীন বা নিয়াণ্ডার্থাল মানবের তো এমন মন ছিল না, যা 'বিশ্ব'কে সৃষ্টি করেছে। দেখা যাচ্ছে 'বিশ্বসৃষ্টিকারী' মন মাত্র আড়াই হাজার বছর আগের দার্শনিকের তন্দ্রাচ্ছন্ন কল্পনাপ্রসূত। গত দু'শ কোটি বছরের মধ্যে মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে পর্যন্ত কোনো প্রকার মনের অস্তিত্ব ছিল না, অথচ তখনও কিন্তু বস্তু ঠিকই মজুদ ছিল। অতএব এই নবজাত মনকে বস্তুর জনক বলা কি পুত্রকে তার পিতার পিতা করে দেওয়ার তুল্য নয়? মূল বস্তু থেকে পরমাণু, অণু, অণুগুচ্ছক; তা থেকে প্রারম্ভিক নির্জীব ক্ষুদ্র পিণ্ড, তথা জীব-অজীবের মধ্যবর্তী ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া যার থেকে এককোষী অত্যন্ত সূক্ষ্ম সত্তা সৃষ্টি হলো। এককোষী প্রাণী থেকে ক্রমবিকাশ হতে হতে অস্থিহীন, মেরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী প্রাণী, এবং আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগে মানুষের উদ্ভব হলো। এই সমগ্র প্রাণ প্রবাহ কিন্তু এ কথা বলে না যে, প্রারম্ভেই মন ছিল যা দিয়ে সে চিন্তা করল যে জগৎ সৃষ্টি হবে এবং তার কল্পনা জগৎ রূপে দেখা যাবে। সমস্ত বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব এবং বিকাশ এই কথাই বলে যে বস্তু (বিবর্তন)-এর তত্ত্ব প্রাণীর আগেই বর্তমান ছিল। মন প্রাণীর পরবর্তী অবস্থায় উৎপন্ন হয়েছে অতএব এটা স্পষ্ট যে, মন বস্তু থেকে সৃষ্টি। বস্তু থেকে জাত হওয়াকে এই অর্থে নেবেন না, যে বস্তুই মন। বস্তু সদা পরিবর্তনশীল। এ থেকেই পরিস্থিতির মধ্যে বিরোধ তথা দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং সেই দ্বন্দ্ব থেকেই দ্বন্দ্বাত্মক —গুণাত্মক— পরিবর্তন হয়। এর পরে আমরা আর তাকে 'সেই বস্তুটি' বলতে পারি না, কারণ গুণাত্মক পরিবর্তন সম্পূর্ণ নতুন একটি বস্তু আমাদের সামনে হাজির করে। মন এই রকমই বস্তুর এক গুণাত্মক পরিবর্তন, সে বস্তু থেকে জন্ম গ্রহণ করেও স্বয়ং বস্তু নয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক

বিংশ শতাব্দীতে সায়েন্সের প্রগতি আরও বৃদ্ধি পায়। মানুষ যেভাবে আজ সমুদ্রে সাঁতার কাটছে, সেইভাবেই সে আগে কল্পনায় ভর দিয়ে ইতস্তত উড়ছিল, কল্পনাকে করে দিয়েছিল সুদূর প্রসারী। আজ তার শ্রবণশক্তি এত তীক্ষ্ণ হয়েছে যে সে হাজার মাইল দূরের শব্দ—সংবাদ, সঙ্গীত—ঘরে বসে শোনে। তার দৃষ্টির তীব্রতা এত প্রবল যে হাজার মাইল দূরের দৃশ্য আজ তার সামনে, যদিও এতে আরও বিকাশের প্রয়োজন। গত শতাব্দীতে যে সকল ভাব, রূপ এবং শব্দ অচল প্রস্তর মূর্তি এবং গুহার প্রতিধ্বনির মতো আমাদের কাছে এসে পৌঁছাত, আজ আমরা তাদের চোখের সামনে চলতে ফিরতে, কথা বলতে, গান গাইতে দেখছি। এখন আমরা সেগুলিকে প্রতিচিত্র এবং প্রতিধ্বনি রূপে দেখছি কিন্তু সেই যুগেরও সূচনা হয়ে গেছে যখন বিশেষভাবে সজীব রক্তমাংসের মানুষই সরাসরি আমাদের সামনে এসে হাজির হবে। এই সব কথা কয়েক শতাব্দী পূর্বে দৈবী বিভা, অলৌকিক সিদ্ধির সামগ্রী বলে মনে করা হতো।

মানুষের একটি জ্ঞানের ক্ষেত্র এবং একটি অজ্ঞানতার ক্ষেত্র আছে। তার অজ্ঞানতার ক্ষেত্র যখন অনেক বিস্তৃত ছিল, তখন ঈশ্বর ও ধর্মের খুবই প্রাধান্য ছিল। জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে যখন অজ্ঞানতার ক্ষেত্রকে স্ব-ক্ষেত্রে পরিণত করতে চাইল, তখন অজ্ঞানতার ক্ষেত্রের অধিবাসীগণের—ধর্মের এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠল। তখন অজ্ঞানতার রাজ্যকে রক্ষার জন্য বিশেষ করে দর্শনের আবির্ভাব হলো। দর্শনের প্রধান কাজ ছিল খোলা চোখে ধুলো দেওয়া—খৃঃ পূঃ ৭ম-৬ষ্ঠ শতকে দর্শন নিজের আবির্ভাব কালে নামের সম্পূর্ণ বিপরীত যে কাজ শুরু করেছিল তা সে আজও ধরে রেখেছে। সন্দেহ নেই যে দর্শন কখনো কখনো ঈশ্বর ও ধর্মের বিরোধিতা করেছে কিন্তু তা নাম মাত্র; সেখানে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী "অর্ধ তজহি বুধ সর্বস জাতা" নীতির অনুসরণ করেছিল।

বিংশ শতাব্দী আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়াণ্টামবাদ, ইলেকট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি সম্বন্ধে যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছে, এগুলির বর্ণণা আমি আমার 'বিশ্বের রূপরেখা' গ্রন্থে দিয়েছি। এগুলি ঈশ্বর, ধর্ম, পরমাত্মা, বস্তু-সার (সত্তার

সত্তা), ভাববাদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে তাতে দার্শনিকগণ চুপ করে থাকতে পারেননি। কিন্তু ঐ সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অনাবৃত রূপের আকর্ষণ থেকে মানুষকে নিরস্ত করা যায়নি। তাই ধর্ম, ঈশ্বর, প্রভৃতি প্রাচীন নীতির পোষকতা করা সম্ভব হয়নি। আমরা দেখেছি কাণ্ট কিভাবে বুদ্ধিসীমা অতিক্রম-কারী বস্তু-সার তত্ত্বকে অবলম্বন করে ধর্ম-ঈশ্বর-নৈতিকতাকে আমাদের মস্তিষ্কে গ্রথিত করে দিতে চেয়েছিলেন। ফিকটে, হেগেল, স্পেন্সারের মধ্যেও আমরা সেই একই জিনিস দেখেছি।

বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকগণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণণের মতো "উপনিষদের দিকে ফিরে চলো" —বলতে শুনেছি কাউকে, একইভাবে জার্মানীতে কোকে উইণ্ডেল, হুর্সেলকে বলতে দেখেছি —"কাণ্টের দিকে ফিরে চলো।" কোথাও বা ইউকেন, বার্গসঁকে দেখেছি অধ্যাত্ম জীবনবাদ এবং সৃজনাত্মক জীবনবাদের প্রচার করতে। কোথাও উইলিয়াম জেম্‌সকে প্রয়োগবাদ অর্থাৎ Pragmatism এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে দেখেছি বস্তু ও ভাব উভয় থেকেই ভিন্ন অনুভয়বাদ (Neutrism)-কে পুষ্ট করতে। এই সকল দার্শনিক অতীতের মোহে পড়েছেন। কিন্তু ঐ সব কথা বুদ্ধিভিত্তিক নয়। এ হলো মানব-সমাজের প্রভুদের শ্রেণীস্বার্থের সেই তাগিদ যাতে তারা না লুপ্ত হয়, না বর্তমানের ভোগবিলাস হাতছাড়া হয়।

এখন আমি বিংশ শতাব্দীর শারীরবাদ, ভাববাদ, দ্বৈতবাদ, অনুভয়বাদের কিছু পরিচয় দিতে চাই।

§ ১. ঈশ্বরবাদ

১ —হোয়াইটহেড (জন্ম ১৮৬১ খৃঃ)

আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড ছিলেন ইংলণ্ডের মধ্য শ্রেণীর একজন ধর্ম-বিশ্বাসী গণিতজ্ঞ।

দর্শন —হোয়াইটহেডের একটা বড় ক্ষোভ যে প্রত্যক্ষ করার মধ্যে এই সমৃদ্ধ প্রকৃতিকে "বর্ণহীন, গন্ধহীন, শব্দহীন, ব্যর্থ নিরন্তর চলমান বস্তুতে" পরিণত করা হয়েছে। তিনি তাঁর দর্শন —শারীরবাদ (organism) দ্বারা প্রকৃতিকে এই অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন। তাঁর দর্শন শব্দগন্ধাদি কার্য-গুণকেই নয়, এমনকি মানুষের কৃষ্টি, আচরণ, ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মতকেই সমর্থন করতে চেয়েছে, একই সঙ্গে তিনি নিজেকে ভাবের সমর্থক বলেও প্রচার করতে চেয়েছেন। একমাত্র সাকার ঘটনাকেই আমরা অনুভব করি। এই ঘটনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন নয় বরং একই অঙ্গের বিভিন্ন অবয়বের সঙ্গেই তুলনীয়। শরীর নিজের স্বভাবানুযায়ী সব অবয়ব, উপাদান এবং ঘটনাকে

প্রভাবিত করে। হোয়াইটহেড এখানে যে অর্থে শরীরকে প্রযুক্ত করেছেন তা সমস্ত বাস্তবসত্যের —বাস্তবিকতার —বোধক, এবং শুধুমাত্র চেতন প্রাণীদেহ পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং সমস্ত প্রকৃতির মূলস্বরূপ। হোয়াইটহেডের মতে সমস্ত বস্তুশাস্ত্রই অতিসূক্ষ্ম শরীর (ইলেকট্রন, পরমাণু ইত্যাদি)-এর আলোচনা করে এবং প্রাণীশাস্ত্র বৃহৎ শরীরের। হোয়াইটহেড প্রাণী-অপ্রাণীর মতো মন এবং কায়ার ভেদকেও মানতেন না। মন দেহেরই এক বিশেষ ঘটনা-চক্র এবং তার প্রয়োজন হলো উচ্চ-ক্রিয়াসমূহের সম্পাদন করা। বস্তুশাস্ত্রের আধুনিক প্রগতিকে স্বীকার করে নিয়ে হোয়াইটহেড মন বা কায়াকে নয়, ঘটনাসমূহকে —পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে বিশ্বের সূক্ষ্মতম অবয়ব বলে মানতেন। অবয়বসমূহ এবং তাদের পারস্পরিক যোগই হলো বিশ্ব। বৃহৎ ঘটনাসমূহ হলো ক্ষুদ্র ঘটনাসমূহের অবয়বী, এবং সবশেষে থাকে মূল আধার বা পরমাণুযুক্ত ঘটনাবলী। এইভাবে হোয়াইটহেড বাস্তবিকতাকে প্রবাহ বা দীপ শিখার ন্যায় নিরন্তর পরিবর্তনশীল বলে মেনেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আকৃতিকে (form) স্থায়ী বলে মেনে এক নিত্য পদার্থ বা প্লেটোর সামান্য তত্ত্বকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, "নশ্বর প্রবাহের মধ্যে একটি এমন বস্তু আছে, যা সৃষ্টি হয়েই চলে; নিত্যতাকে নষ্ট করার মধ্যে এমন এক উপাদান আছে, যা প্রবাহরূপেই বেঁচে থাকে।"

যাকে একটি বস্তু বা ব্যক্তি বলা যায় তা প্রকৃতপক্ষে ঘটনাসমূহের সমাবেশ বা ব্যবস্থিত প্রবাহ এবং তার মধ্যে কার্য-কারণ-ধারা বজায় থাকে। সূক্ষ্মতম অবয়ব, পরমাণু আদির ঘটনা, জগতে অন্যান্য সমস্ত প্রাথমিক —পারমাণবিক-ঘটনা থেকে পৃথক নয়, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ঘটনাসমূহের সংগঠিত পরিবার। আর এই সম্বন্ধ ও সংগঠনের কারণ এমনও বলা যেতে পারে যে "প্রতিটি বস্তু প্রতিটি সময়ে প্রত্যেক স্থানে আছে।" প্রত্যেক প্রাথমিক (=পারমাণবিক) ঘটনা তার পূর্বের প্রাথমিক ঘটনা থেকে সৃষ্ট এবং এইভাবে ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বগামী। এইভাবে প্রত্যেকটি প্রাথমিক ঘটনা প্রবাহরূপী হলেও 'পদার্থরূপে অবিনাশী'।

ঈশ্বর —বিশ্বের সঙ্গে 'সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই' ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে নেই নয়, বরং এগুলি তাঁর আধার 'শরীর'। পূর্ণ একতা প্রতিষ্ঠিত করতে ক্রিয়াশীল বহুত্ব হলো বিশ্ব। ঈশ্বর হলো —"বাস্তব বহুত্বের অন্বেষণে তৎপর দৃষ্টিকোণসমূহের ঐক্য, এবং এর জন্যই ইচ্ছার অনন্ত ক্ষুধা।" তিনি নিজের 'সমস্ত-বিজ্ঞান-সম্মত' দর্শনের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন ঈশ্বর, ধর্ম এবং নীতির সমর্থনে। কেন?

২ —ইউকেন (১৮৪৬-১৯২৬ খৃঃ)

ইনি ছিলেন একজন জার্মান দার্শনিক। ইউকেনের মতে আধ্যাত্মিক জীবনই (Spritual Life) হলো সর্বোচ্চ বাস্তবিকতা। এর অবস্থান প্রকৃতির (=বিশ্ব) ঊর্ধ্বে কিন্তু তা এতদূর ব্যাপ্ত যে প্রকৃতিকে তার সোপান বলা চলে। এই আত্মিক

জীবন গূঢ় ঐক্য নয়, আরও উচ্চস্তরের, আরও গভীর আধ্যাত্মিকতার অঙ্কে লালিত। যোগক্রিয়ার ন্যায়ই আশ্চর্য এমন কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে, যেগুলির সহায়তায় মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সে স্বয়ং এই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রগতির সহায়ক হতে পারে। বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম, দর্শনের প্রতি অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় আধ্যাত্মিক জীবনের কাছ থেকে এবং তা ঐগুলির প্রগতিরও অংশীদার। সত্য মানুষের সৃষ্টি নয়, অধ্যাত্মলোকে তার অধিষ্ঠান, যার অনুসন্ধান —মানুষের জীবনব্যাপী। এই স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ম্ভূ সত্য ব্যতীত শ্রদ্ধা অসম্ভব। সত্য মানুষের পরিমাপ, মানুষ সত্যের নয়। সত্য নিজের অস্তিত্ব মানতে বাধ্য করায়। সত্য আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণ। এর দ্বিতীয় প্রমাণ, কষ্টের সময় লোকে আধ্যাত্মিক জগৎ বা স্বর্গ-রাজ্যের শরণ নেয়।

প্রকৃতিও উপেক্ষণীয় নয়। এর ভেতরেও আছে যথেষ্ট বোধ। মানুষের মন প্রকৃতি থেকেই জাত। তবে প্রকৃতির অবস্থান মনের (আত্মার) নীচে ; বড় জোর বলা যায় যে প্রকৃতি আধ্যাত্মিক জীবন মার্গের প্রথম আশ্রয়। আধ্যাত্মিক জীবন প্রকৃতি থেকে জাত নয় বরং তার মূল উৎস তথা অন্তিম লক্ষ্য।

আধ্যাত্মিক জীবনের জ্ঞান সায়েন্স বা বৌদ্ধিক তর্ক বিতর্ক দ্বারা সম্ভব নয়, তার জন্য আধ্যাত্মিক অনুভব অর্থাৎ সেই আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সর্বত্র স্ব-উপস্থিতির অনুভবের প্রয়োজন।

এই আধ্যাত্মিক জীবনই ঈশ্বর। ধর্ম মানব-জীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চশিখরে নিয়ে যায়, এ ব্যতীত মানুষের জীবন অর্থহীন, অসাড়। ইউকেন এইভাবে বস্তুবাদের প্রভাবকে খণ্ডন করার জন্য ঈশ্বর এবং ধর্মের হাতে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছেন।

§২. অনু-উভয়বাদ

১—বার্গসঁ

ইনি একজন ফরাসী দার্শনিক। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর দ্বারা ফ্রান্সের পরাজয়ের পর তাঁর মৃত্যু হয় (১৯৪১ খৃঃ)।

বার্গসঁ প্রকৃতি ও তার নিয়মকে অস্বীকার না করেও বিশ্বের আধ্যাত্মিকতাকে মানতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর দর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তন (=ক্ষণিকতা), ক্রিয়া, স্বাতন্ত্র্য, সৃজনাত্মক বিকাশ, স্থিতিকাল এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি। তার দর্শনকে বিশেষভাবে পরিবর্তনের দর্শন বা সৃজনাত্মক বিকাশ (Creative evolution) বলে।

(১) তত্ত্ব—বার্গসঁ-এর মতে আসল তত্ত্ব বস্তুবাদও নয়, ভাববাদও নয়, বরং

ভিন্ন —অন্‌-উভয় তত্ত্ব, এবং এ থেকেই বস্তু ও মন সৃষ্টি হয়েছে। এই মূল উপাদান সদা পরিবর্তনশীল, ঘটনা প্রবাহে তরঙ্গায়িত, সর্বদা নতুন রূপের মধ্যে বর্ধিত জীবন।

(২) **স্থিতি** —বার্গসঁ স্থিতিতে বিশ্বাসী কিন্তু স্থিরতার স্থিতিতে নয়, প্রবাহের স্থিতিতে। "স্থিতি অতীতের নিরন্তর প্রগতি, যা ভবিষ্যৎ রূপে পরিবর্তিত, ক্রমবর্ধিত হতে হতে বিশাল আকার ধারণ করে।" বার্গসঁ চূড়ান্তভাবেই পরিবর্তনের বিপরীত বস্তু-স্থিতি শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন—

"অতি বাল্যকাল থেকে আমাদের সমস্ত অনুভব, চিন্তন, চাহিদা বর্তমানের দিকে ঝুঁকে আছে এবং বর্তমান ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলনেচ্ছু। ...জন্ম থেকেই শুরু করে —না, শুধু জন্ম থেকে নয় তারও আগে থেকে, কেন না, আনুবংশিকতাও আমাদের সঙ্গে থাকে —জীবনে যা কিছু আমরা করি সেই ঐতিহাসিক সারাৎসার ব্যতীত আমি এবং আমার স্বভাব আর কি-ই বা? সন্দেহ নেই যে, আমি খুব কমই আমার অতীত স্মৃতিচারণ করতে পারি, কিন্তু আমাদের, সামগ্রিক চাহিদা, সংকল্প, ক্রিয়া সেই অতীতকেই নিয়ে।" বার্গসঁ একেই বলেছেন স্থিতি। এ হলো বর্তমানের মধ্যে সমস্ত অতীতের সারাকর্ষণ।

স্থিতির কারণ শুধু বাস্তবিক এবং নিরন্তর পরিবর্তন নয়, বরং প্রতিটি নতুন পরিবর্তনই কিছু সজীবতা, নবীনতার জন্য হয়ে থাকে। তাই একে বলে সৃজনাত্মক বিকাশ। যে নিরন্তর ক্রিয়ায় অতীত বর্তমানের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় তাকেই বলে আধ্যাত্মিকতা। যখন এর মধ্যে শৈথিল্য আসে তখনই সৃষ্টি হয় বস্তু তথা প্রকৃতির। বাহ্যতা ব্যতীতই যে ব্যাপকতা, তাকেই বলে চেতনা এবং ব্যাপ্তিহীন বাহ্যতাকে বলে প্রকৃতি।

জীবন বিকাশের তিনটি স্বতন্ত্র দিশা আছে —বানস্পতিক, পাশবিক এবং বৌদ্ধিক। যা ক্রমান্বয়ে বৃক্ষাদি, পশু এবং মানুষের মধ্যে বিকাশিত হয়েছে।

(৩) **চেতনা** —চেতনা বা আধ্যাত্মিকতাকে বার্গসঁ স্মৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত বলে মনে করতেন, প্রত্যক্ষীকরণের সঙ্গে নয়। চেতনাকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া নয় বরং চালকশক্তি হিসেবেই তিনি মনে করেছেন। "প্রাসাদ এবং ভিত্তি উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ট, যদি ভিত্তি উৎপাটিত করা হয় তবে প্রাসাদ ভেঙে পড়ে, কিন্তু এতে কি বলা যায় যে প্রাসাদ ও ভিত্তি একই রকম দেখতে?"

(৪) **বস্তু** —বার্গসঁ-র মতে বস্তুর কাজ হলো জীবন-সমুদ্রকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া, যার মাধ্যমে তারা স্ব-স্ব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বিকাশিত করতে পারে।

প্রকৃতি এই বিকাশের অন্তরায় নয় বরং আপাতদৃষ্টিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাকে উত্তেজিত করে আরও কার্যক্ষম করে তোলে। প্রকৃতি একই সঙ্গে "বাধা, সাধন ও উত্তেজনা।" জীবন শুধু সমাজের মধ্যেই সন্তুষ্ট, সর্বোচ্চ এবং

অত্যন্ত সজীব মানুষ সেই-ই, "যে নিজে তার কর্মের মাধ্যমে শক্তির পরিচয় দেয় এবং অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করে। স্বয়ং উদার হয়ে ঔদার্যের পথপ্রদর্শক হয়।"

(৫) **ঈশ্বর** —ঈশ্বর জীবনের কেন্দ্রীয় প্রকাশ-প্রসারণ। ঈশ্বর "নিরন্তর জীবন-ক্রিয়া, স্বাতন্ত্র্য।"

(৬) **দর্শন** —বার্গসঁ-র মতে দর্শন সদাই বাস্তবিকতার প্রত্যক্ষ-দর্শন—আত্মানুভূতি —হয়ে রয়েছে, এবং থাকবেও। শব্দগতভাবে এই উক্তি ঠিক। আত্মানুভূতি দ্বারাই আমরা 'স্থিতি'. 'জীবন' এবং চেতনার সাক্ষাৎকার করি। পরম তখনই আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে যখন আমরা কর্ম সম্পাদনের জন্য নয় বরং তার সাক্ষাৎকারের জন্যই শুধু সাক্ষাৎ প্রার্থনা করব।

এইভাবে বার্গসঁ-র দর্শনেরও অবসান হচ্ছে আত্মদর্শন এবং ঈশ্বর সমর্থনে।

২. বার্ট্রাণ্ড রাসেল (জন্ম ১৮৭২ খৃঃ)

আর্ল রাসেল একজন ইংরেজ লর্ড এবং একজন বিখ্যাত গণিতবিদ্ ছিলেন। রাসেলের দর্শনকে অন্-উভয়বাদ বলা হয় অর্থাৎ মূল সত্তা প্রকৃতিও নয় ভাবও নয়। যদি লেখায় দার্শনিক জটিল ভাষা অবলম্বন না করে কেউ স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করেন তবে তাঁকে আর কে-ই বা দার্শনিক বলবেন? দার্শনিকের উচিত সান্ধ্যভাষা ব্যবহার করা যাতে তাঁর বিচার, রাত ও দিন উভয় সময়েই প্রযোজ্য হয়। রাসেল তাঁর দর্শনকে —'তার্কিক পরমাণুবাদ', 'অনুভয়বাদী-অদ্বৈতবাদ', 'দ্বৈতবাদ' এবং 'বস্তুবাদ' বলেছেন।

রাসেল কোথাও কোথাও আমাদের সমগ্র অনুভবের বিশ্লেষণ করেছেন প্রকৃতির মূলসত্তা পরমাণুর রূপে। দর্শন বিজ্ঞানের (সায়েন্সের) অনুগামী হতে পারে কিন্তু তার স্থান দখলের কোনো অধিকার তার নেই। বস্তু এবং ঘটনাসমূহের বহুত্ব বিজ্ঞান ও ব্যবহার-বুদ্ধি উভয় দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তাই তাদের অস্বীকার করা দর্শনের উচিত নয়। কিন্তু এর উৎস কোথায়? এর বিচার করতে গিয়ে রাসেল বলেছেন—

ভাববাদে বাহ্যিক বস্তুসমূহকে মানসিক বলা হয়। এটা ঠিক নয়, এতে সায়েন্সের অপলাপ করা হয় এবং তা বস্তুবাদেরও বিরোধী। মূলসত্তা তরঙ্গ-শক্তির বিকিরণ নয়, এ না ভাব না বস্তুসত্তা, বরং উভয় থেকে বিচ্ছিন্ন 'অন্-উভয় সত্তা'; কিন্তু 'অনুভয় সত্তা' এক নয়, ঘটনাসমূহের একটা শ্রেণী। "জগৎ অসংখ্য সত্তার সমূহ। এই সত্তার একটির সঙ্গে অপরটির বিভিন্ন সম্বন্ধ আছে এবং হয়ত এগুলির গুণের মধ্যেও ভেদ আছে। এই সব সত্তার প্রত্যেকটিকে ঘটনা বলা যায়।"

রাসেলের মতানুযায়ী —"দর্শন জীবনের লক্ষ্যকে নিশ্চিত করতে পারে না, তবে দুষ্ট আগ্রহ এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে।"

§ ৩. বস্তুবাদ

বিংশ শতাব্দীর সমাজবাদ যেমন মার্কসের, এই শতাব্দীর বস্তুবাদও তেমন মার্কসীয়। মার্কসবাদের বক্তব্য থেকে তাকে স্থির, অচল এবং ঐকিক মনে করা সংগত হবে না। মার্কসবাদের মূল মন্ত্র বিকাশ, তাই মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনেরও বিকাশ হয়েছে। এ সম্বন্ধে 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ'-এ বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন বোধ করছি না।

§ ৪. দ্বৈতবাদ

বিংশ শতাব্দীর নতুন নতুন অনুসন্ধান বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাবকে বর্ধিত করার ফলে একমাত্র যুক্তিবাদী দার্শনিকদের বদলে প্রয়োগবাদীগণের প্রাধান্য বেশী হয়েছে।

উইলিয়ম জেম্‌স্ (১৮৪২-১৯১০ খৃঃ) —উইলিয়ম জেম্‌সের জন্ম হয়েছিল আমেরিকার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তিনি ছিলেন মনোবিজ্ঞান এবং দর্শনের অধ্যাপক। যেভাবে বুদ্ধের তৃষ্ণাবাদ শোপেনহারের দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল সেইভাবেই তাঁর অনাত্মবাদী মনোবিজ্ঞান জেম্‌সের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

বস্তুবাদী বা ভাববাদী অদ্বৈতবাদ কোনোটিই জেম্‌সের পছন্দ ছিল না। অদ্বৈত বস্তুবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল যে যদি সমস্ত —মানুষও —আদিম নীহারিকাপুঞ্জ অতিসূক্ষ্ম উপাদান থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব, কর্মস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিগত প্রযত্ন এবং মহত্ত্বের আকাজ্ক্ষা বৃথা। এটা স্পষ্ট যে বস্তুবাদের বিরোধিতা করার সময় তাঁর সামনে ছিল মাত্র যান্ত্রিক বস্তুবাদ। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ যেভাবে গুণাত্মক পরিবর্তন দ্বারা সম্পূর্ণ নতুন বস্তুর উৎপাদনকে মানে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত ও অধিক বর্ধিত দায়িত্বকে অজ্ঞতা বা ভীতির আধারে নয় —অনেক উচ্চস্তরের জ্ঞান প্রকাশের সহায়ক মনে করে, তার জন্য অনেক মহৎ আত্মোৎসর্গের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, তাতে এটা স্পষ্ট যে তা নৈতিক দায়িত্বকে উপেক্ষা করে না। কিন্তু জেম্‌স যদি 'নৈতিক দায়িত্বকে' প্রাচীন অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তার আশ্রয়পুষ্ট সমাজ-ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার উপায় বলে মনে করেন তবে নিশ্চয়ই তিনি এই প্রকার দায়িত্ব বহনে প্রস্তুত ছিলেন না। জেম্‌সের যদি পরবর্তী মহাযুদ্ধ —বিশেষত বর্তমান (দ্বিতীয়) মহাযুদ্ধ দেখার সুযোগ মিলত, তাহলে তিনি ভালোভাবে বুঝতেন যে সামাজিক স্বার্থকে অবহেলা করে অন্ধ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা —যাকে কর্মস্বাতন্ত্র্য, প্রযত্ন, উচ্চাকাজ্ক্ষা প্রভৃতি নামে ভূষিত করা হয় —মানুষকে কতটা নিচে নিয়ে যেতে পারে।

(১) **প্রভাববাদ** —জেম্‌স সায়েন্সের প্রযত্ন গবেষণা, সত্যতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাই তিনি ভাববাদকে গুরুত্ব দিতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য হলো —কোনো বাদ, বিশ্বাস বা সিদ্ধান্তের কষ্টিপাথর হলো, তার প্রভাব বা ব্যবহারিক পরিণাম যা আমাদের ওপর এবং বিশ্বের ওপর দৃশ্যমান হয়। প্রভাবের ওপর জোর দেবার জন্য জেম্‌সের দর্শনকে প্রভাববাদও বলা হয়।

(২) **জ্ঞান** —জ্ঞান জীবনের জন্য একটি উপায়, জীবন জ্ঞানের জন্য নয়। তাকেই যথাথ জ্ঞান বা বিচার বলে যাকে আমরা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে, যথার্থরূপে নিরূপণ করতে এবং বিচার ও পরীক্ষা করতে পারি। এ কথা বলা ঠিক নয় যে, যা যুক্তিসঙ্গত তার সবই বস্তু-সৎ (বাস্তব সত্য)।

যা কিছু প্রয়োগ বা অনুভবের দ্বারা প্রমাণিত তাই বাস্তব সত্য। সমগ্র অনুভবের মধ্যে মাত্র সেটুকুই গ্রাহ্য যাতে কল্পনার মিশ্রণ নেই; যা শুদ্ধ, মৌলিক এবং নির্দোষ। বস্তু-সৎ হলো সেই শুদ্ধ অনুভব, যা মানুষের কল্পনা থেকে স্বতন্ত্র এবং যাকে ব্যাখ্যা করা কষ্টসাধ্য। অথবা এই অনুভবের মধ্যে এমন কোনো কল্পনা-রহিত ('কল্পনা-অপোঢ়' —দিঙনাগ ও ধর্মকীর্তি) আদিম উপস্থিতি আছে যার ওপর কোনো মানবিক কল্পনার প্রলেপ পড়েনি।

(৩) **আত্মা নেই** —মানসবৃত্তি এবং দেহের মিলনকারী মাধ্যম —আত্মা-কে মানা অর্থহীন, কেন না সেখানে এমন কোনো স্বতন্ত্র উপাদান নেই যাদের মিশ্রিত করার জন্য তৃতীয় কোনো পদার্থের প্রয়োজন হবে। বাস্তবিকতার এক অংশে আছে আমাদের অনুভূতির (Sensation) অবিশ্রান্ত প্রবাহ, যা আসে আবার বিলীন হয়, কিন্তু তার উৎস কোথায় আমরা জানি না; দ্বিতীয় অংশে আছে সেই সম্বন্ধ, যাকে আমরা মনের মধ্যে প্রতিবিম্ব রূপে পাই, এবং আর এক অংশে আছে প্রথমটির সত্যতা।

(৪) **সৃষ্টিকর্তা …নেই** —প্রকট ঘটনার পিছনে কোনো গুপ্ত বস্তু নেই। বস্তুসার, পরম, অজ্ঞেয় প্রভৃতি কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ কথা সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত যে আমরা যদি স্বয়ং অনুভূতিজাত কল্পচিত্রের আশ্রয় না-ও নিই, তবু স্পষ্ট বাস্তবিকতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এমন এক কল্পিত বাস্তবিকতার আশ্রয় নিই যা আমাদের ধারণাতেও নেই। মনের পরে যে সত্তা আছে তাকে জেম্‌স অস্বীকার করেননি বটে, তবে শুদ্ধ আদিম অনুভবকে তিনি মনঃপ্রসূত নয় বরং বস্তু-সৎ বলে মানতেন —আদিম তত্ত্বই বিকাশিত হয়ে চেতনায় রূপান্তরিত হয়।

(৫) **দ্বৈতবাদ** —জেম্‌সের উগ্র প্রভাববাদ দ্বৈতবাদের পক্ষ অবলম্বন করেছে —অনুভব আমাদের সামনে বহুত্ব, ভিন্নতা এবং বিরোধ উপস্থিত করে। সেখানে আমরা না পাই কূটস্থ বিশ্বের সন্ধান, না পরমসত্তাবাদী (ব্রহ্মবাদী)-গণের অদ্বৈতকে তার পূর্ণ সংগঠিত পরস্পর জগৎ প্রবন্ধে, যার মধ্যে সমস্ত বিরোধ এবং ভেদ একীভূত হয়ে যায়। অদ্বৈতবাদ আমাদের ললিত চিন্তা এবং সৌন্দর্যপ্রিয়

গ্রন্থ-সূচী

Dasgupta S. N.	*History of Indian Philosophy*
De Boer, T. J.	*History of Philosophy in Islam* ; *1903*
Engels, F.	*Anti-Duhring*
	Atheism
Feuerbach, L.	*Essence of Christianity*
Lewis, G. E.	*History of Philosophy*
Lewis, John	*Introduction to Philosophy* ; *1937*
Mac Dougall	*Modern Materialism and Emergent Evolution* ; *1929*
Marx, Karl	*Capital* ; 3 vols.
	Theses on Feuerbach
	Holy Family
	Poverty of Philosophy
Marx, Karl & Engels, F.	*German Ideology*
	Communist Manifesto
Radhakrishnan, S.	*Indian Philosophy*, 2 vols.
Stapledon, O.	*Philosophy and Living*, *1939*
Stcherbatsky, T. H.	*Buddhist Logic*, 2 vols.
Thilly	*History of Philosophy*
Vidyabhushana, S. C.	*History of Indian Logic*
Winternitz	*History of Indian Literature* ; vol, II.

ইসলামী দর্শন

আল-গজালী	'অহ্যাউল্-উলুম'
	'তোহাফতুল-ফিলাসফা'
ইবনে-রোশদ	'তোহাফতুল-তোহাফতুল-ফিলাসফা'
ইবনে খলদুন	'মুকদময়ে-তবারীখ'
শিবলী নোমানী	'আল-গজালী'
	'আল-কালাম'
মুহম্মদ ইউনুস আন্সারী	'ইবনে রোশদ'